যুবরাজ

সুনীল দাশ

পরিবেশক

নাথ ব্রাদার্স ॥ ৯ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট ॥ কলকাতা-৭৩

প্রথম প্রকাশ
শ্রাবণ—১৩৭১

প্রকাশক
সমীরকুমার নাথ
নাথ পাবলিশিং হাউস
২৬বি পণ্ডিতিয়া প্লেস
কলকাতা-২৯

প্রচ্ছদ শিল্পী
গৌতম রায়

মুদ্রাকর
শ্রীধনঞ্জয় দে
রামকৃষ্ণ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্
৪৪ সীতারাম ঘোষ স্ট্রীট
কলকাতা-৯

॥ এক ॥

ঘুম ভেঙে গেল সুদর্শনের।

বোধহয় অল্প কিছুক্ষণ আগে কোন একটা স্টেশনে থেমেছিল ট্রেনটা। এখন সেই স্টেশন ছেড়ে যাচ্ছে, গতিবেগ বাড়ছে ক্রমশ। ভোরের আকাশে শুরু হয়েছে আলোর আভাস।

সুদর্শন শুয়েছিল ট্রেনের বাঙ্কের ওপর। গাড়ি চলার শব্দ, ট্রেনের হুইসেল আর দোলানিতে ঘুম ভাঙার পর, সে বাঙ্কের ওপর শুয়ে শুয়েই চোখ মেলে দেখতে চাইল—আলো ফুটেছে কিনা। বাঙ্কে শুয়ে ঠিক বোঝবার উপায় নেই। মুখ ঘুরিয়ে সে তার উল্টোদিকের বাঙ্কের ওপরের যাত্রীটিকে ছাখে।

বিহারী। উঠে বসেছে। গোছগাছ শুরু করেছে।

এসে গেছে নাকি? সুদর্শনও উঠে বসে। নিচের দিকে তাকায়। গোছগাছ করছে সব যাত্রীই। দেখলে বোঝা যায়, কিছুক্ষণের মধ্যেই গাড়ি পৌছবে শিয়ালদহে।

মাঝরাত থেকে বেশ টানা ঘুমটা হল। নীল জিনের ট্রাউজারের ওপর গোল-গলা হলুদ গেঞ্জিটা পরে শুয়েছিল সুদর্শন। এবার বদলাতে হবে। কি পোশাক পরবে তা সে কাল রাতেই ভেবে রেখেছে। পোশাক নিয়ে ভাবনাটা তার বরাবরই একটু বেশি। বোম্বাই থেকে আনা দারুণ ওই সার্টটার সঙ্গে নতুন স্টেচ্‌লনের প্যারালালস্‌টা তাকে খুব মানায়। শিলিগুড়িতে মাত্র একবার পরা হয়েছে ও দুটো। সুদর্শন পোশাক নেওয়ার জন্যে বাঙ্কের ওপরের সরু তাকটার দিকে তাকায়।

আরে! রেক্সিনের সেই ব্যাগটা কোথায়?

দুটোমাত্র ব্যাগ নিয়ে বেরিয়েছে সুদর্শন। একটা লাল, অন্যটা কালো। কালো ব্যাগটাতে আছে টাকা-পয়সা। ওটা সে মাথায় দিয়ে শুয়েছিল। জায়গামত আছে। আর লালটাতে ছিল জামাকাপড়। আশ্চর্য! ব্যাগটা গেল কোথায়!

চারপাশে বারকয়েক চোখ ঘুরে যায় দ্রুত। কোথাও নেই।

'এই যে দাদা, এখানে একটা লাল ব্যাগ ছিল—দেখেছেন?'

'লাল ব্যাগ? কোথায় রেখেছিলেন? ওপরে?' নিচের সীট থেকে বয়স্ক ভদ্রলোক মুখ তুলে প্রশ্ন করলেন।

সুদর্শন নিচের দিকে তাকিয়ে বলে, 'হ্যাঁ, ঠিক এইখানটায় ছিল। ওতে আমার জামাকাপড় সবকিছু ছিল।' স্বরে উদ্বেগ। কিছুটা উষ্মাও।

'নিচে এসে ভাল করে দেখুন একবার, যদি কারও সঙ্গে ভুল করে নেমে এসে থাকে।' বয়স্কস্বরে করুণা যতখানি পাওয়া যায়, আশ্বাস ততখানি নয়।

ভদ্রলোকটির কথা শেষ হওয়ার আগেই সুদর্শন নিচে নেমে আসে। তার চোখের সন্ধানী মণি দ্রুত ঘোরাফেরা করে। হাত দিয়ে এটা ওটা সরায়। পায় না।

'কি কি ছিল ব্যাগটার মধ্যে?' মাঝবয়সী এক মহিলা আবার জানতে চান।

'সার্ট-প্যাণ্ট-গেঞ্জি-মোজা সব ছিল। সান্‌গ্লাস ছিল দুখানা।'

'টাকা-পয়সা?'

'না। টাকা-পয়সা ছিল না তাতে।'

'তবুও ভাল। শুধু জামা-প্যাণ্টের ওপর দিয়ে গেল।'

গালে সজোরে চড় কষিয়ে কেউ অদৃশ্য হয়ে গেলে যে অবস্থা হতো, এখন সুদর্শন অনেকটা তেমন অসহায়তা নিয়ে চুপ করে থাকল কয়েক মুহূর্ত। মাথার মধ্যে ধাক্কা দিচ্ছে একটা চাপা

রাগ। অথচ এখন কিছু করার নেই। বিভিন্ন যাত্রীর সহানুভূতি, কখনো বা করুণা-জড়ানো মন্তব্য শুনে যেতে হচ্ছে। এছাড়া কিই বা করার আছে?

হাত বাড়িয়ে সে বাঙ্কের ওপর থেকে তার জুতো মোজা নামিয়ে নেয়। সবাই তাকে দেখুক—এটা সে বরাবরই চায়। কিন্তু এভাবে নয়। সে চোখ নামিয়ে মোজা পরে। জুতোয় পা ঢুকিয়ে ফিতে বাঁধে নিঃশব্দে।

অসহায়তা ঝেড়ে ফেলে সুদর্শন সোজা হয়ে দাঁড়ায়। হিপ্ পকেটে হাত। চিরুণী বের হয়। ঘাড় পর্যন্ত নামানো চুল। চিরুণী চলে বারকয়েক। চোখে কিছুটা উদ্ধত, বেশিটা বিরক্তির চাউনি। দাঁতে দাঁত চেপে সে ভেবে নেয়, কলকাতায় পা দেওয়ার আগেই এভাবে মার খেতে হলো। ঠিক আছে। সুদে-আসলে এর শোধ উঠবে। শহরটা প্রথম থেকেই তাকে মারতে শুরু করেছে। দেখা যাক শেষ পর্যন্ত কে কাকে চাবকায়। এই চ্যালেঞ্জ নিয়েই তো সুদর্শন এসেছে এই শহরটাতে। দেখা যাক কে জেতে।

শব্দ করে এগোচ্ছে ট্রেনটা। খালের ওপরে লোহার একটা ছোট ব্রীজ। ট্রেনটা পার হচ্ছে। নিচে নোংরা জল। স্রোত আছে কি নেই বোঝা যাচ্ছে না। শিয়ালদহ আর বেশি দূর নয়। ইয়ার্ডে ঢোকার আগে গাড়ি চলতে লাগল খুব ঢিমে তালে। শেষ পর্যন্ত গাড়ি যখন প্ল্যাটফর্মে ঢুকলো, তখন আর ভোর হব হব নয়, চারি-পাশ রীতিমত আলোকিত।

প্ল্যাটফর্মে গাড়ি থামতে না থামতেই যাত্রীদের নামার জন্যে সোরগোল। শুধু সুদর্শনের নামার কোন তাড়া নেই। প্রতিটি যাত্রীকে সে লক্ষ্য করে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে। যদি আচমকা নজরে পড়ে যায় তার ব্যাগটা।

অসংখ্য মুখের মেলা। চলমান। দেখতে দেখতে ফাঁকা হয়ে যায় ট্রেনের কামরাগুলো। সুদর্শন নেমে দাঁড়ায় প্ল্যাটফর্মের ওপর।

চারদিকে তাকায়। তার জন্যে এই ভোরে কারো অপেক্ষা করার কথা নয়। তবু তার চোখ ঘুরে আসে চারপাশ। এক হাতে কালো ব্যাগটা, অন্য হাতে রুমালে মুখ মুছে নিয়ে সে পায়ে পায়ে এগোতে থাকে।

সামনে তার ভোরের কলকাতা দিন খুলতে শুরু করেছে। এ শহর সুদর্শনের কাছে নতুন নয়। খুব বেশি আসেনি অবশ্য। আত্মীয়-স্বজনও তো এখানে কম নেই ছড়িয়ে-ছিটিয়ে। কিন্তু সুদর্শন তাদের ধারেকাছে যাওয়াও পছন্দ করে না। গত পাঁচ-ছ বছরে যে কয়েক-বার সে এই শহরে এসেছে, দু-চারদিন বেড়িয়ে গেছে, প্রতিবারই থেকেছে তার পাঞ্জাবী-বন্ধু অম্বর সিং-এর কাছে। অম্বররা এক-সময় শিলিগুড়ি থাকত। সুদর্শনের বাবা ছিলেন শিলিগুড়ির নাম-করা কাঠের ব্যবসায়ী। বাবা মারা যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তা গেছে। দাদা রাখতে পারেনি। বরং বলা ভাল, রাখতে চায়নি। আর অম্বরদের ট্রান্সপোর্টের ব্যবসা বাডছে তো বাড়ছেই। শিলিগুড়ি ছেড়ে কলকাতায় এসে অম্বররা প্রথমে ছিল চেতলায় গোপালনগরে। একটা মাঝারি গোছের হোটেলও ছিল ওখানে অম্বরের কাকার। এর আগে যে কবার সুদর্শন কলকাতায় এসেছে ওই গোপাল-নগরে গিয়েই উঠেছে বরাবর। এবার ঠিকানা আলাদা। এখন আর পুরনো ঠিকানায় অম্বরকে পাওয়া যাবে না। ভবানীপুরের একটা বড় গোছের হোটেলের মালিকানা এখন অম্বরের। এছাড়া আছে ট্যাক্সির ব্যবসা। আরো কত কি যে একই সঙ্গে শুরু করে দিয়েছে অম্বর তার সব খবর সুদর্শন এখনো জানে না। দেখতে দেখতে কয়েকটা বছরের মধ্যে অম্বররা যে কিরকম বড়লোক হয়ে গেল ভাবলেও অবাক লাগে। আর সুদর্শনরা? দাদার কথা ভাবলে এখন তার শুধু ক্ষোভ হয় না, রাগ গনগন করতে থাকে।

স্টেশন থেকে বেরিয়ে ট্রামে বাসে না উঠে সে প্রথমে কিছুটা হেঁটে এগোল একটা চায়ের দোকানের উদ্দেশ্যে। দোকানটা খুঁজে

পেল না। উঠে গেছে হয়তো। একবারই মাত্র সে দোকানটাতে বসেছিল। স্পষ্ট মনে আছে। এক ঝাঁক মেয়ে বসেছিল অল্পদূরের একটা টেবিলে। গোটাছুই তাদের মধ্যে বেশ সুন্দরী। সবাই তাকাচ্ছিল সুদর্শনের দিকে। যেমন তাকায়। কি যেন বলাবলি করছিল নিজেদের মধ্যে। যেমন করে আর কি। আসলে ওই মেয়েদের ঝাঁকটার জন্যেই দোকানটার কথা এত স্পষ্ট মনে আছে তার।

কলকাতা বেশ তাড়াতাড়ি পাল্টে ফেলতে পারে নিজেকে। সুদর্শন মুখ তুলে রাস্তার ধারে বড় বড় বাড়ির মাথায় ফিল্মের বিজ্ঞাপনের দিকে তাকায়। তার প্রিয় নায়কের মুখ খোঁজে। খুঁজলেই পাওয়া যায়।

চলতে চলতে সে দাঁড়িয়ে পড়ে একবার। মুখ তুলে নায়কের গায়ের সার্টটার দিকে তাকিয়ে তার মনটা ভার হয়ে আসে আবার। ওই ডিজাইনের সার্টটা। যেটা খোয়া গেল। সার্টটা যদি থাকতো তাহলে তো সুদর্শন সেটা পরেই ওই হোর্ডিংটার নিচে দিয়ে হেঁটে যেতে পারতো। সুদর্শন মনে মনে একবার তার হত ইচ্ছেটিকে দেখে নেয়। সার্টটা গায়ে চাপিয়ে, দু হাতে ব্যাগ ঝুলিয়ে সে ট্রাম লাইনের পাশ দিয়ে হেঁটে যাচ্ছে। চোখে দামী সানগ্লাস। ঝাঁক ঝাঁক রমরমে মেয়ে, যারা তার প্রিয় নায়কের ফ্যান—তারা তাকিয়ে দেখছে সুদর্শনকে।

ভাগ্য লাথি মারল। কলকাতায় নামতে না নামতেই। পাল্টা লাথি মারতে হবে। জোড়া পায়ে। সবেগে। সুদর্শন এগিয়ে যেতে যেতে আর একবার ঘাড় ফিরিয়ে ছবিটা দেখে নেয়। এসেছি, এসেছি গুরু, জয় করতে এসেছি।

পাশ দিয়ে একটা মেয়েস্কুলের বাস ছুটে গেল। বেশির ভাগই ফ্রকপরা ছোট মেয়ে। দু-একটি শাড়ি পরা। ওদের কেউই বোধহয় সুদর্শনকে লক্ষ্য করল না। করতো, যদি ওই সার্টটা চাপানো থাকতো গায়ে। সুদর্শন জানে তার চেহারাটা চোখে পড়ার মত।

এতো বেশি ভাল করে আর কোন কথা তার জানা নেই। শিলি-গুড়ির বন্ধুরা তো বলেই, 'শ্লা একেই বলে নামকরণের সার্থকতা।' কিন্তু সুদর্শন এও জানে চেহারার ওপর তেমন মানানসই পোশাকটি না পরলে কোন চেহারাই খোলে না। ওটাই তো আসল আর্ট। একেবারে মর্ডান আর্ট। মান্ধাতার আমলের ধ্যানধারণা আঁকড়ে পড়ে আছে যারা তারা এ আর্টের বুঝবেটা কি। তার দাদার টাইপের মানুষেরা কস্মিনকালেও বুঝবে না।

এবার দাদার কথা মনে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে অর্ণব মিত্রের মুখটা মনে পড়ল। বার দুয়েক দেখেছে লোকটাকে। দাদারই টাইপ। তবে প্লাস সামথিং। অর্ণব মিত্রের কিছু বাড়তি গুণ আছে। নাটক লিখতে পারে। নাটক করে। আর করে বলেই কলেজে পড়ানো ছাড়া আর একটা জীবন চালিয়ে যাচ্ছে বেশ। নাটকের গ্রুপে তো অনেক মেয়েপত্তর আসে। তার মধ্যেও কি লোকটা ওই রকম গম্ভীর গম্ভীর থাকে : একদিন দেখলে হয়।

মৌলালির মোড়টার কাছে এসে সুদর্শন দেখল, ট্রাফিক সিগন্যালের অল্প দূরে একটা অ্যাশ কালারের ফিয়েট দাঁড়িয়ে আছে। সামনের সীটে শুধু ড্রাইভার। পেছনের সীটে একটি মেয়ে। খুব ফর্সা রঙ। পাতলা ঠোঁট। বেশ ছড়ানো চোখ। গাড়িটা যতক্ষণ সিগন্যালে আটকে থাকল, ততক্ষণ সুদর্শন দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে মেয়েটিকে দেখল। বাইরের চোখে সে দাঁড়িয়ে দেখে চুপচাপ। সঙ্গে সঙ্গে মনের চোখের দেখাও চলে। ইচ্ছেরা ছাড়া পায় তলায় তলায়। এত ইচ্ছে থাকে কোথায়? মনের তলার অন্ধকারটা কত বড়? কারো কারো কি একটু বেশি রকমের হয়। বিছানায় একা একা শুয়ে থাকা বা চুপ করে কোথাও বসে বসে ভাবনার সময়ই নয় শুধু, সুদর্শনের ইচ্ছেপাতিগুলো যে যখন-তখন হুটপাট এসে যায়। ইচ্ছেগুলো মিলতো যদি। সিনেমায় যেমনটা হয়, ঠিক তেমনটা যদি সুদর্শন হাতের মুঠোয় পেতো! পেলে অন্যরকম হতো।

দাদার জ্ঞানবাক্য হজম করে শিলিগুড়িতেই কাটিয়ে দেওয়া যেতো। কিন্তু মফঃস্বল শহরে কি তা পাওয়া যায়। সে পেতে গেলে কলকাতা। আসতে না আসতেই লাথি ঝাড়ে ঠিক। তবে পাল্টা লাথি ঝাড়ার তাগদ তোমারও থাকা চাই। থাকলে এসো। সুদর্শন যেমন এসেছে।

সবুজ আলো পেয়ে অ্যাশ কালারের ফিয়েটটা চলে যাওয়ার পর, সুদর্শনের মনে হলো—বড় শহরে থাকার এই হলো বড় লাভ। চোখের খিদে মেটে যখন-তখন। কিংবা খিদে বাড়ে। আরো তরতাজা হয়।

সামনে একটা ছোটমত চায়ের দোকান। প্রথমে ঢুকবে মনে করেও দু-পা এগিয়ে সে মন পাল্টায়। প্রথম থেকেই নজর উঁচু হওয়া দরকার। বড় শহরে দাপটে থাকতে গেলে সবার আগে চাই বড় নজর। সবার সেটা থাকে না। অনেক টাকা-পয়সা থাকলেও থাকে না। যেমন তার বাবার ছিল না। শিলিগুড়িতে গাড়ি ছিল, কলকাতায় এলে বাবা সেকেণ্ড ক্লাস ট্রামে চলাফেরা করতো—এ তো দাদার মুখেই শোনা। উঁচু নজর, খরচ করার মতো দিল্—পড়াশোনা করলেও যে হয় না—তাও তো দাদার দিকে তাকালেই বোঝা যায়। অম্বর ঠিকই বলে বেশি মিষ্টির মতো বেশি পড়াশোনার লাইফ বিস্বাদ হয়ে যায়। আসল কথা তো হলো কে কত সুখ আদায় করে নিতে পারছে লাইফের কাছ থেকে। সেদিক থেকে দেখলে তার চেনাজানা লোকের মধ্যে অম্বরের চেয়ে আর সুখী কে? অম্বরই তার একমাত্র ভরসা। সত্যিই তো অম্বরের কাছ থেকে মোটামুটি আশ্বাস না পেলে সে কি এভাবে কলকাতায় চলে আসতে পারতো বরাবরের মত? প্রয়োজনের তুলনায় টাকা একটু বেশিই এনেছে। তার ভাগের পুরোটাই এনেছে। কিন্তু একটা নিয়মিত আয় না থাকলে তা দিয়ে কদিন যোঝা যায়? মাস কয়েক বড় জোর।

আরো একটু এগিয়ে একটা মাঝারি গোছের চায়ের দোকানে ঢোকে সুদর্শন। সর্দারজীর দোকান। বেশ আছে এই অম্বর সিংদের লোকেরা। খাটছে খাচ্ছে, বগল বাজিয়ে জীবন উজিয়ে যাচ্ছে।

চায়ে চুমুক দিতে দিতে সে ভাবতে শুরু করে, এখান থেকে বেরিয়ে কি করবে। বাসে-ট্রামে এখনো তেমন ভিড় নেই। সঙ্গে একটি তো মাত্র ব্যাগ। হাতে নিয়ে অনায়াসে ওঠা-নামা চলতে পারে। আর এখান থেকে বেরিয়ে কতক্ষণই বা লাগবে ভবানীপুর পৌঁছতে। তবে শরীর একটু আরাম চাইছে। বাঙ্কের ওপর ঘুমটা মন্দ হয়নি, কিন্তু ব্যাগটা চুরি গিয়ে মেজাজটা এমন হয়ে গেছে—বিরক্তি লাগছে খুব। ট্যাক্সি নেওয়াই ভাল। টাকাগুলো সে যেভাবে সঙ্গে রেখেছে—তাতে তাকে মেরে অজ্ঞান না করতে পারলে কারো সাধ্যি হবে না হাতানোর। তাহলেও বাসে উঠতে মন চাইছে না। চা শেষ করে পয়সা মিটিয়ে সুদর্শন ট্যাক্সিতে ওঠে।

ছোকরা এক সর্দারজীর গাড়ি। কে জানে এ গাড়িটাই অম্বরদের কিনা। ইচ্ছে করলে সুদর্শনও তো দিনকতক ট্যাক্সি চালাতে পারে। অম্বরই ব্যবস্থা করে দেবে। এক সময় অম্বর তো দিনের পর দিন এই শহরেই ট্যাক্সি চালিয়েছে।

সিগারেট জ্বালিয়ে সে গা এলিয়ে দেয়। জানলা দিয়ে তাকিয়ে দেখে ছুটন্ত শহর। পুরনো বাড়ি নতুন বাড়ি জড়াজড়ি করে দাঁড়িয়ে। দোকান-পাট সব খোলেনি এখনো। রাস্তায় লোকজন বাড়ছে। কদিন পরেই গরম পড়ে যাবে চড়ে। অম্বর বলে কলকাতায় শীতই সবচেয়ে ভাল। গরমও হজম করা যাবে। অসহ্য বর্ষা। সুদর্শন বোধহয় সব-গুলোই দেখেছে এখানে এক-আধবার। টানা দেখেনি। বেশিদিন না থাকলে কোন দেখাই দেখা নয়।

ভবানীপুরের ঠিকানায় অম্বরকে পাওয়া গেল না। হোটেলের ক্যাশিয়ার জানাল, অম্বর দুর্গাপুরে গেছে কাল বিকেলে। আজই

আবার সন্ধ্যে নাগাদ ফেরার কথা। সুতরাং সন্ধ্যের আগে অম্বরের সঙ্গে দেখা হওয়ার কোন প্রশ্নই ওঠে না। অসুবিধায় পড়ে গেল সুদর্শন।

কতরকম বিজনেস চালাচ্ছে অম্বর? ও কি টাকার পাহাড় তৈরী করতে চায়? চাইলে ও পারে বইকি! অম্বর অনেক কিছুই পারে যা অনেকে পারে না। সাধে কি শুধু একজনের সাহায্যের ভরসাতেই সুদর্শন কলকাতায় চলে এলো! না, কোন আত্মীয়-স্বজন, দাদার কোন বন্ধু-বান্ধব—কারো কাছে সে একটি বারের জন্যেও গিয়ে দাঁড়াবে না। কেন যাবে? টাকা-পয়সা যতটা এনেছে সে, কলকাতায় একটা কিছু শুরু করার পক্ষে যথেষ্ট। তবে টাকাগুলো এভাবে সঙ্গে নিয়ে ঘোরাফেরা করা ঠিক হবে না।

সুদর্শন অম্বরদের হোটেলের ক্যাশে যে সর্দারজীটি বসেছিল তাকে জানিয়েছিল সে আবার সন্ধ্যের পর আসবে। অম্বর যেন এখানেই থাকে। ছোট্ট একটা কাগজে দু-লাইন লিখেও দিল আর এখানের নাম্বারটা নিয়ে রাখল সেই সঙ্গে।

এখন কোথায় যাওয়া যায়? আরো দুটো ঠিকানা তার জানা আছে। এক চাঁদনীতে নিতাই খুড়োর রেডিওর পার্টস্-এর দোকান —সে তো দশটার আগে খুলবে না। আর সেখানে গিয়ে টাকাগুলো রাখারও কোন ব্যবস্থা করা যাবে না। দু নম্বর হল অর্ণব মিত্রের বাড়ি। ভবানীপুর থেকে দূরও নয়। বালীগঞ্জে। কিন্তু ওই সব অধ্যাপক মানুষ-টানুষ-এর সঙ্গে তার মোটে সড়গড় হয় না সম্পর্কটা। এসব লোকজন থেকে সে দূরে থাকতেই ভালবাসে বরাবর। সুদর্শন এর ধারেকাছে নেই। সত্তর-একাত্তরের অমন টালমাটাল অবস্থাতেও বলে সে আঁতেল লোকজনের আওতায় আসেনি। ঠিক গা বাঁচিয়ে থেকেছে—ওই অম্বরদের মতই।

তাহলে কি করবে সারাদিনটা? হাতে ব্যাগ নিয়ে, সঙ্গে টাকা নিয়ে ঘুরবে এইভাবে! তা হয় না। তার চেয়ে বরং প্রফেসর মিত্রর

কাছেই যাওয়া যাক। চেনা লোক, কলকাতায় আছে চিরকাল, প্রভাব প্রতিপত্তি তো কম নয়। কখন কাকে কাজে লাগে বলা যায়? দেখা করে আসা যাক তো একবার। দাদার সঙ্গে যতই ঝগড়া হোক সুদর্শনের, দাদার বন্ধুর সঙ্গে তো কিছু হয়নি। আগেরবার যখন অর্ণবদা শিলিগুড়িতে গ্রুপ নিয়ে গেছিলেন তখন সুদর্শনের সঙ্গে তো বেশ ভাল আলাপ হয়েছিল। অবশ্য তখন সুদর্শনের লক্ষ্য অর্ণব মিত্র ছিল না। ছিল নাটকের গ্রুপের গোটা তুয়েক মেয়ে। সুদর্শন চেষ্টা করেছিল, কিন্তু এগোতে পারেনি। সময় ছিল খুবই অল্প। তার ওপর অর্ণব মিত্র আর তনয়া মিত্রের তুজোড়া প্রখর চোখ।

কিন্তু এইভাবে, ভাল পোশাক না পরে যাওয়া যায় কি? অবশ্য ট্রেনের চুরির ঘটনাটা খুলে বললেই হলো। সাতপাঁচ ভাবতে ভাবতে সুদর্শন বালিগঞ্জের ট্রামে উঠে পড়ে। বেশ ফাঁকা ট্রাম। বসার জায়গা আছে যথেষ্ট। নতুন রঙ-করা গাড়ি। ভেতরটা তো খুব সাজিয়েছে। ববাঃ! যাত্রীদের আসনে তো বেশির ভাগই মেয়ে! কলেজের মেয়ের দঙ্গল। কি ফাইন কিচমিচ করছে! আহা, এমন একটা ট্রামে যদি সারাটা দিন কেটে যেতো! অর্ণব মিত্রের বাড়িতে যাওয়ার জন্যে যে স্টপেজটায় নামতে হবে সেটা যদি আজ নাইবা আসে! বেশ হয়। তু-একজন দেখছে তাকে। একবার দেখেছে যখন তখন আরো বারকয়েক যে দেখবে সে বিষয়ে সুদর্শন নিঃসন্দেহ। আপসোস হচ্ছে সেই সার্টটার জন্যে। অন্য যেগুলো ছিল সেগুলোও তো রীতিমত চোখে পড়ার মত। নতুন কোন একটা স্টাইল উঠলেই হলো। সঙ্গে সঙ্গে সুদর্শনের একটা হয়ে যায়। রঙিন সিনেমার কাগজ থেকে পাতা কেটে নিয়ে কতবার না সুদর্শন গেছে তার দর্জির কাছে। সেই সুদর্শনকে কিনা কলকাতায়, এমন একটা সুন্দর ট্রামে এক ঝাঁক মেয়ের মধ্যে এরকম সামান্য পোশাকে বসে থাকতে হচ্ছে! বরাত আর কাকে বলে! ঠিক আছে, এই তো সবে শুরু। সুদর্শন ভেতরে চ্যালেঞ্জকঠোর হয় আর মুখের ওপর একটা আকর্ষণের

হাসি ছড়াতে থাকে। সুদর্শন লক্ষ্য করে বাঁদিকের সীটের একটি মেয়ে তার বান্ধবীকে নিচু স্বরে কি বলাতে, বান্ধবীটি একবার চোখের কোণ দিয়ে তাকিয়ে নিল সুদর্শনের দিকে। শহরটা, সুদর্শন ভাবল, বজ্জাত লোকে ঠাসা থাকলে কি হবে—সুন্দরী মেয়েও তো আছে অনেক।

কিন্তু তার এই সুখ ভ্রমণের মেয়াদ যে খুবই সামান্য অল্প পরেই বোঝা গেল। একটা চৌমাথার মোড়ের আগে নেমে গেল সবকটি মেয়ে। একটু বেশি সময় দাঁড়াল ট্রামটি। সুদর্শন জানলা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে দেখল ওদেরকে। কয়েকজন তো নেমেও ফিরে তাকাল তার দিকে। এই সব মুহূর্তগুলোতে একই সঙ্গে দুটো মেজাজ গোল পাকিয়ে যায়। ভাল পোশাক পরনে না থাকায় ভেতরে হা-হুতাশ চলে। সে যে অনেক তরুণীর চোখে আকর্ষণীয় হয়ে উঠছে এই সুখে একটা জামা-কাপড়ের ব্যাগ হারানোর দুঃখকে খুব একটা বেশিকিছু বলে মনে হয় না।

সুদর্শন তার জিন-এর প্যান্টের সামনের পকেটে হাত ঢুকিয়ে রুমাল বার করে। বড় নোংরা হয়ে গেছে রুমালটা। ভাঁজ পাল্টে নেয়। অপেক্ষাকৃত কম ময়লা দিকটা দিয়ে আর একবার ভাল করে মুছে নেয় মুখটা। পুরনো ট্রামগুলোতেও কি এতো বড় আয়না লাগানো? সে ঠিক মনে করতে পারে না। জানলার সামনে থেকে একটু সরে আসতে হয় মুখ দেখার জন্যে। পেছনের পকেট থেকে চিরুণী বার করতে গিয়েও কেমন যেন সংকোচ হয় তার। ট্রামের যাত্রীরা বারবার তাকাক তার দিকে, কিন্তু সে নিজে যে তার চেহারা সম্পর্কে খুব সচেতন সেটা লোকে না বুঝতে পারলেই ভাল। পেছনের পকেট থেকে হাত বার করে এনে সে চিবুকের ওপর ঘষে দেখে নেয় দাড়ি কামানো হয়নি। অবিশ্যি তার ওই খুব ফরসা চামড়ার ওপর দাড়ির সবুজ প্রলেপ মন্দ লাগে না। অনেক মেয়ে আবার এটাই বেশি পছন্দ করে।

॥ দুই ॥

গোল, ছোট আয়নাটা সামনে দাঁড় করানো। গালভরা সাবানের ফেনা। ব্লেডটা ঠিকমত লাগিয়ে, বাঁ হাত দিয়ে ডান কানের পাশের জুলপির চুল তুলে, ডান হাতের ব্লেডটা প্রথমবার টেনে নামাতে না নামাতে বেল বেজে উঠল।

অর্ণব আয়না থেকে মুখ তুলল না। রান্নাঘরে তনয়া আছে। তনয়ার পায়ের শব্দ পাওয়া গেল। দরজার দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। গালের ডানপাশটা যখন পরিষ্কার হয়ে এসেছে, তখন একই সঙ্গে তনয়ার গলা এবং পায়ের শব্দ এগিয়ে এলো ঘরের মধ্যে।

'এই, ছাখো, শিলিগুড়ির হীরোর কলকাতায় পদার্পণ।' বলে হাসতে হাসতে তনয়া একবার তাকিয়ে নিল সুদর্শনের দিকে।

অর্ণব এবার মুখ তুলল আয়না থেকে। সুদর্শনকে দেখল। হেসে বলল, 'আরে! যুবরাজ যে! কবে এলে কলকাতায়? দাদার খবর কি?'

'আজই এলাম। দাদার খবর ভাল।'

'বোসো দাঁড়িয়ে রইলে কেন?' তনয়া সুদর্শনকে সামনের সোফাটা দেখিয়ে দেয়। সুদর্শন বসে। পাশে রাখে কালো ব্যাগটা। নিজের জুতোর দিকে একবার তাকিয়ে নেয়। খুব ধুলো জমেছে। ট্রামে ওঠার আগে জুতোটা অন্তত পালিশ করে নেওয়া উচিত ছিল।

'বৌদি কেমন আছেন? বাচ্চারা?' তনয়া দাঁড়িয়ে থেকেই প্রশ্ন করে।

'সবাই ভাল আছে।' সুদর্শন সংক্ষিপ্ত উত্তর দেয়।

'তুমি কি কোন কাজে এলে কলকাতায়? না, এমনি বেড়াতেই?' বাঁদিকের গাল পরিষ্কার করতে করতে, আয়নার দিকে তাকিয়েই অর্ণব জানতে চায়।

'ঠিক কোন কাজ হাতে নিয়ে আসিনি। আবার বেড়াতেও আসিনি। এবার কাজে নামবো বলে এসেছি। শিলিগুড়িতে কিছু হচ্ছে না।'

'এখানে কি ধরনের কাজে নামবে? তোমাদের পুরনো ব্যবসাতেই?'

তনয়া বলল, 'তোমরা কথা বল, আমি আসছি রান্নাঘর থেকে।' বলে চলে গেল।

'না। ওই বিজনেসে আমি, বুঝেছেন, খুব একটা সুবিধে করতে পারছি না। আমি ভাবছি কি—ওই আপনার, ট্রান্সপোর্টের লাইনে যাবো। ট্রান্সপোর্টে আমার খুব ইন্টারেস্ট আছে।'

'হ্যাঁ। সে কথা তো তোমার কাছ থেকে আগেও শুনেছি।'

'আমার বন্ধু অম্বর সিং—ওই-ই গোড়ার দিকে সাহায্য করবে আমায়। খুব করিৎকর্মা ছেলে। ওর থ্রুতেই আমার একটি মিনিবাস পাওয়ার চান্স আছে।'

'আগের বার যখন কলকাতায় এসেছিলে—ওর কাছেই তো ছিলে —তাই না?' অর্ণবের প্রথমবারের মত কামানো হয়ে যায়। দ্বিতীয়-বার গালে সাবান মাখাতে থাকে।

'এবারও ওর কাছেই থাকবো। কিন্তু ওর তো আবার হাজারটা বিজনেস। কি একটা জরুরী কাজে দুর্গাপুরে চলে যেতে হয়েছে ওকে —আজ সন্ধ্যেতে ফিরবে।'

'তাহলে এবেলা তুমি আমাদের এখানে খেয়ে যাও। তনয়া স্কুলে যাবে, আমার কলেজ অবিশ্যি আজ একটু দেরিতে।'

'ট্রেনে এক কাণ্ড হয়েছে।'

'তোমার? ট্রেনে? কি কাণ্ড?'

'একটা লাল ব্যাগের মধ্যে আমার সমস্ত জামাকাপড় গাগলস্ মোজা ছিল। চুরি হয়ে গেছে!'

'সেকি! তোমার মত ছেলের কাছ থেকে চুরি!'

'ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। ভাগ্যিস টাকার ব্যাগটা মাথায় দিয়ে শুয়েছিলাম! এই যে এই ব্যাগটা।' সুদর্শন কালো ব্যাগটা দেখায় অর্ণবকে। তারপর বলে, 'আপনার কাছে এলাম—টাকাগুলো রাখার ব্যবস্থা করতে। অম্বরের সঙ্গে দেখা না হওয়া পর্যন্ত তো—

'টাকা রাখার ব্যবস্থা? ব্যবস্থা মানে তো ব্যাঙ্ক। সে আর এমন কি। দশটার পর বেরিয়ে সে রেখে দেওয়া যাবে। সাউথের ব্যাঙ্ক, মানে, এই সাউথ ক্যালকাটায় আর কি, হলে সুবিধে হবে তো তোমার?'

'হ্যাঁ হ্যাঁ। আমি তো ভবানীপুরেই থাকবো। গাড়ি বার করার ব্যাপারেও ব্যাঙ্কের টাকাটা আমায় শো করাতে হবে।'

অর্ণবের দাড়ি কামানো শেষ হয়ে গেছিল। প্ল্যাস্টিকের কাপ, ব্রাশ আর ব্লেড হাতে নিয়ে সে উঠে দাঁড়িয়ে বলে, 'বোসো, আমি আসছি।'

সুদর্শন হাত বাড়িয়ে বাংলা খবরের কাগজটা টেনে নেয়। অর্ণবের দোতালার এই ঘরটা ছোট হলেও ভারি ছিমছাম করে সাজানো। ছোট সোফা সেট। মাঝখানে গোল নিচু টেবিল একটা। চমৎকার কাজ করা একটা অ্যাস্ট্রে। দেওয়ালে একটাই ছবি। রবীন্দ্রনাথের। রঙিন। তিন দেওয়াল জোড়া বইয়ের সেলফ্। প্রথমটায় ঢুকলে মনে হবে কোন লাইব্রেরীতে এলাম বুঝিবা। তবে অ্যাডভোকেটদের বসার ঘরে যেমন বই ঠাসা থাকে—এ বইপত্তর তেমন বইয়ের পাহাড় নয় তা দেখেই বোঝা যায়। পশ্চিমের জানলার কাছ বরাবর একটা টেবিল পাতা। অর্ণব বেশির ভাগ সময় এখানে বসে পড়াশোনা করে। টেবিলে চায়ের কাপ প্লেট পড়ে আছে। খানিক আগেই, সম্ভবত দাড়ি কামানোর আগে, সকালে প্রথম চায়ের কাপটি শেষ করেছে অর্ণব।

সুদর্শন খবরের কাগজের পাতা খুলে সিনেমার বিজ্ঞাপন দেখে খুব মনোযোগ দিয়ে। অল্প পরেই তনয়া আসে খাবারের প্লেট হাতে নিয়ে। নিচু গোল টেবিলটার ওপর প্লেট রেখে সুদর্শনের দিকে তাকিয়ে বলে, 'খেতে শুরু করো, আমি চা নিয়ে আসছি।'

সুদর্শন ভদ্রতা দেখানোর স্বরে বলে, 'আপনার এখন স্কুল যাওয়ার তাড়া—এর মধ্যে আবার এসব কেন?'

তনয়া স্নেহের ধমকের মত করে বলে, 'থামো তো! তোমার মুখে এসব শুনতে মোটেই ভাল লাগে না। ট্রেন থেকে নামলে—কোথায় জোর করে খাওয়ার জন্যে চেঁচামেচি করবে—'

'আমি নেমেই তো খেয়ে নিলাম।' নামানো গলায় বলে সুদর্শন।

তনয়া আবার আগের মত করে বলে ওঠে, 'ফের ফর্মালিটি শুরু করলে।'

'অভ্যেস করছে। কলকাতায় থাকতে হবে তো। তাই ভাবছে এগুলো ঠিকমত রপ্ত না করতে পারলে যুতসই হবে না।' বলতে বলতে অর্ণব ঘরে ঢুকে আসে আবার। তারপর উল্টো দিকের সোফায় বসে সুদর্শনের দিকে তাকিয়ে বলে, 'তোমার কি মনে হয়, আমরা যারা কলকাতায় থাকি—তারা সবাই একটা কৃত্রিমতা নিয়ে থাকি?'

'সে কথা আবার কখন বললাম?' সুদর্শন একটু অবাক হয়ে হাসে।

'বলোনি, তবে মনে মনে ভাবো। সবাই ভাবে। অবিশ্যি ভাবার কারণ আছে নিশ্চয়ই। ও কি, হাত গুটিয়ে বসে রইলে কেন? চালাও। আর তনু, আমার জন্যেও এনো এক কাপ।' বলে অর্ণব তনয়ার দিকে তাকায়।

'সে আর বলতে!' বলে রান্নাঘরে ফিরে যায় তনয়া।

চামচ দিয়ে ডিম ভাজা ছিঁড়তে ছিঁড়তে সুদর্শন বলে, 'এখান থেকে বেরিয়ে সবচেয়ে আগে আমায় একটা সার্ট-প্যান্ট কিনতে হবে। এটার যা দুর্দশা হয়েছে।'

'আমারটা দিয়ে তোমার চলতো যদি—তাহলে নয় আপাতত চালিয়ে নিতে। কিন্তু আমার তো বেশির ভাগই সাধারণ পাঞ্জাবি। সার্ট-প্যান্টও আছে দুজোড়া—তবে সেটা তোমায় পরতে বললে তুমি বোধহয় আমার বিরুদ্ধে মানহানির মামলা ঠুকে দেবে।'

সুদর্শন টোস্টে কামড় বসিয়ে হাসে কিছুক্ষণ।

অর্ণব আবার বলে, 'আগে চল, তোমার টাকাটা ব্যাঙ্কে জমা করে দিই। ব্যাঙ্কের লোকেরা নিশ্চয়ই খদ্দেরের জামাকাপড়ের চেয়ে জমা দেবার টাকাটার দিকেই নজর দেবে বেশি। তাছাড়া, এই গোল-গলা হলুদ গেঞ্জি আর নীল জিন্সের প্যান্টে তোমায় বেশ সপ্রতিভ দেখায়। পোশাকের আতিশয্য তোমার চেহারায় বাহুল্য মাত্র।'

কেমন সুন্দর করে বাংলা বলতে পারে অর্ণবদা। শিলিগুড়িতে প্রথম যেদিন দাদা আলাপ করিয়ে দিয়েছিল এই অর্ণব মিত্রের সঙ্গে, সেদিনই মানুষটার সবচেয়ে বেশি যে গুণটা সুদর্শনের আকর্ষণে এসেছে, তা হলো বাংলা বলার বাহাদুরী। তার দাদাও বেশ গুছিয়ে কথা বলে। কিন্তু অর্ণবদার মতন নয়। এ ব্যাপারে এ মানুষটার সঙ্গে আর কারো তুলনাই হয় না। গলার স্বরটাও কেমন ভারি অথচ মিষ্টি। আর উচ্চারণের তো কথাই নেই। এতো সুন্দর সুন্দর কথা এতো তাড়াতাড়ি মানুষের মুখে যে কিভাবে এসে যায় সুদর্শন ভেবে পায় না। শিলিগুড়িতে একদিন সুদর্শন বলেও ছিল, 'আপনি কিন্তু দারুণ কথা বলতে পারেন।'

'কথা বেচে খাই তো।' অর্ণব মিত্র উত্তর দিয়েছিল হাসতে হাসতে। 'থাকার মধ্যে ওইটুকুই তো আছে ভাই।'

না, ওইটুকুই নয়। অর্ণব মিত্রের আরো অনেকটুকু আছে। দেখতে এমন কিছু দারুণ নয়, তবু কালো লম্বাটে ধরনের মুখের ওপর ভারি চশমায় মানুষটার চেহারা মনে রাখার মত। সুদর্শনরা যেমনটা হতে চায়, পুরুষের রূপ বলতে তাদের কাছে যে রকমটা বোঝায়

অর্ণব মিত্র তার ধারেকাছে নেই। বরং একেবারে উল্টো। অথচ তবুও, তবুও মানুষটার চেহারার মধ্যে এমন কিছু একটা আছে যাকে সুদর্শন বাহবা দিতে না চাইলেও উপেক্ষা করতে পারে না। সোজা কথায় কি একেই বলে 'শিক্ষার ছাপ'। হবেও বা। কিংবা আরো কিছু। আরো অন্য কিছু।

সুদর্শন কি অর্ণব মিত্রের মত কথা বলতে চায়? কথায় বলে কথা বলা একটা মস্ত আর্ট। সুদর্শন কি তেমন আর্টের আর্টিস্ট হতে পারলে খুশি হয় না? হয়, কিন্তু তার জন্যে যে পরিশ্রমের দরকার, যে ধরনের জীবন-যাপনে অভ্যস্ত এই চমৎকার কথা বলতে পারা মানুষগুলো—সুদর্শন তাদের দলের হতে চায় না কিছুতেই। সুন্দর চেহারার সঙ্গে সুন্দর বলার গুণ মিশলে আকর্ষণ দ্বিগুণ হয় ঠিকই—কিন্তু তার জন্যে সুদর্শনের কোন টান নেই। অবশ্য কথা বলতে শেখার একটা আগ্রহ তার আছে। সেটা বাংলায় নয়, ইংরেজীতে কথা বলা। অম্বর কেমন চারটে ভাষা বলতে পারে—বাংলা, ইংরেজী, হিন্দী এবং তার নিজের ভাষা পাঞ্জাবী। অম্বরের সঙ্গে কথা বলার সময় সে ইংরেজীতে চেষ্টা করে সারাক্ষণ। স্মার্ট চেহারার সঙ্গে স্মার্ট ইংরেজী—কলকাতায় তার সাকসেসের আসল দুটি চাবিকাঠি। প্রথমটি তার যথেষ্ট আছে। দ্বিতীয়টিও যথেষ্ট হয়ে উঠবে চেষ্টা করলে।

অর্ণব সিগারেট ধরাঁনোর আগে সুদর্শনের দিকে বাড়িযে দেয় প্যাকেটটা। এ ব্যাপারে দাদার বন্ধুর সঙ্গে প্রথমদিনই আপোষ হয়ে গেছিল সুদর্শনের। মানুষটা কতকগুলো ব্যাপারে খুব সহজ। চট করে মিশে যাওয়া যায়। অবশ্য মিশে বেশিক্ষণ থাকা যায় না। কেমন অস্বস্তি লাগে।

'খাওয়াটা শেষ করি আগে।' সুদর্শন ডিম ভাজার শেষ অংশ-টুকু মুখে নিতে নিতে বলে।

অর্ণব সিগারেট ধরায়। মুখ থেকে সিগারেট নামিয়ে বলে,

'প্রশান্ত রক্ষিত মাঝে মাঝে চিঠি লেখে আমায়। কবিতা পাঠায়। ওরও তো খুব ইচ্ছে কলকাতায় চলে আসার। আমি ওকে আদৌ উৎসাহ দিইনি।'

'প্রশান্ত তো?' হেসে সুদর্শন প্রায় বলে ফেলেছিল, 'ও ব্যাটা তো', কিন্তু সামলে নিয়ে বলে, 'ও তো কবি না হয়ে ছাড়বে না। কলকাতার কি একটা পুচকে কাগজে ওর একটা পদ্য ছেপেছে, সেই নিয়ে তো ও শিলিগুড়ি মাত করে ছাড়ল। কত ছেলের অমন বেরয়। পাগল।'

'এমন পাগল তো সারা দেশে কম নেই যুবরাজ। সবাই ভাবে কলকাতা-বিজয় করতে না পারলে কিছু হবে না। একটু পড়াশোনা শিখলেই সোনার হরিণটা চোখের সামনে নাচতে শুরু করে দেয়।' একটু চমকের মতো লাগে সুদর্শনের। অর্ণব মিত্র তাকে উদ্দেশ্য করে কথাটা বলল না তো। সুদর্শন কি সোনার হরিণের নাচ দেখছে? ধ্যাৎ। তা হবে কেন? সুদর্শন কি আর প্রশান্তর মতো অবাস্তব কল্পনার পেছনে ছুটে বেড়াচ্ছে নাকি? তার হিসেবে কোন খাদ নেই। খুব প্র্যাকটিক্যাল মানুষ সে। নিজে যেমন মানুষের মন নিয়ে নাড়ানাড়ি না করে, ফালতু সেন্টিমেন্টের ওঠাপড়ায় না গিয়ে একেবারে হাড়মাংসের মানুষ নিয়ে কারবার করতে ভালবাসে, তেমনি তার চিন্তাভাবনাগুলোও। বেঁচে থাকবে সে লাইফকে এনজয় করার জন্যে। তার জন্যে যা যা দরকার তাই করবে। সুদর্শন অর্ণব মিত্র হতে চায় না। আর যাই হওয়া যাক না কেন অমন বিদ্বান বোকা হয়ে থাকা তার পক্ষে অসম্ভব।

ট্রেতে করে চা আসে দু কাপ। অর্ণবদের সংসারের তোলা কাজের মেয়েলোকটি নিয়ে আসে। ট্রে থেকে একটা কাপ প্লেট গোলটেবিলের ওপর নামিয়ে রাখে, অন্যটা তুলে দেয় অর্ণবের হাতে। যাওয়ার সময় খাবারের খালি প্লেটটা তুলে নিয়ে যায়।

বেশিদিনের সংসার নয় অর্ণব আর তনয়ার। বছর তিনেকের।

কিন্তু এমন সাজানো গোছানো পরিপাটি দেখলে মনে হয় যেন অনেক-দিনের অভিজ্ঞতা দিয়ে গড়া। অবশ্য এখনো শুধু দুজনের বলে হয়তো এতো গুছোনো ঝকঝকে থাকে। সুদর্শনের দাদার সংসারের মতো গোটা দুয়েক ছোটখাটোর দাপাদাপি শুরু হলেই হয়তো চেহারা পাল্টে যাবে।

তনয়া শাড়ির আঁচল দিয়ে মুখ হাত মুছতে মুছতে ঘরে এলো। খুব সাধারণ একটা মিলের শাড়ি পরনে। মাথার ঘন চুল এলো খোঁপা বাঁধা। এতোক্ষণে তনয়ার পায়ের দিকে নজর পড়ে সুদর্শনের। একটু অবাক হয়। কলকাতার মহিলারা এখনো পায়ে আলতা পরে নাকি! তনয়ার ফর্সা পায়ে সরু করে আলতা পরানো দেখে আচমকা কুসুমকাকির কথা মনে আসে সুদর্শনের। তনয়া বৌদি আর কুসুম-কাকির মধ্যে কোন দিক থেকেই ছিটেফোঁটা মিলও নেই। তবু পায়ের আলতার সরু ঘেরাটোপ দেখে কুসুমকাকির কথা মনে এসে যায়।

অর্ণব তনয়াকে বলে, 'তোমার রান্নার কতদূর? সুদর্শন আজ—'

'হ্যাঁ। আমি ব্যবস্থা করে এলাম। তোমাদের দুজনের সব গোছানো থাকবে খাবার টেবিলের ওপর।' বলে তনয়া সুদর্শনের দিকে তাকিয়ে বলে, 'গতকালই ছুটি নিয়েছি তো, তাই আজ আর ডুব দিতে চাইছি না, না হলে আজ ঠিক স্কুল করার মেজাজ নেই।'

'কেন? শরীর খারাপ নাকি আপনার?' সুদর্শন তনয়ার মুখের দিকে তাকিয়ে বলে।

'না না। গতকাল আমাদের মণিকার বিয়ে ছিল তো। আর আমাদের গ্রুপের কারো বিয়ে মানে তো জানো না! সবাই মিলে সকাল থেকে মাঝরাত পর্যন্ত একেবারে উৎসবের কাজে মাতোয়ারা থাকে। আজ তো বেশ দেরি করে উঠেছি। অন্যদিন তো সাড়ে আটটা নটার মধ্যে আমার রান্না শেষ হয়ে যায়।'

'তার ওপর আজ আবার আপনার কাজ বাড়িয়ে দিলাম আমি এসে।' মুখ থেকে চায়ের কাপ নামাতে নামাতে সুদর্শন বলে।

'কাজ কমা-বাড়ার সে তুমি কিছুটি বোঝো না। বেশ বোঝা যাচ্ছে। দুজনের ঝোল-ভাতের জায়গায় তিনজন, এতে কাজ বাড়ে না হে যুবরাজ।' বেশ লঘুস্বরে কথা শেষ করে তনয়া।

তনয়ার চেহারায় লঘু ভাবটা একেবারেই নেই। শান্ত শ্রী আছে। তবে কথা বলার সময় স্বরে এমন একটা আন্তরিকতা মিশিয়ে রাখে যাতে মানুষটিকে কখনোই দূরের মনে হয় না। অথচ সুদর্শন কাছের বলতে নারী সম্পর্কে যে ধারণা নিয়ে চলে তনয়াকে তার মধ্যে ফেলা যায় না। মেয়েদের মুখের দিকে তাকালেই সুদর্শন বুঝতে পারে সেখানে তার কতটুকু জায়গা আছে। যেমনটা জায়গা সে চায়—তেমন জায়গা।

কলিংবেল বেজে ওঠে। তনয়া উঠে দরজা খুলতে যাওয়ার আগে কপাট খুলে যাওয়ার শব্দ শোনা যায়। গীতা,—কাজের মেয়েটি দরজা খুলে দিয়েছে।

সুদর্শনের বয়সী একটি ছেলে ঘরে ঢুকল। প্যাণ্টের ওপর রঙীন পাঞ্জাবি পরে। ঘাড় পর্যন্ত নামানো চুল। চোখে চশমা। প্রথমে সুদর্শন চিনতে পারেনি। কথা বলতে চিনতে পারল। অর্ণব মিত্রের নাটকের গ্রুপের ছেলে উজ্জ্বল। শিলিগুড়িতে নাটক করেছিল। এই ছেলেটাকেই তো তখন মণিকার পাশে পাশে বেশি দেখেছিল। সুদর্শন ভেবেছিল এর সঙ্গে বোধহয় একটু বেশি সম্পর্ক আছে মণিকার। অবশ্য সে জন্যে সুদর্শন নিজের চেষ্টা ছাড়েনি। চেষ্টাটা মার খেল। সচরাচর এমনটা হয় না। বস্তুত, এর আগে কখনো এ ভাবে ডাহা হেরে যায়নি সে। সুদর্শনের মনে লেগেছিল খুব। এমন কিছু ডানাকাটা পরী ছিল না মণিকা। তবে সুদর্শনের চোখের ডাককে মণিকা কোন সাড়াই দেয়নি। ক্ষুব্ধ হয়েছিল সুদর্শন। দুদিনেই উজ্জ্বল ছেলেটাকে কেমন যেন তার প্রতিদ্বন্দ্বী মনে হয়েছিল।

উজ্জ্বল ঘরে ঢুকে সোফায় বসতে বসতে গোলটেবিলে চায়ের

রূপ দেখে বলল, 'চাটা মিস করলাম তো। বাসটা কিছুতেই আর পাঁচ মিনিট আগে আসতে পারল না।'

তনয়া আবার রান্নাঘরে ফিরে যাবার আগে বলল, 'অত হা-হুতাশ না করলেও তোমার চা আসবে।'

· উজ্জ্বল হাসতে হাসতে বলল, 'আমি তো ভেবেছিলাম, তোমরা তনয়াদি—নটা পর্যন্ত বিছানায় পড়ে থাকবে।'

'তেমন কুঁড়ে হ'তে আমায় কবে দেখলে উজ্জ্বল? কতবার বাইরে নাটক ক'রে সারারাত ট্রেনে না ঘুমিয়ে এসে পরের দিন সকালে ক্লাস নিয়েছি খেয়াল আছে?'

'তোমরা বাকিরা সব কখন এলে?' অর্ণব জানতে চায়।

'আমরা চারজন তো আর বাড়ি ফিরিনি। সকালে চাটা খেয়ে যে যার বাড়ির দিকে রওনা দিল। আমি এলাম সটান এখানে—একটা কথা বলতে। কাল আপনাকে বলতে ভুলে গেলাম—আজ আমার রিহার্সালে আসতে দেরি হতে পারে। বাবা মা ফিরছেন আজ। আমায় হাওড়ায় যেতে হবে বিকেলের দিকে।'

'ঠিক আছে। যত তাড়াতাড়ি পারো এসে পোড়ো। হাতে তো আর খুব বেশি সময় নেই।' বলে অর্ণব সুদর্শনের দিকে চোখ ফেরায়। উজ্জ্বলকে বলে, 'যুবরাজকে মনে নেই তোমার?'

সুদর্শন তক্ষুণি উজ্জ্বলের দিকে তাকিয়ে বলে, 'আপনি চশমা নিলেন কবে? চিনতে তাই একটু দেরি হল।'

উজ্জ্বল হেসে বলল, 'হ্যাঁ, চশমা নেওয়ার পর আমার মুখের আদলটা নাকি বেশ পাল্টে গেছে।'

'হ্যাঁ, এখন বেশ বুদ্ধিদীপ্ত মনে হয়।' অর্ণব হাসির মত করে বলে।

'তার মানে তুমি বলছো আগে ওকে খুব বোকা বোকা মনে হতো?' বলে তনয়া শব্দ করে হেসে ওঠে।

'তুমি তো দেখছি আমায় জোর করে বলিয়ে নেবে।'

'বলে দিন অর্ণবদা' উজ্জ্বল ঠাট্টার সুরে বলে, 'তাহলে আমার চাটা তাড়াতাড়ি আসার চান্স আছে।'

ওদের তিনজনের কথার মাঝখান থেকে সুদর্শন একটু বিচ্ছিন্ন থাকে। বইয়ের র‍্যাকে চোখ বুলোয়। দামি দামি মোটা বইয়ের সারি। কত টাকার বই আছে এ ঘরে? একটা ইংরেজী বইয়ের দিকে নজর পড়তেই সুদর্শনের খুব ইচ্ছা করে দেখতে। ইংরেজী বই। বাংলা করলে নামটা দাঁড়ায় 'গারাড়সোমের যৌন রোজনামচার'। লেখকের নাম কলিন্স উইলসন। এসব বই অর্ণবদা রাখে কেন? একজন দুজন ছাড়া ইংরেজ কোন লেখকের নামই সুদর্শনের জানা নেই। ওই কলিন্স উইলসন বড় লেখক না ফালতু? তাও তার জানার কথা নয়। এমনিতে বই পড়ার অভ্যেস তার একেবারে নেই। কিন্তু ওই সেক্সডাইরী কথাটা তাকে খুব টানতে শুরু করে দেয়।

॥ তিন ॥

ব্যাঙ্কে টাকাগুলো জমা পড়ার পর সুদর্শনের নিজেকে বেশ খানিকটা ঝাড়া-হাত-পা মনে হলো। অর্ণব চলে গেল কলেজে।

সুদর্শন বলল, 'রোববার সকালে যাবো আপনার বাড়ি।'

অর্ণব বলে গেল, 'সন্ধ্যেবেলা দেখা করতে চাইলে আমাদের রিহার্সাল রুমে আসবে শনিবার আর রোববার।' অর্ণব ঠিকানা দিয়ে গেল সুদর্শনকে।

অর্ণব ট্রামে উঠে যাওয়ার পর, সুদর্শন এসপ্লানেড যাওয়ার জন্যে উল্টোদিকের বাস স্টপেজে এসে দাঁড়ায়। বেলা বাড়তে বাড়তে অফিস টাইম পেরিয়ে গিয়েও এগিয়ে গেছে খানিকটা, কিন্তু এসপ্লানেড-গামী গাড়িতে ভিড় আর যেন পাতলা হতে চায় না। একটার পর একটা বাস ছেড়ে দেয় সুদর্শন। ওভাবে ঝুলে যেতে ইচ্ছে করে না তার। কিন্তু এভাবে বাস স্টপেজে চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকাও খুব বিরক্তিকর। তাই, শেষ পর্যন্ত যাত্রী ঝুলে কাত হয়ে যাওয়া একটা ডবল-ডেকার বাসে অতিকষ্টে পা রেখে সুদর্শন ঝুলে পড়ে।

ভিড় বাসে চড়া এমনকি; ভিড় বাসের হ্যাণ্ডেল ধরে ঝোলাও সুদর্শনের কাছে নতুন নয়। কিন্তু দোতলা বাসে এভাবে ঝোলার ঠিক অভ্যাস না থাকায়, বিশেষ করে এক হাতে ব্যাগ নিয়ে, অন্য হাতে হ্যাণ্ডেল ধরে রাখতে, তাকে বেশ অসুবিধেতে পড়তে হয়।

না না করলেও তনয়া তাকে খাইয়েছে বেশ। এমনিতে একটু আয়েসী সে। স্নান-খাওয়ার পর নরম বিছানায় শুয়ে থাকতে ভাল লাগে তার। কিন্তু মনে মনে সুদর্শন প্রতিজ্ঞা করেছে—আজ থেকে

সে অন্যভাবে থাকবে। দাদার সঙ্গে ঝগড়া করে, একটা চ্যালেঞ্জ নিয়েই সে এসেছে এই শহরটাতে—এটা ভুললে চলবে না। তার সুখ চাই, মজা চাই। কিন্তু জয় চাই। দাদারা যে কতখানি বোকা এটা চোখে আঙুল দিয়ে দাদাকে দেখিয়ে দিতে হবে। আর অর্ণব মিত্র? লোকটা ভাল—এই পর্যন্ত।

বাসে ঝুলতে ঝুলতেই সুদর্শন লক্ষ্য করে একটা মেয়েস্কুলের বাস আসছে। বাসটার পেছনে পেছনে। স্কুলের সময় পেরিয়ে গেছে তো! এখন তবে এরা কোথায় যাচ্ছে? ফ্রক পরাই শুধু নয়, শাড়ি পরা মেয়েও আছে অনেকগুলো। ওদের কেউ কি এই বাসে—এমন ঝুলন্ত অবস্থায় তাকে দেখছে? এদিকে দেখছে দু-একজন, কিন্তু ঠিক তাকেই দেখছে কিনা বুঝতে পারে না সে। সুদর্শনের ইচ্ছে করে ভিড়ে অবিন্যস্ত হয়ে যাওয়া চুলটাকে আঁচড়ে নিতে একবার। কিন্তু এ মুহূর্তে তেমন সুযোগ কোথায়! পকেটের চিরুণী পকেটে থাকে, সুদর্শন ঝোলে আগের মতই। ভিড়ের চাপে একচুল এদিক-ওদিক হওয়ার জো নেই পর্যন্ত।

ভবানীপুর ছাড়িয়ে যেতেই মেয়েস্কুলের বাসটা বড় রাস্তা ছেড়ে অন্য রাস্তায় বেঁকে গেল।

এরপর, অনেকগুলো স্টপেজ ছাড়িয়ে পার্ক স্ট্রীটের কাছের স্টপেজটাতে দু-একটা লোক নামল যখন, দুটি যুবতী নামল ঠেলাঠেলি করে। ভিড়ে পিষে যেতে যেতে, তারা দুজন নামল যখন সুদর্শনের বুক ঘেঁষে, তার কোমরে ঘন চাপ লাগল। দু নম্বর মেয়েটি চকিতে সুদর্শনের তলপেটে খামচে গেল যেন। ব্যাপারটা ইচ্ছাকৃত নাকি ভিড়ের ঠেলাঠেলির ফল—সেটা বোঝার আগেই বাস চলতে শুরু করেছিল আবার। আর ঠিক তখনই আর কয়েকজন যাত্রী বাসে উঠতে গিয়ে এমন জটলা পাকালো যে ভিড়ের ধাক্কা সামলাতে না পেরে, বেটাল হয়ে, ফুটবোর্ডের কিনারায় একজনের অবস্থা হয়ে উঠল সঙ্গীন, পড়ে গেল বোধহয়।

কিন্তু যাত্রীটি পড়ে যাওয়ার আগেই, ব্যাগসমেত হাতটা বাড়িয়ে সুদর্শন সেই যাত্রীকে টেনে তুলল। সুদর্শন ধরতে একটু দেরি করলে চোখের সামনে একটা দুর্ঘটনা ঘটে যেত নির্ঘাৎ।

'খুব জোর বেঁচে গেলেন দাদা। মস্ত একটা ফাঁড়া কাটল আপনার।' ফুটবোর্ডে দাঁড়িয়ে থাকা আর একজন যাত্রী বলে উঠল, 'ভাগ্যিস ওই দাদা টেনে নিল, নইলে আর এতক্ষণে দেখতে হতো না।'

বাস ততক্ষণে গান্ধী মূর্তি পেরিয়ে ছুটে যাচ্ছে যাদুঘরের সামনে দিয়ে। মন্তব্য চলছে একটার পর একটা। কলকাতার মানুষ খুব কথা বলতে জানে। এই ভিড় চাপাচাপি, বিশ্রী কষ্ট—কিছুতেই বাগযন্ত্র রুদ্ধ থাকে না। এ সবের মাঝখানে সম্ভাব্য দুর্ঘটনা থেকে সগু রক্ষা পাওয়া যুবকটির অবস্থা কেমন যেন করুণ মনে হয়। সুদর্শন তাকায় তার দিকে। একজন সুশ্রী যুবক। সাধারণ পোশাক। মুখে-চোখে শিক্ষাদীক্ষার ছাপ আছে বেশ। যুবকটি এতক্ষণে একটাও কথা বলেনি। শুধু সুদর্শনের দিকে তাকিয়েছে বারকয়েক। চোখে কৃতজ্ঞতা ভরে উঠেছে। স্মার্ট ছেলে। অবিনীত নয়। সুদর্শনের কাছাকাছি বয়স। শব্দ করে বাস ছুটে যায়।

যুবকটির দিকে আর না তাকিয়েও সুদর্শন বুঝতে পারে, তখনো সে তাকিয়ে দেখছে সুদর্শনকে। বার বার দেখছে।

লিণ্ডসে পেরিয়ে যাওয়ার পর যুবকটির কৃতজ্ঞতা জড়ানো কণ্ঠস্বর শোনা যায়, 'সত্যি, আজ আপনি না থাকলে ভয়ঙ্কর একটা অ্যাকসিডেণ্ট হয়ে যেতো।' বলল এই সামান্য কথাটুকু, কিন্তু তার চোখের দিকে তাকিয়ে মনে হলো যেন আরো অনেক কথা বলতে চাইছে। এমন চাউনি এর আগে আর কোথাও কারো চোখে সুদর্শন দেখেছে বলে মনে পড়ে না। যুবকটি স্প্লানেডে রিজ হোটেলের উল্টোদিকের স্টপেজটাতে নেমে যায়। চাঁদনীতে নিতাই খুড়োর সঙ্গে দেখা করবার জন্যে সুদর্শন আরো একটা

স্টপেজ এগিয়ে যায়। জ্যোতি সিনেমায় তার প্রিয় হীরোর ছবি চলেছে রমরম করে। পরে একবার চান্স নিতে হবে।

নিতাই খুড়ো তাকে দেখে খুব খুশি হলো। লোকটা এ ক'বছরে আরো অনেক বুড়িয়ে গেছে। একটা হেরে-যাওয়া মানুষ। কতকাল এসেছে এই শহরে। রেডিও পার্টস-এর দোকানে কর্মচারী হয়ে ঢুকে-ছিল। আজও সেই কর্মচারীই রয়ে গেল। ঠাণ্ডা মেরে যাওয়া জীবন। একগাদা ছানাপোনা নিয়ে টালিগঞ্জের বস্তিতে থাকে। এরা বড় শহরে আসে কেন? ছোট শহরে মরলেই পারে।

'কেমন আছ তোমরা সব?' সুদর্শন সামাজিকতা করে।

'আর বাবা আমাদের থাকা। নুন আনতে পান্তা ফুরোয়।' বুকের বাতাস বড় করে নামিয়ে জবাব দেয় নিতাই খুড়ো।

'তোমার ছেলেমেয়েরা তো বড় হয়েছে।'

'বড় ছেলেটা তো গোল্লায় গেছে। তার পরেরটি অবশ্য ভাল। মন দিয়ে পড়াশোনা করে। আর আরতি, আমার বড় মেয়ে খুব শান্ত, কিন্তু ছোট মেয়েটি হয়েছে তেমনি। ওটা একটা ধিঙ্গি হবে।'

এসব সাংসারিক বিবরণ শুনে সুদর্শনের হ্যাঁ, না কিছুই বলার থাকে না। চুপ করে শুনে যায় শুধু। রেডিওর দোকানের পাশের ছোট্ট ফাঁকা প্যাসেজটিতে একটা টুল এনে সুদর্শনকে বসতে দেয় নিতাই খুড়ো। ভাঁড়ে করে চা আনিয়ে দেয়।

ভাঁড়ের চায়ে চুমুক দিতে দিতে সুদর্শন ভাবে, বড় বোকা-সোকা মানুষ এরা। নিজের প্রব্লেম না বুঝেই কলকাতায় চলে এলো।

অবিশ্যি না এসেই বা উপায় কি ছিল নিতাই খুড়োর। কাজ করতো সুদর্শনদের কারবারে। বাবা খুব বিশ্বাস করতেন লোকটাকে। ব্যবসা গুটিয়ে নেওয়ার পর দাদা বলেছিল নিতাই খুড়োকে—শিলি-গুড়িতে ছোটখাটো একটা দোকান করার মত টাকা ধার দিতে পারে। সুদ দিতে হবে না। অল্প অল্প করে শোধ দিতে পারলেই হলো। ভীতু লোক। ভাবল—যদি ফেল মারে দোকান। টাকা যদি না শোধ

দিতে পারে—তাই রাজি হলো না। দাদাই খোঁজপত্তর নিয়ে চাঁদনীর এই রেডিও পার্টসের দোকানে চাকরীটা জুটিয়ে নিতাই খুড়োকে বৌ-বাচ্ছা সমেত পাঠিয়ে দিয়েছিল। কিন্তু বড় শহর মানে তো বড় চোর-চৌপাট্টার আড়ৎ, এখানে নিতাই খুড়োর মতো লোকেরা কোন কালেই মাথা তুলে দাঁড়াতে পারবে না। যেমন দাদা—তেমনি—

'তা হ্যাঁ ভাই, তুমি যে বলছো এবার থেকে এখানেই থাকছো—তার মানেটা বুঝলাম না। চাকরী নিয়েছো নাকি?' চশমার কাচ মুছতে মুছতে শুধোয় নিতাই খুড়ো।

'চাকরী? না না—ও সবে নেই। আমি এসেছি ব্যবসার ধান্ধায়। চাকরী আমার পোষাবে না। চাকরী করে ক-পয়সা পাবো! তাছাড়া মনের মত চাকরী দিচ্ছেটাই বা কে? আমাদের বয়সী বেশির ভাগ ছেলেই তো দেখি ফ্যা ফ্যা করে ঘোরে।'

নিতাই খুড়ো গলায় কেমন হতাশা এনে বলে, 'বড় শক্ত ঠাঁইরে ভাই।'

'এই শক্ত ঠাঁইতেই তো অম্বর সিংরা করে খাচ্ছে। দিনের দিন ফুলে ফেঁপে উঠছে।'

'ও ভাই আলাদা ধাতু দিয়ে গড়া। এলেম আছে ছোঁড়ার।'

'এলেম আমারও কম নেই। তুমি শুধু খুড়ো তাকিয়ে তাকিয়ে দেখে যাবে। ছাখ না, গোটা শহরটা কিরকম লুটে নিয়ে চলে যাই।'

সুদর্শনের কথা শুনে খুড়োর মারখাওয়া বাঙালী গেরস্তের মুখে নিরাশার হাসি জাগে আবার। বলে, 'না রে ভাই, বললাম না—সবার সবকিছু হয় না। তোমার বাবার হয়েছিল—তা কি অমনি অমনি। প্রথম জীবনে কি কষ্টটাই না করেছিলেন তোমাদের বাবা,—সে তো তাঁর নিজের মুখ থেকেই শোনা।'

'তখন ছিল কষ্ট করে কেষ্ট পাওয়ার যুগ। এখন যুগ পাল্টেছে তো দেখছোই। এখন যে যত ঝোপ বুঝে কোপ মারতে পারবে

—ছনিয়ায় তারই জয়জয়কার। বললাম, তুমি শুধু আমার দিকে তাকিয়ে দেখে যাও।' সুদর্শনের কণ্ঠে অটুট আত্মবিশ্বাস।

আরো খানিক সময় গল্প করে উঠে পড়ে সে। খুড়োর কাছে ব্যাগটা রেখে বলে, 'এটা থাক। দু-একটা জামা-প্যাণ্ট কিনে ফিরবো এক্ষুনি। পরশুদিন থেকে এটা পরে আছি।'

'কেন—জামা-প্যাণ্ট আর আনোনি?'

সুদর্শন ট্রেনের ঘটনাটা বলে।

নিতাই খুড়ো বলে, 'বুঝছো তো। কেমন জমিতে পা দিয়েছ? পা দিতে না দিতেই খেলে মোক্ষম ঝাড়।'

'ভালোই হয়েছে। ঝাড়টা গোড়াতেই হয়ে গেল বলে অনেক সজাগ থাকা যাবে। এরপর তো পাল্টা ঝাড় দেওয়ার পালা আমার। কলকাতাকে দেখিয়ে দেবো এ বান্দার তাগদ কতখানি।' বলার সময় সুদর্শনের ফর্সা মুখটা সত্যি কেমন লালচে হয়ে ওঠে। তার সংকল্পদৃঢ় চোয়ালকে একটু যেন বেশি তীক্ষ্ণ মনে হয়।

চাঁদনী থেকে বেরিয়ে অনেকগুলো দোকানে ঘোরাঘুরি করে সে। এটা তার কাছে খুব গুরুত্বপূর্ণ কাজ। এই জামা-প্যাণ্ট কেনা। সহজে পছন্দ হতে চায় না। রেডিমেড জামা তবু পরা যায়—কিন্তু রেডিমেড প্যাণ্ট আদৌ পছন্দ নয় তার। এখন একরকম বাধ্য হয়ে কিনতে হয়। একটা সার্ট আর একটা ট্রাউজার কিনে আবার কাপড়ের দোকানে ঢোকে সে। প্যাণ্ট-লেংথ কেনে। নামকরা দোকানে অর্ডার দিয়ে যায়। তারপর সেলুনে ঢোকে দাড়ি কামানোর জন্যে। বাহারী সেলুন। বেশ আরাম করে দাড়ি কামানো যায়। সেলুনের মাঝবয়সী লোকটা যখন সুদর্শনের গালে ভাল করে সাবান ঘষতে থাকে, আয়নায় নিজের চোখের দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে সুদর্শনের তখন মনে হয়—দাড়ি কামানো কাজটা ছেলেরা করে কেন? এ কাজ যত নরম হাতের হবে ততই তো ভাল। এ কাজটা মেয়েদের হলে বেশ হতো। পয়সা না একটু বেশিই লাগতো! কতকগুলো ব্যাপারে

সুদর্শনের ভাবনাচিন্তা কিরকম বল্গাছাড়া গতিতে ছুটতে থাকে। হুমদাম ভাবতে শুরু করে দেয় সে। এই তো খানিক আগে ট্রাউজারস্-এর মাপ দিতে গিয়ে দোকানটার মধ্যে যখন ছিল—বুড়ো মিঞা সাহেব এক ভুঁড়িদাস বাবাজীর ট্রায়াল নিতে ঢুকল কোণের দিকের ট্রায়াল রুমে। কাঠের ঘেরা ছোট্ট খুপরি,—দুজন দাঁড়ানো যায় বড়-জোর। সেদিকে তাকিয়েই তার মনে হলো, আহা, কলকাতায় যদি অল্প বয়সী মেয়েরা দর্জির কাজ করতো বেশ ভাল হতো তাহলে!

দাড়ি কামালে মুখের জৌলুস বেড়ে যায়। মসৃণ ত্বকের ওপর হাতের উলটো পিঠ চেপে চেপে তার নরম পেলব ভাবটা অনুভব করে সুদর্শন।

তার ভুরুতে চুল কম। চোখের পাতাও তেমন লম্বা নয়। অথচ মাথার চুল তার ঘন। ইদানীং খানিকটা বেশি লম্বা রাখায় ঘাড়ের কাছটায় কুঁকড়ে ঢেউ খেলে আরো ঘন করে তুলেছে। গায়ের চামড়া যেমন নরম, দাড়ি গজায় তেমনি শক্ত। শীতকালে খুব দামি ব্লেড ছাড়া নিজের হাতে কাটতেই ইচ্ছে করে না। তাহলেও খোঁচা খোঁচা দাড়ি সে সহ্য করতে পারে না একেবারে। এমনিতে একদিন অন্তর কামায়। তেমন দরকার পড়লে কোনদিন বাদ না দিয়েই কামাতে হয়।

সেলুন থেকে বেরিয়ে একটা পানের দোকানের সামনে এসে সে ঠাণ্ডা কোকাকোলা কেনে। আয়নায় মুখ দেখতে দেখতে, বাঁ হাতে বোতল উঁচিয়ে গলায় ঢালে পানীয়। লক্ষ্য করে আশেপাশে কেউ তাকে তেমন দেখছে কিনা। দেখছে, তবে তেমন করে দেখছে না কেউ।

অসহ্য গরম। এখনি এমন যদি, তাহলে দুদিন বাদে কিনা হবে! আকাশ তাতছে একনাগাড়ে। দুপুরের কলকাতা সকালের কলকাতা থেকে আলাদা। এত গরমেও লোক যাওয়ার বিরাম নেই। যেদিকে তাকাও মানুষ। গোছায় গোছায় মানুষ।

শব্দ! শব্দ! চারপাশ জুড়ে হাজারো শব্দ ভাসছে অনবরত!

মাঝদুপুরেও কলকাতা শব্দে শব্দে টগবগ করে ফোটে। শব্দ থামে না কোথাও। মাথার ওপরে দুপুরের আকাশ টানটান হয়ে শব্দ শুনে যায় কলকাতার। ছোট পথ, গলিপথ দিয়ে ঘুরতে ঘুরতে সুদর্শন আবার একটা সিনেমা হাউসের সামনে এসে দাঁড়ায়। এখানেও বিশাল হোর্ডিংয়ের মধ্যে থেকে তার প্রিয় নায়ক ঠিক তার দিকে তাকিয়েই হাসছে। তারপর লক্ষ্য করে, ওপরের ছবিটার দিকে তাকাতে তাকাতে তার দিকেও দেখছে কেউ কেউ। ভাল লাগে খুব।

লুঙ্গি পরা একটি লোক এগিয়ে আসে তার দিকে। নামানো গলায় নয়, বেশ খোলাখুলিভাবেই বলে টিকিট চাই কিনা—চড়া দামে। ম্যাটিনি শো। শুরু হতে কিছুক্ষণ দেরি আছে।

একটু দরাদরি করে সুদর্শন কিনে নেয় টিকিটটা। তারপর পা চালিয়ে আবার চাঁদনীতে নিতাই খুড়োর দোকানের দিকে এগোয়। পুরনো পোশাকটা বদলে নিতে হবে। রাস্তার মাঝখানে তো আর বদলানো যায় না।

চাঁদনীতে গিয়ে দোকানের পেছনদিককার ঘরে গিয়ে পোশাক বদল করার পর আয়নায় নিজেকে দেখে সে খুশি হয়। কলকাতা, আয় এবার!

॥ চার ॥

অর্ণব কলেজ থেকে বাড়ি ফিরে দেখল তনয়া তার আগে ফিরেছে। আটপৌরে শাড়ি পরে, চুল খুলে বিছানায় শুয়ে শুয়ে গল্পের বই পড়ছিল শোওয়ার ঘরে। দক্ষিণের জানলা দিয়ে বিকেলের আলো বাঁকা হয়ে ছড়িয়ে পড়েছিল ঘরের মধ্যে। পশ্চিমদিকটা বাড়ির পেছন দিক, বাথরুম পাম্প ঘ সব ওই দিকে। সেদিককার খোলা জানলার সামনে ঝোলানো আছে জলকাচা একটা সবুজ শাড়ি। তার ফলে ওদিক থেকে যে আলোটা আসার কথা তা ওই সবুজ শাড়ির ছাঁকনি পেরিয়ে নরম হয়ে ঘরের মধ্যে মিশে যাচ্ছে। মাথার ওপর ঘুরন্ত পাখাটা থেকে শব্দ উঠছে সামান্য। অর্ণব কাঁধ থেকে কাপড়ের ব্যাগটা আলনার পাশের আংটায় ঝুলিয়ে রাখে। পাখার রেগুলেটর ঘুরিয়ে হাওয়াটা আর একটু জোর করে দেয়। গা থেকে পাঞ্জাবি খুলে ফেলে। তনয়া ততক্ষণে বইয়ের ফাঁকে একটা শুভবিবাহ কার্ড রেখে বিছানা ছেড়ে উঠে আসে। অর্ণবের হাত থেকে পাঞ্জাবিটা নিয়ে হ্যাঙারে ঝুলিয়ে দেয়।

'ফোন করেছিলে? গ্যাসের জন্যে?' তনয়া জিজ্ঞাসা করে।

'করেছি। কাল আসবে। গীতা আসেনি?'

'আজ আসতে দেরি হবে ওর। আমি চা করে আনছি।' বলে তনয়া ঘর ছেড়ে যায়। অর্ণব খাটের ওপর গা ছেড়ে দিয়ে, সিলিং-এর দিকে তাকিয়ে মাথার চুলে আঙুল চালাতে থাকে। পায়ের দিকে ইস্পাতের আলমারি। নতুন রঙ ফেরানো হয়েছে। আলমারির মাথায় পরীক্ষার খাতার প্যাকেট। পড়ে আছে। দিন চলে যাচ্ছে। দেখা হচ্ছে না। কোনটা বেশি—আলস্য না সময়ের অভাব? আলো

পড়ে যাচ্ছে। ফাল্গুনের দিন। আগের চেয়ে বিকেল একটু বেশি টেনে থাকছে। বিকেলের বাতাস এখন অন্য রকম। অর্ণব চোখ বন্ধ করে। চোখ থেকে কালো ফ্রেমের চশমাটাকে খুলে রেখে দেয় হাত বাড়িয়ে বিছানার মাথার দিকটার ছোট একটা টেবিলে। কটা বাজল? উজ্জ্বল আসবে সন্ধ্যের আগেই। শুভাকে নিয়ে আসবে।

তনয়া চা নিয়ে ওপরে এসে বলল, 'উজ্জ্বলের আসার কথা ছিল, এল না যে?'

'আসবে একটু পরেই। শুভাকে সঙ্গে নিয়ে আসবে তো। ওদেরকে নিয়ে আমি ডক্টর পালিতের চেম্বারে যাবো। অ্যাপয়েন্টমেন্ট আছে।'

'শুভাটার মুখের দিকে তাকালে সত্যি কিরকম মায়া হয়। বেচারার এতো খাটাখাটুনি যায়। ও আর পারে না।'

'তবুও দেখছো তো নাটককে কত ভালবাসে। আজ পর্যন্ত একটা দিনও দেখলাম না রিহার্সালে সময় মত ও আসেনি। না আসতে পারলে কত আগে থেকে জানিয়ে রাখে।'

ছোট সাদা প্লেটে চিঁড়ে ভেজে মশলা মাখিয়ে এনেছিল তনয়া। অর্ণবের দিকে এগিয়ে দিয়ে বলল, 'ভেবেছিলাম একদিন যাবো শুভাদের বাড়ি।'

'ও নিজের থেকে না বললে যেতে চেও না কিন্তু। কতজনের বাড়িতে কত ধরনের অসুবিধে থাকে বলা যায় কি? নিজের থেকে কেউ যদি বাড়ির কথা না বলে, তবে কক্ষনো তাকে দিয়ে তা বলাতে চাওয়া উচিত নয়। কেননা নিজের বাড়ির কথা মানুষের কাছে এতো আপন,—বলার হলে তা একবার কেন অনেকবার বলে।'

'সে তো মোহরকে দেখলেই বোঝা যায়।' তনয়া হেসে বলে, 'দশটা কথার মধ্যে একটা কথা ও বাড়ির সম্পর্কে বলবেই।'

'মোহরের ব্যাপারটা কিন্তু একধরনের সারল্য। ওর বাড়ি সম্পর্কে উচ্ছ্বাস বা অতিকথনের মধ্যে কোন রকমের কপটতা নেই। এটাই ভাল লাগে।'

তা ঠিক। মোহরের স্বভাবটাই একটু এক্সট্রোভার্ট টাইপের। সবকিছু বলে ফেলে। কোন কথাটাই বোধহয় মনের মধ্যে চেপে রাখতে পারে না। শুভার ঠিক উল্টো।

অথচ ছ্যাখো, বলে অর্ণব সিগারেট ধরাতে ধরাতে বলে, 'এক্সট্রোভার্ট রোলগুলোতে শুভা কিন্তু বেশ ভাল অভিনয় করে। এতেই বোঝা যায় মেয়েটার ক্ষমতা আছে।'

দরজার বেল বেজে উঠল।

অর্ণব বলল, ওরা এলো সম্ভবত।

তনয়া উঠে দাঁড়িয়ে বলল, 'আমি খুলছি।' বলে এগিয়ে গিয়ে সে দরজা খুলে দিল। না, ওরা নয়। গীতা এসেছে কাজে।

'কিরে—তাড়াতাড়ি এলি যে। আসেনি ওরা ?' তনয়া জিজ্ঞাসা করে ফিরে আসতে আসতে।

গীতা দরজা ভেজিয়ে দিতে দিতে বলে, 'এসেছিল, দেখে গেল। মুখে তো বলল মেয়ে পছন্দ হয়েছে। এখন দেখা যাক। কপালে থাকে যদি মেয়ের এখানেই হয়ে যাবে।'

'কে কে এসেছিল ছেলের ?'

'ছেলের বাবা তো নেই। মামা মামী এসেছিল। দাদা এসেছিল আর এসেছিল এক বন্ধু।'

'কি খাওয়ালি ?'

'আমাদের গরীব মানুষদের ঘরে আবার খাওয়ানো ? চা, সিঙ্গাড়া আর রসগোল্লা খাইয়েছি।'

'এইতো অনেক বাবা, আবার কি ? আজকাল আবার কেউ পাত-পেড়ে খাওয়ায় নাকি?' তারপর অর্ণবের কাছে গিয়ে বসার আগে বলে গেল, 'কেটলিতে লিকার আছে—চা করে নে তোর জন্যে এক কাপ।'

তনয়া ঘরে আসার পর অর্ণব বলল, সুরঞ্জনের সঙ্গে কোনদিক থেকেই মিল নেই ওর ভাইটার। আমি সেবারেই শিলিগুড়িতে তোমায় বলেছিলাম না ?'

তনয়া চায়ের কাপে চুমুক দিয়ে বলল, 'সুদর্শন কি সত্যি সত্যি কলকাতায় থেকে যাচ্ছে?'

'হ্যাঁ, সেভাবেই তো এসেছে এবার। দু ভায়ের জন্যে ওর বাবা যা রেখে গেছে সে টাকার অংকটা তো নেহাৎ কম নয়।'

'কিন্তু যাই বল, সুরঞ্জনবাবুর উচিত হয়নি,—যতই গণ্ডগোল হোকনা কেন, ভাইকে এভাবে ছেড়ে দেওয়া ঠিক হয় নি?

'ভাই যে সুরঞ্জনের ছেড়ে দেওয়ায় চলে এলো এটা তুমি ভাবছো কেন? ভাই তো দাদাকে তোয়াক্কা করে বলে মনে হয় না। এ সম্পূর্ণ আলাদা জেনারেসন হ'য়েছে বুঝলে। এফ্লুয়েন্সের প্রচণ্ড আকর্ষণ এদের শুধু সাক্‌সেস্‌ওরিয়েন্টেডই করেনি ওদেরকে—

দরজায় বেল বাজল আবার:

শব্দ শোনা গেল গীতার দরজা খোলার। একজন নয়, দুজনের পায়ের শব্দ। উজ্জ্বল এবং শুভা দুজনে পরদা সরিয়ে ঘরে এলো।

তনয়া হাসতে হাসতে বলল উজ্জ্বলকে, এইমাত্র চা শেষ হয়ে গেল দেরি করলে কেন?

'দেরি করলাম—আপনাকে দ্বিতীয়বার চা করতে ওঠাবো বলে।' উজ্জ্বলও সমান হেসে উত্তর দেয়।

শুভা বলে, 'আমায় তো ও অনেক আগে সময় দিয়েছিল। আমি বহুক্ষণ অপেক্ষা করেছি ওর জন্যে। বাবু যে একপ্রস্থ ঘুম দিয়ে আসবেন তাতো জানতাম না।

'সে কি উজ্জ্বল? তুমি অফিস যাওনি? তনয়া বিস্ময় প্রকাশ করে।

অফিস যাবো না কেন? হাজিরা ঠিক দিয়ে এসেছি। তবে কাল যা খাটাখাটনি গেছে তনয়াদি—তার ওপর ঘুম নেই—একটু না ঘুমোলে চলে? ম্যানেজ করে কেটে পড়েছিলুম সোজা বাড়ি।'

'মণিকার বিয়েতে তার বন্ধু বান্ধবরা খাটবে না তো কে খাটবে বলো?' তনয়া চায়ের কাপ নিঃশেষ করে প্লেট সমেত কাপটাকে একটু পাশে সরিয়ে রাখে।

উজ্জ্বল হেসে শুভার দিকে তাকিয়ে বলল, 'এই যে, মণিকার আর এক বন্ধুকে দেখলেন না ? সেজেগুজে পৌছলেন কখন ?'

অর্ণব বলল, 'শুভার একটু দেরি হবে ওতো আগেই বলেছিল।' আর একই সঙ্গে বলল তনয়া, 'সেজেগুজে কথাটা আর যার সম্পর্কে বলনা কেন—শুভার সম্পর্কে ব'লো না উজ্জ্বল।'

'মেয়েরা তো বিয়েবাড়িতে একটু বেশি সেজেগুজে যায়ই। না সাজলেই বরং খারাপ লাগে। কিন্তু স্বয়ং বর ছাড়াও ছেলেরাও যে সাজে তাও তো দেখলেন।' কথাটা শুভা বলল উজ্জ্বল-এর উদ্দেশ্যে।

'আমার এখন আলাদা স্ট্যাটাস্।' উজ্জ্বল বেশ সরস করে বলে, 'অন্বীক্ষাব 'হীরো' বলে কথা ! আমার না সাজলে চলে ! মাঞ্জা একটু দিতেই হয়।' তারপর একটু থেমে বলে, 'জানেনই তো—একটু রূপ-চর্চা না করলে আমার এ গৌর-অঙ্গে শ্রী খোলতাই হয় না। আমি তো আর শুভা নই।' শেষ বাক্যটা বলার সময় চোখের কোণ দিয়ে তনয়ার দিকে তাকায়।

ঘন নীল ব্লাউজ আর হাল্কা নীল শাড়ি সিফনের। আলগা চুল পিঠের অনেকটা পর্যন্ত ছড়ানো। দুই ভুরুর মাঝখানে নীলের টিপ। ভুরু আঁকার মধ্যে যত্ন আছে, উগ্র ভাবটা নেই। ঠোঁটে আছে খুব হালকা রঙের প্রলেপ। এতো হালকা যেন মনে হয় ওটাই শুভার ঠোঁটের স্বাভাবিক রঙ। শুভার শরীরটার মতোই ওর সাজের কোথাও বাহুল্য নেই।

উজ্জ্বলের কথা শুনে শুভা আর কোন প্রতিবাদ করল না। আল্‌তো করে শুধু হাসল একবার। উজ্জ্বল চোখ থেকে চশমা নামিয়ে রুমাল দিয়ে কাচ মুছে নেয়। তারপর আবার সেটা চোখে লাগাতে লাগাতে বলে, 'আমি ভাবছি কি তনয়াদি, কনট্রাক্ট লেন্স লাগিয়ে নেবো। কিছু টাকা জমুক। এখন হাত খালি একেবারে।'

অর্ণব বলল, 'কেন? তোমায় তো চশমাটা পরে বেশ ভালই লাগছে। চেহারায় বেশ ব্যক্তিত্ব এসেছে।'

'সে তো হরদম শুনছি। আজ সকালেও তো আপনাদের ওই শিলিগুড়ির প্রিন্সের সামনে বললেন চশমা পরে আমায় বেশ ইন্টেলেকচুয়াল—ইন্টেলেকচুয়াল দেখাচ্ছে।'

একই সঙ্গে তনয়া উজ্জ্বলের আগের কথার রেশ টেনে বলল, 'তোমার আবার টাকার অভাব? তোমার হাত খালি তো কি—বাবার হাত তো ভরাই আছে।'

আর শুভা বলল, 'প্রিন্স কে?'

তনয়া জবাব দিল উজ্জ্বলের কথার। আর অর্ণব বলল শুভাকে, 'প্রিন্স হল আমার শিলিগুড়ির এক বন্ধুর ভাই। আমরা আগের বার যখন শিলিগুড়ি গেছিলাম নাটক করতে, ওদের বাড়িতে ছিলাম। তুমি তখনো আসোনি আমাদের গ্রুপে। ছেলেটির নাম আসলে সুদর্শন, ডাকনাম প্রিন্স। আমি ডাকি যুবরাজ বলে।'

তনয়া ততক্ষণে অর্ণবের কথায় মনোনিবেশ করেছে। সে বলল, 'প্রিন্স চেহারাটি বানিয়েছে একেবারেই বোম্বাই হীরোর মত।'

উজ্জ্বল বলল, 'অন্বীক্ষার হীরো করা যায় না?'

তনয়া হেসে বলল, 'অন্বীক্ষার নাটকে তাহলে ক্যাবারে নাচও রাখতে হবে।'

দিনের আলো পড়ে আসছিল দ্রুত। উজ্জ্বলদের সঙ্গে আর এক পর্ব চা শেষ করে অর্ণব ওদের সঙ্গে বেরিয়ে পড়ল।

রিহার্সালের সময় ছাড়া শুভা সাধারণতঃ দেখা করে না। দেখা করার মত সময় থাকে না ওর হাতে। ডাক্তার পালিতও খুব ব্যস্ত মানুষ। তাই দুজনের সময় মিলিয়ে দিন ঠিক করতে প্রায় মাসখানেক মত দেরি হয়ে গেল। মাঝে সপ্তা খানেক ডাক্তার পালিত আবার গেছিলেন ভেলোর-এ—কি একটা অপারেশনের ব্যাপারে। তাছাড়া

শুভারও কেমন যেন কোন গা নেই। পরিশ্রমের অন্ত নেই শুভার। শরীরের দিকে তার একেবারে নজর নেই একথাও ঠিক বলা যায় না। প্রসাধনের মধ্যে রুচিকর একটা আলগাশ্রী সে সর্বদাই বজায় রাখে। কিন্তু বারবার বলা সত্ত্বেও বড় ডাক্তার দেখানোর ব্যাপারে তার নিজের থেকে উৎসাহ ছিল না মোটেই। এর একটা কারণ অবশ্য হতে পারে আর্থিক সংকট। বড় ডাক্তার এবং দেখানোর পর নিরাময়ের ব্যবস্থা করার টাকা সে কোথায় পাবে? ডক্টর পালিতের সঙ্গে উজ্জ্বলের ইদানীং কেমন একটা আত্মীয়তার সম্পর্ক হয়েছে। এছাড়া ভদ্র-লোকের সঙ্গে ভালমত পরিচয় আছে অর্ণবের। এ কারণেই টাকার প্রশ্নটা বড় হয়ে ওঠেনি। তনয়া বলেওছে শুভাকে, খরচ নিয়ে তুমি একেবারে ভাববে না। ও ব্যবস্থাটা আমরা যা করার করবো। তনয়ার বলার মধ্যে এক ধরনের স্নেহের ধমক ছিল। এমন ধমক তনয়ার কাছ থেকে শুনতে অনেকেই অভ্যস্ত। অন্বীক্ষার সকলের কাছেই তনয়া এতো আপন যে এটাতে কেউ কিছু মনে করে না।

মাঝে মাঝেই অসুস্থ হয়ে পড়ে শুভা। তবু নিজের অসুস্থতা সম্পর্কে এতো উদাসীন কেন মেয়েটা? অর্ণবও ঠিক ভেবে পায় না। একটা কিছু অনুমান করে কিন্তু পুরোপুরি বুঝে উঠতে পারে না সেও। সত্যিই তো কতটুকুই বা জানে সে মেয়েটার জীবনের! ওর সংসারে কোন শৃঙ্খলা নেই, সাহায্য করার মতো কেউ নেই। বোধহয় সহানুভূতি জানানোর মত মানুষও নেই ওর একজনও। এটুকুই জানে অর্ণব। এ তো নেহাৎ বাইরের জানা। এত অল্প দিনে একটা মেয়েকে কতটুকু বোঝা যায়।

ঠিক যতটুকু পর্যন্ত বলতে চায় শুভা—তার চেয়ে বেশিকিছু জানবার জন্যে কখনো কৌতূহল প্রকাশ করেনি অর্ণব। করাটা শোভন নয়। অন্বীক্ষার সবাই তাই। কেউ না চাইলে তার ব্যক্তিগত জীবন সম্পর্কে, তার পরিবার বা নিজস্ব সুবিধা সংকট সম্পর্কে উন্মুখ হয় না কেউ। এখানে সকলের ক্ষেত্রেই একটি পরিচয় সবচেয়ে বড়। তা হল

শিল্পী হিসেবে অগ্নীক্ষায় তার আসন কোথায়? সেই সুবাদে শুভার মর্যাদা এখানে অনেকটা। গ্রুপে সে এসেছে বছর দেড়েকের বেশি হয়নি, অথচ এর মধ্যেই আজ শুভা গ্রুপের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অভিনেত্রী। তনয়া নিজেই বলে শুভা হল জাত-শিল্পী। আমি এতকাল এই সাত-আট বছর সাধ্য-সাধনা করে যে জায়গায় পৌঁছতে পারিনি —শুভা দেড় বছরে সেখানে গিয়ে পৌঁছেছে। নাটক আছে ওর রক্তে। তার চেয়েও বড় কথা অভিনয়ের ব্যাপারে ওর নিষ্ঠার তুলনা হয় না।

রাস্তায় নামার আগে—বাড়ির পাশের ফ্ল্যাট থেকে একটা ফোন করে নিল অর্ণব। ডাক্তার পালিত কথা মত চেম্বারেই আছেন। ট্যাক্সি নিয়ে পৌঁছতে বেশি দেরি লাগল না।

ডাক্তার পালিত বেশ মিশুকে মানুষ।

নাম আর বিরাট ডিগ্রীর তালিকা শুনলে মনে হয় না জানি কি রাশভারি মানুষটি হবেন। কিন্তু অল্প সময় কথা বলার পরই বোঝা যায়, জমিয়ে গল্প করার গুণটিও তার নেহাৎ কম নয়। সময় প্রতিক্ষণে তাড়া দেয় ভদ্রলোককে। আসলে খুবই ব্যস্ত, কিন্তু কথা বলার সময় এমন একটা মেজাজ নিয়ে কথা বলে যেতে থাকেন দেখলে মনে হবে বোধহয় হাতে আর কোন জরুরী কাজ নেই তেমন। সাধারণ মানুষকে নিয়ে যাদের কাজ—তাদের ব্যবহারে এর একটা আলাদা দাম আছে।

অর্ণব আর উজ্জ্বল বসে থাকল, ডাক্তার পালিত শুভাকে নিয়ে গেলেন ভিতরে।

শুভা ভেতরে চলে যাওয়ার পর উজ্জ্বল বলল, 'ফিজের টাকা অর্ধেক নেবেন উনি। আমি এনেছি টাকাটা।'

অর্ণব বলল, 'শুভার সামনে ওটা দিও না। আমি আর শুভা বেরিয়ে গেলে, টাকাটা দিয়ে তুমি নেমে যাবে।'

উজ্জ্বল কি একটা কথা বলতে গিয়েও বলল না।

ডাক্তার পালিত ফিরে এসে আগের মতই হেসে হেসে কথা বললেন। কিন্তু অর্ণব এবং উজ্জ্বলের বুঝতে অসুবিধা হল না কোথায় যেন বেসুরো ঠেকছে।

শুভা মুখ তুলে বলল, 'আপনার দিকে তাকিয়ে তো মনে হচ্ছে আমার অসুখটা খুব তাচ্ছিল্য করার মত নয়। তাই না?'

'আপনি কিন্তু বরাবরই তাচ্ছিল্য করে এসেছেন। এখন থেকে আর সেটা করলে চলবে না। প্রফেসর মিত্র, আপনি কাল,—না, কাল নয়—পরশু সন্ধ্যের দিকে একবারটি আসুন। একটু কথা আছে আপনার সঙ্গে। ও, কে!'

॥ পাঁচ ॥

ফিল্ম শো শেষ হল। সুদর্শন খুব একটা খুশি হতে পারেনি। বাইরের স্টিল ফটো দেখে যেমন মনে হয়েছিল সেক্স আর ভায়োলেন্সের খুব জমজমাট ছবি—দেখে ততটা পাওয়া গেল না। আছে সবই। নায়িকা ছাড়া ভ্যাম্প মেয়েই আছে গোটা পাঁচেক। তবু ঠিক মন ভরল না সুদর্শনের।

হল থেকে বেরিয়ে সিগারেট ধরাল।

আকাশ থেকে বড় আলো নিভে যাওয়ার পর শহর কলকাতার রূপ গেছে পাল্টে। যেন নীল স্বপ্ন একটা। নীল স্বপ্নটা গড়িয়ে যাচ্ছে তার চারপাশ দিয়ে। গড়িয়ে যাচ্ছে ট্রাম, বাস, মানুষ আর দোকান-পসরার ওপর দিয়ে। সুদর্শন খুব বিলাসী মেজাজে চারপাশ দেখে যায়। পথের নারী-পুরুষ। গাড়ি থেকে যাত্রী ওঠানামা করছে অনবরত। কাছে নিয়নের বিজ্ঞাপন। দূরে মাঠের অন্ধকার। বুট-পালিস ফুচকা-ওয়ালা, ভিখারী। মিনিবাসে রবরবা আর ডিলুক্সের জন্যে লাইন। বিশাল হোটেলের নিচেকার দোকান থেকে রাস্তায় ভেসে আসছে স্টিরিও সাউণ্ডে বিদেশি মিউজিক। সুদর্শন কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে বাজনা শুনল। এও যেন কোন সেলুলয়েডের নয়নাভিরাম আলোকচিত্র।

ওহ্, নিতাই খুড়োর কাছ থেকে ব্যাগটা তো নিতে হবে। সে আবার চাঁদনীতে ফিরে আসে। ব্যাগটা নেয়। চাঁদনী থেকে ফোন করে অম্বরকে।

ফোনে অম্বরকে পাওয়া যায় না। তবে জানা যায় অম্বর ফিরেছে দুর্গাপুর থেকে। ফিরেই আবার অম্বরকে ছুটতে হয়েছে অন্য একটা জরুরী কাজে। সুদর্শন এলে অপেক্ষা করার জন্যে বলে গেছে অম্বর। নটা সাড়ে-নটার মধ্যে কাজ মিটিয়ে ভবানীপুরে ফিরবে সে। সুদর্শনও জানিয়ে দিল ওই সময়ের কাছাকাছি সেও হাজির হবে

ভবানীপুরে। অম্বর যেন এসেই আবার বেরিয়ে না যায়। কিছুই বলা যায় না। এখানে ব্যবসা মানে তো সারা দিন সারা রাত।

নিতাই খুড়োর দোকান থেকেই ফোন করল সুদর্শন। ফোন করার পর—সেই বাবদ পয়সা দিল যথারীতি। এখানে শুধু পয়সায় পয়সায় চেনা জানা। দাম আর হিসেব। ব্যস্! এর বাইরে আর কিছু নেই।

কিন্তু মাঝখানের এই কয়েক ঘণ্টা যে ঠিক কি করে কাটানো যায় সুদর্শন ভেবে পায় না। অর্ণব মিত্রের কথা একবার মনে পড়লেও সে দ্বিতীয়বার আর সে কথা ভাবে না। ওদের মাঝখানে গিয়ে পড়লে তার খুব অস্বস্তি লাগে। প্রাণ খুলে কথা বলা যায় না। এমন সব বিষয় নিয়ে কথাবার্তা শুরু করে দেয় হঠাৎ হঠাৎ যে সুদর্শনের তখন বোকার মত চুপচাপ বসে থাকা, কিংবা অকারণ হেসে যাওয়া ছাড়া গতি থাকে না।

এখন পথে পথে ঘোরা ছাড়া আর কি করার আছে? ঘুরতে শবিশ্চি এখন ভালই লাগবে। পথে মেয়েরা চলতে শুরু করলে পথের রূপ খোলে কত সে কথা তার চেয়ে আর কে ভাল বোঝে। সুদর্শন চোখের খিদে মিটিয়ে নেওয়ার জন্যে পথে ভাসতে ভাসতে চারপাশ দেখতে থাকে ঘুরে ফিরে। কলকাতার কোন মেয়েরই বোধহয় কোন রকমের জড়তা নেই। কেমন বেপরোয়া চলে যায় একা একা, কখনো দুজনে, কখনো বা দল বেঁধে।

ঠিক কোন দিকে যাবে সুদর্শন ভেবে পায় না। উদ্দেশ্যবিহীন হয়ে এদিক ওদিক ঘোরাফেরা করে। রাস্তা পার হয়। হাঁটতে হাঁটতে মেট্রো সিনেমার উল্টোদিকে আসে। কার্জন পার্ক। এখানে কি বিক্রি হয়? গাছের চারা? ওটা কে দাঁড়িয়ে? লেনিন। লেনিনের স্ট্যাচুর পেছন দিক দিয়ে এগিয়ে যায় সুদর্শন। ট্রাম লাইন মাড়িয়ে হেঁটে আসে ম্যাট্রিনের দিকে।

সেখান থেকে বেরোনোর সময়, সুদর্শন লক্ষ্য করে একটি মাঝ-

বয়সী লোককে। ল্যাট্রিনের দেওয়ালের গায়ে একটা চৌকোনো কাঠের বোর্ড রেখেছে সে। কাঠের সেই চৌকো বোর্ডটিতে নানা রঙের বেলুন আটকানো। লোকটা একটা ছোট বন্দুক হাতে নিয়ে বসে আছে। পয়সা ফেললে কেউ কেউ তাক করে বেলুন ফাটাচ্ছে। এটা সুদর্শনের খুব প্রিয় খেলা। ছোটবেলা তার সখ ছিল শিকারী হবার। মেলায় গেলেই সে এই খেলাটা খেলতো। এখনো দাঁড়িয়ে গেল। পয়সা জমা দিল লোকটার হাতে। তারপর বন্দুকটা তুলে নিয়ে ফাটিয়ে গেল অনেকগুলো বেলুন। নিখুঁত লক্ষ্যভেদ করে মনে মনে বেশ খুশি হয় সে। তারপর আবার বাঁকা ট্রাম লাইন পেরিয়ে ট্রাম-গুমটির দিকে এগোতে থাকে। ট্রাম-স্টপেজ থেকে অল্প দূরে দাঁড়িয়ে সে আর একটা সিগারেট ধরায়। এ জায়গাটা কেমন একটু অন্ধকার মত। পরপর দুটো নিয়ন আলো নিভে আছে। খানিক দূরে লোহার রেলিং দিয়ে ঘেরা সবুজ ঘাসের একখণ্ড জমি। সুদর্শন ভাবে জমিটার মধ্যে গিয়ে বসবে কিনা। ঘাসগুলো ভারি সুন্দর। এখান থেকে কেমন কার্পেটের মত দেখাচ্ছে। এক দিকটায় গোটা চারেক ছেলে বসে আছে গোল করে। তার চেয়ে একটু বেশি কিংবা তারই সমান বয়স হবে ওদের। একজন কেমন নবাবজাদার মতন—এক ঠ্যাং মুড়ে আর এক ঠ্যাং ছড়িয়ে শুয়ে পড়ল। দূরে—পূবদিকে রাস্তার মোড়ে একটা বাড়ির মাথায় বিজ্ঞাপন টাঙানোর জন্যে লোহার ফ্রেম আটকানো। ফ্রেমে বিজ্ঞাপন নেই বলে ফ্রেমের লোহার চৌকো চৌকো খোপের ফাঁক দিয়ে পেছনের আকাশটাকে দেখা যাচ্ছে। শুধু আকাশ নয় একটা চাঁদও আছে। আস্ত চাঁদ। লোহার ফ্রেমের মাঝখানটায় আটকে আছে যেন। একেই বলে শহরের চাঁদ—ফ্রেমে আঁটা। ওহ্, ঘাসের ওপর হাফ-শুয়ে ছেলেটা ওই দিকেই তাকিয়ে আছে দেখছি। আবার কিসব বলছে বাকিদের। সবাই এক গোয়ালের আর কি। সব প্রশান্ত রক্ষিতদের পার্টি। আকাশে রইল চাঁদ—আর ঘাসে দেহ পেতে তুই করবি এন্‌জয়! শালা রাম আতা।

'কটা বাজে আপনার ঘড়িতে?' আচমকা মহিলাকণ্ঠ শুনে সুদর্শন মুখ ফেরায়। হ্যাঁ, তাকেই জিজ্ঞাসা করছেন ভদ্রমহিলা। খুব কাছ থেকে। সুদর্শন তাকিয়ে বুঝতে পারে ভদ্রমহিলা বেশ কিছু সময় ট্রামের জন্যে অপেক্ষা করে আছেন।

সুদর্শন হাতঘড়িতে সময় দেখে বলে, 'সাতটা বেজে দশ মিনিট।'

'সাতটা দশ!' অস্ফুট গলায় বলে ওঠেন ভদ্রমহিলা।

সুদর্শন ভদ্রমহিলার চোখের দিকে তাকায়। মেয়েদের চোখের দিকে তাকালে সুদর্শন খুব তাড়াতাড়ি বুঝে নিতে পারে। অথচ এই মহিলার অস্ফুট শব্দটিকে সে যেন ঠিক ঠিক ধরতে পারে না। তাকিয়ে থাকে। চেহারাটা ভাল করে দেখে নেয়।

বয়স ত্রিশ-বত্রিশ হবে। ছিমছাম পোশাক। গলার স্বর শুনে মনে হয় বেশ ভাল ঘরের মেয়ে। একবার তাকানোর পর আরো একবার তাকাতে ইচ্ছে করে।

অনেকক্ষণ ট্রাম আসছে না।

'আচ্ছা, আপনি কোন্ দিকে যাবেন?' মহিলাটি কেমন যেন অসহায়তা নিয়ে সুদর্শনের দিকে তাকায়। একটু যেন কেঁপে যায় তার গলা। শুধু যেন প্রশ্নটা নয়, তার সঙ্গে অতিরিক্ত কি একটা সুদর্শনকে আকর্ষণ করে। সুদর্শন একেবারে চোখে চোখে তাকায়। খটকা লাগে। চোখ সরিয়ে নেয়। আবার তাকায়। পুরোপুরি তবু বুঝে উঠতে পারে না।

'মানে, আমার এক্ষুনি ঠিক কোথাও যাওয়ার নেই।' বলে সে এক মুহূর্ত থেমে নিয়ে আবার বলে, 'আপনি কোন্ দিকে যাবেন?' সুদর্শন প্রশ্নটা করে ভদ্রমহিলার মুখের দিকে তাকিয়েই। আর কথার প্রশ্নটার সঙ্গে সঙ্গে দৃষ্টিতে আরো কিছুটা জুড়ে দেয়।

কথা নয়, সুদর্শনের যথাযথ চাউনিটাই সঙ্গে সঙ্গে প্রতিক্রিয়া আনে মহিলার মুখে।

মেয়েটি ঠোঁট ছড়িয়ে হাসে এবার। চোখে টান পড়ে। পরমুহূর্তে,

সুদর্শনের নিজের চোখ কানকে বিশ্বাস করতেও যেন একটু দেরি হয়। মেয়েটি তার কাছে আরো ঘন হয়ে আসে। প্রায় ফিসফিস করে বলার মতন করে বলে, 'যেদিকে যেতে চাইছেন। বেশি নয়, বিশ টাকা মাত্র। মেয়েটি চাপা গলায় আরো কি সব যেন বলে যায়। তারপর 'আসুন' বলে হাঁটতে শুরু করে। সুদর্শন উত্তরে কি বলবে না বলবে ভাবতে ভাবতে তাকে অনুসরণ করে এগোতে থাকে।

পিছু পিছু বেশ খানিকটা এগোনোর পর, সুদর্শন দেখে, মেয়েটি রাস্তার পাশে দাঁড়িয়ে থাকা একটা ট্যাক্সিতে উঠছে। সুদর্শনও ওঠে। বোঝা যায় ট্যাক্সি ড্রাইভারের সব জানা আছে। ড্রাইভারকে কিছুই বলতে হয় না। গাড়ি চলতে শুরু করে।

কলকাতায় বিশাল বিশাল বাড়ি তৈরী হচ্ছে অনবরত। একদিকে মাঠ। পাতাল রেলের কাজ হচ্ছে সেখানে। জোর পাওয়ারের আলো জ্বলছে। যন্ত্র আর মানুষ কাজ করছে একসঙ্গে। অন্যদিকে উঁচু উঁচু বাড়ি। আকাশ এখনো উঁচু। এইসব বাড়িতে কারা থাকে?

কলকাতায় কত রহস্য পাক দিয়ে যাচ্ছে প্রতি মুহূর্তে তার হিসেব আছে কি? এই মেয়েছেলেটা সুদর্শনকে যত না টানল তার চেয়ে বেশি টানল এই আচমকা খদ্দের নিয়ে ট্যাক্সিতে ওঠার রহস্যটা। মেয়েমানুষটা কোথায় যেতে চাইছে? ট্যাক্সি ভাড়াটা নিশ্চয়ই কুড়ি টাকার মধ্যে নয়!

মেয়েটি সুদর্শনের উরুতে হাত রেখে বলে, 'এদিকে নতুন বুঝি?'

সুদর্শন বেশ সপ্রতিভভাবে জবাব দেয়, 'হ্যাঁ, নতুনই বলা যায়।'

'চেহারাটি বেশ', বলে মেয়েমানুষটা সুদর্শনের কোলের মধ্যে এগিয়ে আসে।

সুদর্শন বুঝতে পারে না গাড়ি কোন্ দিকে চলেছে। ট্রাম লাইনের বড় রাস্তায় না এসে অন্য পথ নিয়েছে ড্রাইভার। এসব পথঘাট তার চেনা নেই। গাড়ি কোন্ দিকে যাচ্ছে জানার ইচ্ছে হলেও সুদর্শন কোন কথা বলে না। তার শ্বাস-প্রশ্বাস ক্রমে ঘন হতে থাকে।

গাড়িটা খুব অল্প সময়ের মধ্যে নানা পথ ঘুরে ঘুরে শেষে একটা নির্জন রাস্তায় এসে পড়ে। নির্জন রাস্তাটায় খুব ধীরে গাড়ি চালাতে থাকে ড্রাইভারটা। তারপর এক সময় পথের একপাশে গাড়িটাকে দাঁড় করিয়ে রাখে। কলকাতায় এ ধরনের রাস্তা সে এর আগে দেখেনি। দেখলেই বোঝা যায়, এখানে শুধু বিরাট বিরাট ধনীরা থাকে। রাস্তাটার দুদিকে মস্ত এক একটা লনওয়ালা বাড়ি পাঁচিল দিয়ে ঘেরা। দামী নিয়ন আলো জ্বলছে পথের দুপাশে। খানিক দূর থেকে একটা বিদেশী গানের সুর ভেসে আসছে। কিন্তু এখন, এসব খুঁটিয়ে লক্ষ্য করার সময় নয় তার। ড্রাইভার গাড়ির স্টার্ট বন্ধ করে দিয়ে বসে আছে: ভেতরের আলো নিভিয়ে দিয়ে—স্টিয়ারিং-এর ওপর ঝুঁকে সিগারেট ধরাচ্ছে। পথের আলো থেকে কিছুটা দূরে, একটা গাছের নিচে, অল্প অন্ধকারের মধ্যে গাড়ির পেছনের সীট দুলে ওঠে। সুদর্শন ক্রমে পেছনের সীটের মধ্যে ডুবে যেতে থাকে।

সেই ভোরবেলায়, ট্রেনের কামরা থেকে পোশাকের লাল ব্যাগটা হারিয়ে যে ক্ষোভ সুদর্শনের ভেতরে ভেতরে গুমরে মরেছে সারাদিন, এই মুহূর্তে সমস্ত দিনের ক্লান্তির সঙ্গে পাকিয়ে পাকিয়ে সেটা যেন ফুঁসে উঠতে চাইছে।

মেয়েমানুষটাকে, এই মুহূর্তে একটা মাংসের পিণ্ড ছাড়া আর কিছু মনে হয় না। সুদর্শনের শরীরটাকে সে ডুবিয়ে নিচ্ছে নিজের শরীরের মধ্যে। নিতে নিতে কেমন অস্ফুট ধ্বনি তুলছে। সুদর্শনের একবার মনে হয়—এই মুহূর্তে বিশাল শহরটা তার ক্রুদ্ধ হাতের মুঠোয় চলে এসেছে। কলকাতার সমস্ত রঙিন বেলুন সে এক এক টিপে উড়িয়ে দিতে পারে। তার ইচ্ছে করে শহরটার সবকিছু— মানুষ বাড়ি পথ মাঠ সমস্ত কিছু ভেঙে গুঁড়িয়ে দিতে। যেন চারপাশের সবকিছু পিষে গুঁড়িয়ে দিতে না পারলে তার ক্রোধ শান্ত হবে না।

আশ্চর্য। ড্রাইভারটি একবারের জন্যেও পেছনদিকে মুখ ফেরায় না।

ভবানীপুরে অম্বরের সঙ্গে দেখা হল সাড়ে-নটায়। অম্বর বরাবরের মতই খুশিতে তাকে জড়িয়ে ধরে হাসতে হাসতে বলে, 'আযাও দোস্ত !' তারপর গলা নামিয়ে বলে, 'তোর জন্যে শ্লা একটা মেয়েছেলের ধান্দা ফুটিয়ে দিতে হল !'

'ফোটালি কেন ? একেবারে জুটিয়েই আনতিস ?'

'এখানে ? আমার বুড়ো জ্যাঠাকে চিনিস তো ?'

'তা আর চিনি না। প্রথম দিন মাল খেয়ে কি ঝাড়খানাই খেয়েছিলি—'

'শিলিগুড়িতে তো ? বাপস্ সে আবার মনে নেই !' শব্দ করে হাসে অম্বর। হাসি থামলে বলে, 'আগে ফ্রেস হয়ে নে, তারপর গ্যাঁজানো যাবে। এখন আমি বিলকুল ফ্রী।'

সুদর্শন হেসে বলে, 'সারারাত এনগেজ হয়ে থাকতে হয় নাকি ?'

'আছে, আছে, অনেক ব্যাপারস্যাপার আছে দোস্ত্।' সুদর্শনের পিঠে থাপ্পড় মেরে আবার জোরে জোরে হেসে ওঠে অম্বর।

খেতে বসে অম্বর বলে, 'আজ আর কাল—এই দুটো দিন তুই আমার এখানেই থাক্। তোকে যে ঘরটার কথা লিখেছিলাম—ওটার ব্যবস্থা ঠিকই আছে—তবে পরশুদিনের আগে পাওয়া যাচ্ছে না।'

'মিনিবাসের কতদূর ?'

'হয়ে যাবে। আমি যখন লেগেছি—তখন বার না করে ছাড়ছি না।'

'তোমার ভরসাতেই তো আসা গুরু। হিসেব মত টাকা এনেছি। ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট করেছি আজ সকালেই।'

'গুড। কাজ তো গুরু এগিয়ে রেখেছো। যত শীগ্রি পারি তোর একটা হিল্লে করে আমায় আপাততঃ দিল্লী কাটতে হবে। এন্তার কাজ পড়ে আছে।'

'আবার দিল্লী ? তুই দেখাচ্ছিস বটে !'

'তবে কি। ওসব আরামের দিন চলে গেছে ভাই। ছনিয়া চষে না বেড়ালে ঝাড় খাবেই খাবে।'

'তাহলে তো প্লা লাইফের আর কিছু রইল না। খালি খেটে মর। নো এনজয়মেণ্ট!'

'ওর মধ্যেই সব বার করে নিতে হবে গুরু। লাইনে নামো বুঝতে পারবে সব।'

'কাল সকালে তাহলে বেরবো তোর সঙ্গে?'

'মিনিবাসের ব্যাপারে তো? সকালে নয়, ছুপুরে। বিকেলে আবার ঘণ্টা খানেকের কাজ আছে আমার। তারপর সন্ধ্যেবেলা দেখা হবে পার্ক স্ট্রীটে। সন্ধ্যেবেলায় তুই আমার জন্যে ওয়েট করবি পার্ক হোটেলের নিচে। সাতটা সাড়ে-সাতটায় আমি এসে পড়ব। এক পার্টিকে মাল খাওয়াতে হবে।'

'খেয়ে খেয়ে চেহারাটাকে যা ফোলাচ্ছিস তুই—এরপর আর কেউ পাত্তা দেবে না।'

'খুব দেবে। মালেই মাল আসে ইয়ার। সবাই তো তোমার মত ক্লিমহীরো বনে না। ভাই, চাঁদি থাকলে চাঁদনী রাত থাকবে—এ বড় পাক্কা হিসেব।'

অম্বরের হিসেব যতই পাকা হোক না কেন, সময়ের হিসেবে তেমন পাকা কথা রাখল না। পার্কস্ট্রীটে সাতটার আগে থেকে দাঁড়িয়েছে সুদর্শন। সাড়ে-সাতটা বেজে গেল তখনও অম্বর সিং-এর দেখা নেই।

একের পর এক অনেকগুলো সিগারেট শেষ করল সুদর্শন। এদিক ওদিক পায়চারি করল খানিকটা সময়। অম্বর কি তাহলে আসবে না? হাতঘড়ির দিকে আর একবার তাকিয়ে সুদর্শন ভাবল—এখন কি করা যায়। একা কোথাও গিয়ে বসব। হঠাৎ পূবদিক থেকে এগিয়ে-আসা একটি যুবকের দিকে চোখ পড়তেই সে আবার ভাল করে লক্ষ্য করল।

আরে! সেই ছেলেটা নয়? কাল ওই তো ভিড় বাস থেকে পড়ে যাচ্ছিল!

ছেলেটি পেভমেন্ট ধরে হাঁটতে হাঁটতে তার দিকেই এগিয়ে আসছে। একেবারে মুখোমুখি এসে পড়ল। সুদর্শনের কাছাকাছি এসে ছেলেটিও দাঁড়িয়ে পড়েছে।

'চিনতে পারছেন?' যুবকটি প্রশ্ন করে সুদর্শনকে।

'দূর থেকেই চিনেছি।'

'কারো জন্যে ওয়েট করছেন বুঝি?'

'ঠিক ধরেছেন। এক বন্ধুর জন্যে।'

সুদর্শন যুবকটির পোশাকের দিকে লক্ষ্য করে। দামী পোশাকে ওকে কালকের তুলনায় অনেক স্মার্ট মনে হচ্ছে।

'এদিকে এর আগে দেখেছি বলে মনে পড়ছে না তো! এখান দিয়ে আমি ত্বুবেলা যাতায়াত করি কিনা। আর মানুষের মুখ একবার দেখলে আমার বহুকাল মনে থাকে।' যুবকটি গল্প করার ভঙ্গিমায় দাঁড়িয়ে থাকে।

সুদর্শন হেসে বলে, 'সবে তো কাল কলকাতায় এসেছি।'

'কাল? আরে কালই তো বাসে—'

'হ্যাঁ। এবার কলকাতায় এসে ওই প্রথম আমি ওরকম ভিড় বাসে উঠেছিলুম।'

'আই সি! আর উঠেই একজনের লাইফ সেভিং।'

'লাইফ সেভিং না হলেও—একটা অ্যাক্সিডেন্ট থেকে সেভ করা —বলা যায়।'

'আই স্যাড বি থ্যাঙ্কফুল টু ইউ।' যুবকটির ইংরেজি উচ্চারণ খুব পরিষ্কার। বেশ অভ্যস্ত মনে হয়। একটু থেমে আবার সে বাংলায় বলে, 'এর আগে কলকাতায় আসেননি বুঝি?'

'এসেছি। ত্বু একদিনের বেশি থাকিনি।'

'এবার কি—অনেকদিন?'

'ইচ্ছে তো তাই—দেখি কি হয়।'

যুবকটি তার স্ট্রাইপ টেরিকটনের প্যারালালস্-এর পকেট থেকে সিগারেটের প্যাকেট বার করে। তারপর সুদর্শনের দিকে এগিয়ে দিয়ে বলে, 'যদি বোর ফিল না করেন, তবে কয়েক মিনিট আপনার সঙ্গে গল্প করতে পারি। আমার হাতে বেশ কিছুটা সময় আছে। কিছু করার নেই।'

'বোর ফিল করবো কেন? ববং আমারই সুবিধে হল। একা একা দাঁড়িয়ে থাকতে হচ্ছে না।' সুদর্শন আঙুলের ফাঁকে সিগারেট নিতে নিতে বলে।

যুবকটি দেশলাই জ্বালায়। প্রথমে আগুন ধরায় সুদর্শনের সিগারেটে তারপর নিজেরটায়।

সিগারেটের প্রথম ধোঁয়া ছাড়বার পর সুদর্শন জানতে চায়, আপনি কি এখানেই থাকেন? মানে পার্ক স্ট্রীটের আশেপাশে?'

'না। ঠিক আশেপাশে নয়, আবার দূরেও নয়।'

বয়ঃসন্ধিকালের কয়েকটি যুবক মসৃণ ইংরেজি বলতে বলতে, বেশ হৈ হৈ করে ওদের পেবিয়ে যায়। চাৎ-পাঁচটি ছেলে। সঙ্গে মেয়েও আছে জনা-তিনেক। সুদর্শন মেয়ে তিনটির দিকে তাকায়। যুবকটি তখন সুদর্শনের চোখের দিকে তাকিয়ে সিগারেটের ধোঁয়া ছাড়ে।

সুদর্শন মন্তব্য করে, 'বেশ আছে এরা সব, না?'

'তাতো আছেই। সন্ধ্যের পর অন্য কোথাও আর ওদের সময় কাটেনা। আর পকেটে পয়সা আছে যখন, তখন তো এখানে সময় কাটানোই সুবিধে।' কথাগুলো বলার সময় যুবকটি সুদর্শনের চোখের দিকে তাকিয়ে থাকে সারাক্ষণ।

এবার তাদের দুজনকে পেরিয়ে যায় চার-পাঁচটি তরুণী। কলকল হাসি। হাসি ছুঁড়ে ছুঁড়ে তারা এগিয়ে যায়। রাস্তার পাশে রাখা একটা নতুন মডেলের ফিয়াট। সকলে একে একে ঢুকে যায় সেটার দরজা খুলে। অল্প পরেই এগিয়ে আসে একটা লম্বা ছেলে। গাড়ির

স্টিয়ারিং-এ বসে স্টার্ট দেয়।

'রাজা লোক ভাই! একা অতজনকে সামাল দিচ্ছে।' সুদর্শন না বলে পারে না।

'সাহায্য করার ইচ্ছে আছে নাকি?'

সুদর্শন হেসে বলে, 'ইচ্ছে থাকলে কি হবে। সাহায্যটা নিচ্ছে কে?'

'দিতে চাইলেই নেবে।' যুবকটি এবার সুদর্শনের পা থেকে মাথা পর্যন্ত দেখে নিয়ে হেসে বলে, 'আসলে যেটা দরকার সেটা তো ভালই আছে।' যুবকটির হাসি এবার আরো অর্থবহ হয়ে ওঠে।

কথাটার ইঙ্গিত বুঝতে পেরে সুদর্শন মনে মনে খুশি হয়। বলে, 'বড় শক্ত জায়গা, যা সব গাড়ি হাঁকিয়ে আসছে নবাবপুত্ররা! এদের সঙ্গে পাল্লা?'

'নয় কেন? সব তো ভুবিমাল।'

'তাই নাকি?'

'গত তিন বছর ধরে তো প্রায় প্রতিটি সন্ধ্যে এখানে ঘুরেছি। পার্কস্ট্রীটের কিছু আর জানতে বাকি নেই।'

'গুরুদেব লোক!' বলে সুদর্শন হাসে।

'ওই যে, এ দিকটায় দেখুন—আপনাকে হাতে হাতে প্রমাণ দেখিয়ে দিচ্ছি। ওই লোকটি—'একটি মধ্যবয়স্ক লোককে দেখায় সে। লোকটি এগিয়ে গিয়ে ট্রিঙ্কাসের দরজা ঠেলে ভেতরে চলে গেল।

'কে ভদ্রলোক?' সুদর্শন জানতে চায়।

'এখানে যারা নিয়মিত ঘোরাফেরা করে, তারা সবাই ওকে জানে —ক্যাপ্টেন মালহোত্রা নামে।'

'ক্যাপ্টেন?' সুদর্শন ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে প্রশ্ন করে।

'কোনদিন ছিল কিনা জানি না। তবে এখন নেই—এটা জানি। ভদ্রলোক ব্যবসা করে এখন। কিসের বিজনেস জানেন? কুকুরের। অন্তত সবাইকে তো তাই বলে বেড়ায়। থাকে মারকুইস্ স্ট্রীটে।

সন্ধ্যের পর ওকে দেখবেন এখানকার বিভিন্ন বারে। নিজের পরিচয় লেখা কার্ড থাকে সঙ্গে। যেচে গিয়ে যে-কোন টেবিলে গিয়ে বসে কার্ড এগিয়ে দেয়। অপরিচিত লোকের সঙ্গে অল্প সময়ে আড্ডা জমিয়ে তুলতে জুড়ি নেই লোকটার। এইভাবে খদ্দের ধরে ও। নিজের থেকেই ড্রিঙ্কস্ আনায়। তারপর সুবিধে মত নিজের ফ্ল্যাটে নিয়ে যায়। মেয়েছেলের ব্যবসা আছে লোকটার। এক নজরেই মালদার লোক চিনতে পারে। পার্টি ধরতে পারলে তাকে পুরোপুরি না শুষে ছাড়ে না লোকটা।'

সুদর্শন উত্তর দেয় না। চুপচাপ শুনে যায়।

'আর ওদিকটায় দেখুন—আর একজন। ওই যে ওপাশে, থামটার পাশে দাঁড়ানো ছেলেটি। গায়ে ইয়েলো ব্যানলন। ওর নাম লাভ্‌লি। প্রত্যেকদিন দেখবেন, ওইখানে, এই রকম সময় লাভ্‌লি ঠিক এই ভাবেই দাঁড়িয়ে আছে। ওর পকেটে কিন্তু একেবারেই টাকা-পয়সা থাকে না, অথচ ও ব্রেকফাস্ট করে এক হোটেলে, লাঞ্চ খায় অন্য কোন দামী জায়গায়; প্রায় ডিসকোতে ওকে দেখতে পাওয়া যায়। হি ইস্ এ মিস্ট্রি।'

সুদর্শন শুনে যায়। কোন মন্তব্য করে না।

'ওর আসল কাজ হল নানারকম গোপন জিনিসপত্তর এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় চালান করা। দারুণ চালু ছেলে। এরকম যে কত কিসি ক্যারেকটার ঘুরে বেড়াচ্ছে এখানে তার হিসেব নেই।

একটা ট্যাক্সি এসে দাঁড়াল ওদের সামনে। অম্বর নামল ট্যাক্সি থেকে

'হাই! প্রিন্স! এক্সকিউস মি ম্যান, শ্লা দেরি করিয়ে দিল।' বলতে বলতে অম্বর এগিয়ে আসে তার দিকে। পাশের যুবকটির দিকে তাকায়। তাকিয়ে হাসে। চেনে মনে হয়।

'আপনার বন্ধু এসে গেছে। আমি চলি। সি ইউ', বলে যুবকটি

আর দাঁড়ায় না। ওদের দুজনের দিকে তাকায় আর একবার। হাসে। চলে যায়।

'তুই ওকে জানিস নাকি ?' অম্বর জিজ্ঞাসা করে।

'না। কাল বাসে চেনা হয়েছিল। ভিড় বাস থেকে পড়ে যাচ্ছিল। আমি সেভ করেছি। এখানে হঠাৎ দেখা হল।

'তোর চেনা মনে হচ্ছে ?'

'না। ঠিক চেনা নয়, তবে এখানেই দেখি হরদম। হি ইস্ এ ফিসি ক্যারেকটার। ওর নামটা কি বল তো ?'

'নামটা তো জিজ্ঞেস করিনি। নামের কথাটা শ্লা মনেও হয়নি একবার।'

সুদর্শনের কানে, যুবকটির মুখ থেকে শোনা কিসি ক্যারেকটার আর অম্বরের মুখের ফিসি ক্যারেকটার—একাকার হয়ে গেল।

'তোর সেই পার্টি কোথায় ? যার জন্যে আসা ?' সুদর্শন জানতে চায়।

'সে আজ এলো না। শ্লার খাঁই খুব বেশি। ঠিক্ হ্যায়—আমিও শ্লা অম্বর সিং !' অম্বর আপন মনে খানিকটা বিড়বিড় করল।

বারে ঢুকতে ঢুকতে অম্বর জানতে চাইল, 'কি বলছিল রে ও এতক্ষণ ?'

'ঠিক কিছু নয়। এই পার্ক স্ট্রীটের গল্পস্বল্প আর কি।'

'এ শ্লা আজব জায়গা! এখানে দোস্ত্, এক একটা মানুষ এক একটা নভেল হয়ে বসে আছে।' বারে বসতে বসতে অম্বর মন্তব্য করে।

কথা চলে। চলতে থাকে।

বেয়ারা আসে বারবার।

এক সময় সুদর্শন বলে, 'কিন্তু তোর গার্লফ্রেণ্ডরা কোথায় ? তাদের দেখলুম না তো ? তবে যে বলিস গার্লফ্রেণ্ডদের ফিট করার মত টাইম নেই তোর। তারা গেল কোথায় ?'

'কোথায় আবার যাবে ? সবাই আছে।' বলে অম্বর একটু রহস্য

করে,' কিন্তু তোমায় ম্যান, ইনট্রোডিউস করে দিলেই—চিড়িয়া নয়া পিঞ্জরায় ভিড়বে। যা ফিলিম-হিরোর বডি বানিয়েছ একখানা, তিরছি নজরেই আমায় ফুটিয়ে দেবে বাবা।'

'ব্যাপারটা খুব আনস্পোর্টিং হচ্ছে অম্বর।'

'গোটা কলকাতা পড়ে আছে তোমার পায়ের তলায়—করো যত খুশি স্পোর্টস, কেউ বাধা দেবে না। খুশি হয়ে শুধু ক্ল্যাপ দিয়ে যাবো গ্যালারী থেকে।

সুদর্শন হেসে বলে, 'ঠিক হ্যায়। দেখবো বাঘের খেল।'

॥ ছয় ॥

বাংলা দৈনিকের পাতা খুলে বসেছিল অর্ণব। সাধারণত বিকেলে সে সকালের কাগজ পড়ে না। যতটুকু পড়ার সকালেই পড়ে নেয়। আজ রবিবার। রোববারে এমনিতে কাগজটা আসে একটু দেরিতে। সকালবেলায় চোখ বুলোনো হয়, পড়া হয় না ঠিক মতো। সেটা বরং হয়, খেয়েদেয়ে উঠে। এখনও সে কাগজ পড়ছে না, বিজ্ঞাপন দেখছে। দু পাতা জুড়ে নানা অভিনয়ের বিজ্ঞাপন। অভিনয়ের বিজ্ঞাপন দেখলে তো তার খুশি হয়ে ওঠা উচিত। এতে তো বোঝা যায়—অভিনয় শিল্পটা এদেশে কত জনপ্রিয়। ছবিতে লেখাতে—এক একটা বিজ্ঞাপনের পেছনে কি হারে খরচ হয়েছে ভাবলে অবাক হতে হয় বৈকি। কিন্তু দৈর্ঘ্যে-প্রস্থে এই বিজ্ঞাপনের বহর তাকে খুশি করে না, বরং কেমন যেন উদ্বিগ্ন করে।

বেশির ভাগ বিজ্ঞাপন যাত্রা কোম্পানীর। থিয়েটার বা নাটকের বিজ্ঞাপনও আছে বেশ। কমার্সিয়াল নাটক। সেখানেও জনপ্রিয় অভিনেতা-অভিনেত্রীর বড় বড় ছবি। কে কত বেশি রজনী অতিক্রান্ত করতে পেরেছে তার সোচ্চার ঘোষণা। অভিনয়-জগতের যা টাকার চলাচল হয় তার নিরানব্বই ভাগই এই যাত্রা আর বাণিজ্য-প্রবণ নাটকের খাতে হয়। বাকি এক-শতাংশের পুরোটাও 'অঙ্গীকার' মত নাট্যসংসদের ভাগ্যে জোটে কিনা সন্দেহ।

কি করে জুটবে?

ভারতবর্ষের অন্য যে কোন শহরের মানুষদের তুলনায় কলকাতার মানুষ বেশি নাটক দেখে তাতে সন্দেহ নেই। কলকাতার মঞ্চজগৎ বহাল তবিয়তে সিনেমা-জগতের সঙ্গে প্রতিযোগিতা চালিয়ে যাচ্ছে। শহরে বড় বড় বোর্ডগুলো আর গ্রামে যাত্রা। সেক্সভায়লেন্স মার্কা রমরমা ফিল্ম দুনিয়ার সঙ্গে এরা পাল্লা দিচ্ছে এখনো—এটা কি কম

কথা? অন্তত: উজ্জ্বল যখন তর্ক জোড়ে তখন তো এই রকম সুরেই কথা বলে।

উজ্জ্বলের এই তর্কপ্রবণতাকে ভাল লাগে অর্ণবের। তবে মাঝে মাঝে বড় উত্যক্ত করে উজ্জ্বলটা। জেনেশুনেও তর্ক চালাবার খাতিরে উল্টো কথা বলে চলে।

এখন যদি উজ্জ্বল থাকত, তাহলে বলত, 'দেশের বুদ্ধিজীবীরাই শুধু নাটকের দর্শক হবেন কেন? সাধারণ মানুষই তো আসল।'

সাধারণ মানুষ কি চায় নাটকের কাছ থেকে?

সবার আগে চায় চড়া সুরের একটা গল্প। গল্প না জমাতে পারলে নাটক জমবে কি করে? তাদের ভাল লাগবে কেন?

বক্তব্য, নাট্যমুহূর্ত, অনুভাবনা—এসব নিয়ে মাথাব্যথা করুন বুদ্ধিজীবীরা। সবার আগে চাই প্রমোদ। সারাদিনের পরিশ্রমের পর মানুষ একটু আরাম চায়, খুশি হতে চায়। তখন তাদের ঘাড়ে বোঝার ওপর শাকের অাঁটি চাপাতে গেলে তারা দেবে কেন? কি দায় তাদের? এ জন্যেই বেশির ভাগ লোকই গ্রুপ থিয়েটারে নাটক দেখায় তেমন উৎসাহী নয়। গ্রুপ থিয়েটারগুলো আজ যেমন টিমটিম করে চলছে—আগামীকাল তেমন টিমটিম করেই চলবে—এর আর কোন অন্যথা নেই।

তর্কের খাতিরে উজ্জ্বল মুখে এসব কথা বললেও অন্তর থেকে এসব বিশ্বাস করে না! করত যদি তাহলে আর ও এতো বছর গ্রুপ থিয়েটার নিয়ে পাগল হয়ে থাকত না। নিজেই বলে, 'আসলে গ্রুপ থিয়েটারগুলো হল এক ধরনের পাগলদের স্বরচিত আশ্রম। অর্ণবদার মতো কিছু বড় পাগল আর আমাদের মতো কিছু ছোট পাগল—এদের আড়ৎ।' বলে নিজেই হাসে।

পাগল তো বটেই! খবরের কাগজটা ভাঁজ করে রাখতে রাখতে অর্ণব ভাবে।

একটা চড়ুই পাখি উড়ে আসে বাইরের থেকে। জানলার রেলিং-

এর মাঝখানে বসে পড়ে অস্থির ভাবে এদিক ওদিক তাকায়। গলায় কালো দাগ। ফরফর করে আবার উড়ে যায় পাখার নিচে দিয়ে ঘরের উলটো দেওয়ালে। ওয়্যারিং-এর ওপর বসে এদিক ওদিক তাকায়। তারপর আবার ঠিক যেভাবে এসেছিল আচমকা সেভাবেই উড়ে চলে যায়।

তনয়ার আজ শরীরটা ভাল নেই। পাশের ঘরে ঘুমুচ্ছে। সন্ধ্যেবেলায় মহড়ায় যাবে না তনয়া। অর্ণব একাই যাবে। সামনের মাসে একটা দিন হল বুক করা আছে। মাঝে কটা দিন পাওয়া যাবে রিহার্সালের? অবশ্য পুরনো নাটক বলেই ভরসা। দু-চারটে জোরদার রিহার্সাল দিলেই হবে। শুভার হাতেও এখন খুব বেশি নাটক নেই। শুভা বেশি সময় দিতে পারবে। কিন্তু এর পর থেকে শুভাকে যতটা পারা যায় বিশ্রাম দেওয়া দরকার। মেয়েটা কি? এত বড় একটা অসুখ—অথচ পাত্তাই দিতে চায় না। এ ভাবে খাটলে আর বাঁচবে কদিন? এতদিন সে শুভা সম্পর্কে যেমনভাবে ভেবে এসেছে—আজ আর তেমনভাবে ভাবতে পারছে না। পরশুদিন ডাক্তার পালিতের চেম্বার থেকে আসার পরই তার ভাবনাচিন্তা কেমন জট পাকিয়ে যাচ্ছে।

গত তিন মাসে অফিস ক্লাবের দশ-বারোটা শো করেছে শুভা। তার ওপর অন্বীক্ষার নাটক। ভেতরে ভেতরে যে মেয়ে অসুস্থ, তার পক্ষে এ ধরনের খাটনি তো মারাত্মক। তনয়া একবার বলেছিল অর্ণবকে, 'তুমি যে ওকে একটার পর একটা অফিস ক্লাবের শো ধরিয়ে দিচ্ছ, ব্যাপারটা কি? মেয়েটাকে কি মেরে ফেলবে?'

'আমি আর ধরিয়ে দিচ্ছি কোথায়? আগে ওর জন্যে একে ওকে তাকে বলতাম। এখন আর আমার বলার দরকার হয় না। অফিস ক্লাবের লোকেরা সরাসরি ওর সঙ্গেই যোগাযোগ করে। আর ওরই বা না করে উপায় কি বলো? অন্বীক্ষার থেকে তো পয়সা পায় না। ওদের সংসারেও তো মনে হয় উপার্জন করার কেউ নেই।'

'ছাখো, সংসারে চাহিদার শেষ নেই। জানোতো যতই আনো মেটে না। এখন মেয়েটা যদি বসে যায়—অসুখ-বিসুখে পড়ে—তাহলে ফ্যামিলি চালাবে কি করে। তার চেয়ে বরং অল্প অল্প করুক। ওর মুখের দিকে চাইলে তো বুঝতে পারি—শরীরে নিচ্ছে না তবু রিহার্সাল দিয়ে যাচ্ছে দিনের পর দিন।'

সেদিন তনয়ার বলার উত্তরে. অর্ণব কিছু বলেনি। কিন্তু পরশু থেকে সে ভেবে কিনারা পাচ্ছে না কিছুতেই। অফিস ক্লাবের নাটক না করা মানে ওর সংসারের অবস্থা হবে সাংঘাতিক। অন্বীক্ষার ফাণ্ডের অবস্থাও তো করুণ। উজ্জ্বলকে বলে…সেখান থেকে কিছু দেওয়ার ব্যবস্থা করা যাবে—তাও সম্ভব নয়। আশ্চর্য! মেয়েটার কোথাও কোন আত্মীয়স্বজন আছে বলেও তো মনে হয় না। থাকলেও শুভা যে কিছুতেই তাদের কাছে যাবে না তা অর্ণব জানে। ভেতরে ভেতরে এ ধরনের মেয়েরা খুব জেদী হয়।

গীতা এসে টেবিলের ওপর চায়ের কাপ প্লেট রাখল। আর প্রায় একই সঙ্গে দরজায় শব্দ হল বেল বাজার। অর্ণব হেঁকে বলল, 'আমার চা খাওয়ার সঙ্গে বেল দেওয়ার যোগাযোগটা তো উজ্জ্বলেরই ঘটে দেখেছি। এখন তো ওর আসার কথা নয়।'

গীতা ততক্ষণে এগিয়ে গিয়ে দরজা খুলে দিয়েছে। চটি নয়, এক জোড়া স্যুর শব্দ এগিয়ে এল।

ঘরের পরদা সরিয়ে সুদর্শন বলল, 'আছেন তাহলে? আমি ভাবতে ভাবতে আসছি হয়তো বেরিয়ে পড়বেন।'

'এসো, যুবরাজ। তুমি দেখছি কলকাতায় এসেই কাজে মেতে গেছো!' অর্ণব গলা তুলে বলে, 'গীতা, চা আর এক কাপ।' বলতে না বলতেই গীতা এক কাপ চা নিয়ে আসতে শুরু করে দিয়েছিল।

'কার চায়ে আবার ভাগ বসালাম?' সুদর্শন কাপটা নিতে নিতে বলে, 'বৌদিকে দেখছি না যে?'

'কারো চায়ে ভাগ বসাওনি। এ বাড়িতে চায়ের জল চাপাবার

সময় ওরা সব সময়ই একটু বেশি নিয়ে রাখে। তোমার বৌদির শরীর ভাল না, পাশের ঘরে শুয়ে আছে।'

'কি হয়েছে?'

'ইনফ্লুয়েঞ্জা। আজ তো আমি একাই যাচ্ছি রিহার্সালে। তুমি একদিন যাবে বলেছিলে না?'

'সেজন্যই তো এলাম।'

'আচ্ছা। বাঃ, ভালই হল। হাতে সময় থাকবে তো? অন্তত ঘণ্টা দুয়েক।'

'হ্যাঁ হ্যাঁ। এখন থেকে ন'টা পর্যন্ত আমার কোন কাজ নেই। ন'টার সময় যাবো অম্বরের কারখানায়।'

'ঠিক আছে। তুমি পাশের ঘরে গিয়ে তোমার বৌদির সঙ্গে দেখা করে নাও, আমি পোশাকটা বদলে নিই।'

তনয়া খাটের ওপর উঠে বসেছিল। সুদর্শন যেতে বলল, 'তোমার গলা শুনে উঠে বসলাম। ক্লাবে যাচ্ছো। তুমি তো বাবু ফিল্মের ফ্যান। নাটক কি আর তোমার ভাল লাগবে? তার ওপর আমাদের নাটকের মহড়া। তবে এই নাটকটায়—শুভা আমাদের গ্রুপের নতুন একটি মেয়ে দারুণ করছে। রোলটাই টেরিফিক।'

'নর্থবেঙ্গলে গেছিল কি?'

'না না—তখনো শুভা আমাদের গ্রুপে আসেনি। তারপরই জয়েন করেছে। খুব সাইনিং। তবে খুব কষ্ট করতে হয় তো মেয়েটাকে। ফ্যামিলিতে ও একাই আর্ণ করে কিনা, ফলে এ ধরনের নাটকের জন্যে যতখানি পরিশ্রম দিলে ওর অভিনয়টা আরো খুলতো—ততখানি দিতে পারে না। তবু বাহবা দিতে হয় মেয়েটাকে—এতো সিনসিয়ার এতো কাম অ্যাণ্ড কোয়ায়েট সচরাচর দেখা যায় না।'

সুদর্শনের সঙ্গে বেশি কথা হলো না তনয়ার। অর্ণব বেরিয়ে যাবার আগে তনয়া বলে দিল, 'তাড়াতাড়ি ফিরতে।'

'আসছি। গীতা, দরজাটা বন্ধ করে দাও।' দরজার বাইরে আসতে আসতে ডেকে বলে দিল অর্ণব।

সুদর্শন আর অর্ণব হেঁটে গিয়ে ট্রামে উঠল। নির্দিষ্ট স্টপেজে ট্রাম থেকে নেমে রিহার্সালের বাড়িটা সামান্যই দূর।

মহড়া ঘরটা বেশ বড় ধরনের। দেখলেই বোঝা যায় অনেক পুরোনো আমলের বাড়ি। সপ্তাহে দুদিন তিন ঘণ্টা করে ভাড়া নেওয়া। অন্যদিন দরকার হলে অনেক আগে থেকে ব্যবস্থা করতে হয়। সারা বাড়িটা জুড়েই নানা ধরনের নাচগানের স্কুল বসে সপ্তাহের বিভিন্ন দিনে, বিভিন্ন সময়ে। অনেকগুলো সাইনবোর্ড টাঙানো। সবাই এসে গেছিল।

লম্বাটে ধরনের ঘর। সতরঞ্চ পাতা মেঝেতে। মাঝখানটা ফাঁকা রেখেই, দেওয়ালে পিঠ দিয়ে বসেছিল সকলে। অর্ণব ঢোকার সঙ্গে সঙ্গে উঠে দাঁড়াল প্রত্যেকে। আবার বসল আগের মত।

স্যু খুলতে হল সুদর্শনকে। তা না হলে আর সকলের মত হাঁটু মুড়ে কিংবা আসনপিঁড়ি হয়ে সহজভাবে বসা যাবে না। উজ্জ্বল ছাড়া আরো তিন-চারজনকে চিনতে পারল সে। পুরোনোরা তাকে দেখেই চিনল, হাসল। সুদর্শন বলল, 'আর সব দেখছি না যে।'

সুদর্শনের কথার উত্তর দিল অর্ণব, 'আমাদের মত নাটকের দলের তো ভাই ওটাই মজা। দু-চার বছর অন্তরই দলের চেহারাটাই পাল্টে যায়। মেয়েদের বিয়ে হয়ে গেলে আমাদের দেশে নাটক করা শক্ত। ছেলেরা কলকাতার বাইরে চাকরী পেলে তাদেরও হয় একই অবস্থা। আর অবিবাহিত মেয়ে এবং বেকার ছেলেদেরই তো বেশি ঝোঁক থাকে নাটক করার। পুরোনোরা চলে গেলে সেখানে আবার নতুনরা আসে। তবে কেউ কেউ থেকে যায়। সেই কেউ কেউ-এর দলে আমরা পড়ে গেছি—তাই না উজ্জ্বল ?'

সুদর্শন সারা ঘরটায় একবার চোখ বুলিয়ে নিল।

অদ্ভুত একটা জগতের মানুষ। ঘরের খেয়ে বনের মোষ তাড়ানো

আর কাকে বলে। কি রকম সব চুপচাপ বসে আছে। যেন পুজোর মন্ত্রপাঠ হবে এক্ষুনি—এমন একটা ভক্তি-ভক্তি ভাব। সত্যি, জগতে কত রকমেরই না লোক আছে ; কত খেয়ালের।

অর্ণব না বললেও সুদর্শন বুঝতে পারে তার ঠিক উল্টো দিকে সাদা সিল্কের শাড়ি পরে যে মেয়েটি বসে আছে সেই-ই শুভা।

সুদর্শনের চোখে চোখ পড়ে।

ব্বা! ভারি সুন্দর চোখ ছুটো তো মেয়েটার! আহা, ঠিক কার মত যেন দেখতে! সুদর্শনের কাউকে চোখে পড়লে প্রথমেই সে মিলিয়ে নিতে চায় তার প্রিয় ফিল্ম-হিরোইনএর মুখের আদলের দাগে। শুভার চোখের দিকে তাকানোর সঙ্গে সঙ্গে সে মিল খুঁজতে শুরু করে দেয়। কিছুতেই আর মনে পড়ে না। এক এক করে সব হিরোইনের মুখ টেনে আনে মনের তলায়। মেলাতে পারে না। তাহলে কি বাংলা ছবির কারো মতো? কিন্তু বাংলা ছবি তো সে দেখেই না বলতে গেলে। মেয়েটাকে বারবার দেখতে ইচ্ছে করলেও সে আর তাকায় না। অর্ণবকে বলে, 'অর্ণবদা, আপনারা রিহার্সালের রুমটি কিন্তু দারুণ পেয়েছেন।'

'দারুণ পেলে কি হবে! ভাগ্য আমাদের সহায় নয়।'

উজ্জ্বল কেমন যেন আপশোশের গলায় বলে।

'কেন? কি হল?'

এবার অর্ণব মিত্র উত্তর দেয়, 'এ বাড়ি শীঘ্রিই ভাঙা হবে। মাল্টি-স্টোরেড বিল্ডিং হবে। আর আমরা হয়ে যাবো উদ্বাস্তু।'

অল্প পরে মহড়া শুরু হল। মহড়া শুরু হলে আর মেয়েটির দিকে দেখতে কোন অসুবিধে নেই। এখন তো সবাই দেখছে মেয়েটিকে। এদের তৈরী নাটক—তাই মহড়ায় অর্ণব মিত্রকে দেখাতে হয় সামান্যই। শুধু জায়গায় জায়গায় কিভাবে আরো ভালো করা যায় তারই নির্দেশ দেওয়া।

ব্যাপারটা যতটা খারাপ লাগবে ভেবেছিল সুদর্শন ততটা খারাপ

লাগে না। বড় বড় শক্ত শক্ত অনেক কথা। এসব সুদর্শনের আদৌ ভাল লাগে না। কিন্তু শুভার মুখে শুনতে খারাপ লাগে না। মেয়েটার গলার স্বর এতো নরম আর এতো মিষ্টি—শুনলেই মনটা কেমন যেন অন্য রকম হয়ে আসে। আর সেই সঙ্গে ওই একজোড়া চোখ—একবার তাকালে আর চোখ ফেরানো যায় না। অথচ মেয়েটার চেহারায় এমন আর কিছুই নেই যা তাকে টানতে পারে। খুব সাদা-মাটা চেহারা। সাধারণত যে ধরনের মেয়েদের দেখলে সুদর্শন ভেতর থেকে খুব আকর্ষণ বোধ করে—শুভার চেহারা তার ধারে-কাছেও আসে না। তবু মেয়েটাকে এতো ভাল লাগছে কেন সুদর্শন ভেবে পায় না। একটা মেয়ের গলার স্বরে তার কি এসে যায়? চোখ দুটোর না হয় একটা টান আছে বোঝে সে। শুভার চেয়ে আগের সেই দুটো মেয়ে, যারা শিলিগুড়ি গেছিল তারা অনেক আকর্ষণীয় ছিল। সে দুটোর তুলনায় এ মেয়েটার তো কিছুই নেই। অথচ কি যেন একটা আছে এই মেয়েটার মধ্যে সুদর্শন ঠিক ধরতে পারে না। মেয়েটা নাকি খুব পরিশ্রম করে। হ্যাঁ, মুখের দিকে তাকালে তাইতো মনে হয়। কেমন যেন মায়া হয় দেখলে। আসলে এইটাই হল আসল কারণ। মায়া হয়। সুন্দরী মেয়ে দেখলেই সুদর্শনের ইচ্ছে করে তাকে হাতের মুঠোয় পেতে। লুঠ করতে। ভেতরটা কেমন যেন নিসপিস করতে থাকে। একটা অস্বস্তি পাকিয়ে পাকিয়ে ওঠে তার শরীরে। শুভাকে দেখে তেমন কিছুই হচ্ছে না সুদর্শনের। ধ্যাৎ।

আসার ইচ্ছে ছিল তাই দেখে গেল আজ। দ্বিতীয় আর কোনদিন আসার জন্যে কোনরকম টান অনুভব করে না সে। এখানে এমন কেউ নেই যে তাকে টানবে, তাকে উত্তেজিত করেত পারবে। আর তা যদি না হল তো এই সব বড় বড় শক্ত শক্ত কথা শোনার জন্যে সময় ব্যয় করার কোন মানে হয়!

মাঝে মিনিট দশেক মহড়া বন্ধ থাকল। চা এলো। শক্তি নামে একটি ছেলে একটা বড় কেটলিতে আর এক ঠোঙা মাটির ভাঁড় নিয়ে

এল। শক্তির হাত থেকে ভাঁড়ের ঠোঙাটা নিয়ে শুভা একটা একটা ভাঁড় ধরিয়ে দিল সকলের হাতে। সুদর্শনকে এগিয়ে দেওয়ার সময় হেসে বলল, 'এভাবে চা খাওয়ার অভ্যেস আছে তো? না থাকলে ছুটো ভাঁড় নিন, তাহলে গরম লাগবে না।'

সুদর্শন সঙ্গে সঙ্গে বলে, 'হ্যাঁ হ্যাঁ, অভ্যেস আছে, আমার খুব আছে। আপনি দিয়ে দেখুন না, ফেলব না।'

শক্তির হাত থেকে এবার চায়ের কেটলিটা নিয়ে নেয় শুভা। একে একে সবাইকে চা ঢেলে যায়। বোঝা যায় প্রায়ই শুভা এই ভূমিকাটা নেয়। মেয়েটার মধ্যে খুব একটা সহজ সহজ ভাব আছে। সহজ অথচ করুণ। সুদর্শনের কাছে গেলে সুদর্শন ভাঁড়টা তুলে ধরে। চা ঢালার আগে শুভা দেখে নেয় মাটির ভাঁড়টা সুদর্শন কিভাবে ধরেছে।

সুদর্শন বুড়ো আঙুল আর মাঝের আঙুল দিয়ে ভাঁড়ের মাঝখানটা চেপে ধরেছিল।

শুভা বলল, 'ওভাবে ধরলে হাতে গরম লাগবে। ধারের দিকটায় ধরুন।'

'আমার এতে গরম লাগে না। আমি খুব বেশি গরম সহ্য করতে পারি। আপনি ঢালুন।' হেসে বললেও একটু যেন রোখের মাথায় সুদর্শন কথাটা বলে।

শুভা চা ঢাললে তার হাতে গরম লাগে, কিন্তু সে নির্বিকার মুখে হেসে যায়। শুভা হেসে বলে, 'গরম লাগছে—তবু ধরে আছেন তো!'

'একেবারে লাগছে না।' সুদর্শন সঙ্গে সঙ্গে বলে দেয়। চা-এর বিরতির পর আবার মহড়া শুরু হলো। সঙ্গে সঙ্গে আবার সবাই সেই আগের মত সতর্ক হয়ে গেল। নিমেষে শুভা যেন চলে গেল অন্য জগতে। সুদর্শন আর কিবা করে—শেষ পর্যন্ত দেখে গেল চুপচাপ।

মহড়া শেষ হওয়ার পর অর্ণব বলে সুদর্শনকে, 'আবার এসো একদিন। তুমি কোন্ দিকে যাচ্ছো এখন?'

'আমি যাবো মৌলালিতে—আমার বন্ধুর এক ফ্যাকট্রিতে।'

'দাঁড়াও তাহলে, শুভা চলে যাক তোমার সঙ্গে' কথাটা বলেই কি একটা যেন মনে হওয়াতে অর্ণব বলে, 'আচ্ছা ঠিক আছে, তুমি যাও।'

'কাউকে নিয়ে যেতে হবে? আমি তো ট্যাক্সিতেই যাবো—কেউ যদি যেতে যান ওদিকে আমি নামিয়ে দিতে পারি।'

শক্তি বলল, 'চলুন তাহলে—আমি নেমে যাবো বালিগঞ্জ ফাঁড়িতে আর শুভা নামবে পার্ক সার্কাসে। চলুন।'

'বেশ। তাহলে চলে যাও শুভা।' কেমন যেন ইচ্ছার বিরুদ্ধে কথাটা বলে অর্ণব।

সুদর্শন, শক্তি আর শুভা রাস্তায় নেমে আসে।

ট্যাক্সি মেলে সহজেই। ড্রাইভারের সঙ্গে লোক আছে একজন। ওরা তিনজনেই বসে পেছনের সিটে। একদিকের জানলায় শুভা, মাঝখানে শক্তি, অন্যদিকের জানলায় সুদর্শন।

শক্তি খুব হৈ হৈ করে দ্রুত কথা বলতে পারে। ওইটুকু পথের মধ্যে সে সুদর্শনকে অনেক কথা শুনিয়ে দেয়। ওই পথটুকু সুদর্শন বা শুভা কারোরই কথা বলার সুযোগ আসে না।

বালিগঞ্জ ফাঁড়ির কাছে গাড়ি দাঁড়ালে সুদর্শন নেমে দাঁড়ায়। শক্তি বেরিয়ে আসার পর আবার ভেতরে গিয়ে বসে। শক্তি হাত নেড়ে চলে যায়। ট্যাক্সি আবার চলতে শুরু করলে শুভা জানতে চায়, 'আপনি থাকেন কোথায়? মৌলালিতে?'

'না। আমি তো সবে এসেছি কলকাতায়। দুদিন ভবানীপুরে ছিলাম। এখন আছি চৌরঙ্গীতে।'

'আপনাদের বাড়ি তো শিলিগুড়ি? তাই না? অর্ণবদা বলছিলেন একদিন।'

'হ্যাঁ। 'অন্বীক্ষা' নর্থবেঙ্গল ট্যুরে গেছিল সেবার। আপনি তখন ছিলেন না এ গ্রুপে।'

'এর আগে আমি কোন গ্রুপেই ছিলাম না। স্কুলে আর কলেজে

ঢুকে একটা ছুটো নাটক করেছি বড় জোর। আমার এক বন্ধু একদিন নিয়ে এলো অন্বীক্ষায়, তার পর থেকেই এটা আমার নিজের গ্রুপ হয়ে গেল।'

'দেখেছি, নাটক একবার যাদের মাথায় ঢুকে যায় তাদের আর অন্যকিছু ভাল লাগে না।'

'ঠিক বলেছেন, নাটককে একবার ভালবাসতে শুরু করলে আর কিছুকে ভালবাসা যায় না।' বলে খুব মিহি করে হাসে শুভা। সুদর্শন একবার শুভার চোখের দিকে তাকায়। পাল্টা হাসে।

আবার কথা পড়ে যায়। ট্যাক্সি নিঃশব্দে ছোটে। সিগারেট ধরায় সুদর্শন। চুপচাপ ভাবটাকে কাটাবার জন্যেই একসময় বলে ওঠে, 'একদিন আপনাদের গ্রুপের শো দেখে যাব।'

'শুধু একদিন কেন? আমাদের গ্রুপের পরিচিত যারা তারা সবাই প্রায় আমাদের নাটক থাকলেই চলে আসে হলে। আপনিও চলে আসবেন—অবশ্য ভাললাগে যদি।'

'ভাল লাগবে না কেন? আজ রিহার্সাল দেখতেও খুব ভাল লাগছিল। একমনে দেখছিলাম।'

হঠাৎ কি একটা কথা মনে পড়ায় অস্ফুট হাসি খেলে গেল শুভার ঠোঁটে। সুদর্শনের দিকে তাকাল সে, তারপর ওর চোখের দিকে তাকিয়ে বলল, 'তখন আপনি যাই বলুন না কেন, চা নেওয়ার সময় আপনার হাতে কিন্তু গরম লেগেছিল। শুধু জেদের মাথায় মুখটা হাসি হাসি করেছিলেন। তাই না? বলুন? আমার অবিশ্যি জেদি মানুষেদের খুব ভাল লাগে। আমি নিজেও একটু জেদি কিনা।'

সুদর্শন লক্ষ্য করল হাসলে শুভার মুখে কেমন যেন একটা প্রতিমার আদল এসে যায়। খুব ভাল লাগে।

শুভা পার্ক সার্কাস আর পার্ক স্ট্রীটের মোড়টায় নেমে গেল।

॥ সাত ॥

মৌলালির ফ্যাক্টরিতে অর্জুনসিং বেদীর সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিল অম্বর। অদ্ভুত পোশাক পরেছে অর্জুন। সাদা স্যুটএর মত পোশাকে সোনালী জরির বিচিত্র সব কাজ করা। মাথার সাদা পাগড়িতেও সোনালী ঝালর। মুখেও সম্ভবত পেন্ট করেছে। ঘনকালো গালপাট্টা। চোখে মোটা করে সুর্মা টানা। ডান হাতে দু ইঞ্চি চওড়া নানান কারুকাজ করা ব্যাণ্ডের ওপর বেশ বড় গোছের একটা হাত-ঘড়ি। পায়ের সাদা নাগরাটায়ও স্যুট আর পাগড়ির সঙ্গে মানান করে জরির নক্সা তোলা।

থিয়েটারের সাজঘরে অর্জুনকে দেখলে অবাক হতো না সুদর্শন। অদ্ভুত লাগল ফ্যাক্টরির মধ্যে দেখে। চণ্ডীগড়ে খেলার সরঞ্জাম তৈরীর কারখানা আছে ওর। কলকাতায় আছে কয়েকটা প্রাইভেট বাস, মিনিবাস বার করেছে সম্প্রতি। সরকারী অফিসার এবং কর্মচারী মহলে প্রভাব প্রতিপত্তি আছে বেশ। সুদর্শনের মিনিবাস বার করার ব্যাপারে ওর সাহায্য খুব কাজে লাগবে। সেই নিয়েই কথাবার্তা হলো খানিকক্ষণ। অর্জুন আশ্বাস দিল সুদর্শনকে—অনেকদূর এগিয়েছে, ঘাবড়ানোর কিছু নেই। অপেক্ষা করুন, হয়ে যাবে ঠিক।

ফ্যাক্টরি থেকে বেরিয়ে তিনজন এল পার্কস্ট্রিটের ব্লুফক্সে। অর্জুনের জন্যেই আসতে হলো।

অর্জুনের দ্বিতীয় এবং প্রধান পরিচয়টা সুদর্শন আগেই পেয়েছে। পপসিঙ্গার। পার্ক স্ট্রিটের বিভিন্ন রেস্তোরায় গান গায়। এটাতে বেশ মোটা টাকা কামায় ও। এ ছাড়া বাইরের পাবলিক আসর আছে। দুর্গাপুর, আসানসোল, পাটনা, জামসেদপুর, রাঁচি থেকে আরম্ভ করে গৌহাটি, শিলং, নাগাল্যাণ্ড মনিপুর—পূবের শেষ সীমা পর্যন্ত মাঝে

মাঝে ও প্রোগ্রাম করে আসে। সামনের পুজোয় বাংলা রেকর্ড করবে। একটা ফিল্মে প্লেব্যাক করারও কথা হয়েছে।

মনে মনে সুদর্শন সেলাম করে অর্জুনসিংকে। এই তো ছেলে। কোথায় চণ্ডীগড় আর কোথায় কলকাতা। কেমন দাপটে আছে। আর শিলিগুড়ি থেকে এসে কলকাতা কব্জা করতে পারবে না সুদর্শন?

ব্লুফক্সে ঢুকে অম্বর আর সুদর্শন কোণের একটা টেবিল নিয়ে নিল। অর্জুনের প্রোগ্রাম আছে। সে চলে গেল ডায়াসে। এতক্ষণ একটি অ্যাংলোইণ্ডিয়ান মেয়ে—হাতে মাইক নিয়ে—নেচে নেচে ঘুরে ঘুরে হিন্দি গান গাইছিল। মেয়েটির গান শেষ হলে অর্জুনের নাম ঘোষণা হলো। এসব জায়গায় অর্জুন যে খুব জনপ্রিয় সেটা বোঝা গেল ও ডায়াসে ওঠার সঙ্গে সঙ্গেই। ওর ওই উদ্ভট সাজটারও একটা দাম আছে ওর জনপ্রিয়তায়। পপুলার হওয়ার কত যে পথ আছে।

অম্বর অর্ডার দিল বেয়ারাকে, আর গলায় রহস্য মিলিয়ে বলল সুদর্শনকে, 'স্রেফ গেলাসের মালে চলবে তো?'

'আরে ইয়ার, জেরা দেখকে চলবো তো? আগে পকেটে কিছু আসুক। তারপর আছেই তো আমার বাঘের খেল।'

কয়েক পেগ গলায় যাবার পর অম্বর শুধলো, 'তোর দাদা কি তোকে খিস্তি করেছিল খুব?'

সুদর্শন জিয়াজির ম্যাচমেকার সার্টএর বুকটা খুলে দিল। এই ঠাণ্ডা ঘরেও অস্বস্তি লাগছে। অম্বরের প্রশ্ন শুনে টেবিলের ওপর গ্লাস রেখে বলল, 'কোন্ শ্লা খিস্তি করবে রে আমায়? উল্টে আমি দিয়েছি খিস্তির তুবড়ি ছুটিয়ে। ইস্কুল-মাস্টার তো। বাংলা ব্যাকরণের পাতায় লেবড়ে আছে মাইরি। এদের শ্লা কোনদিন মর্ডান আউটলুক তৈরী হবে না।'

'কি করে হবে? তুমি গুরু যা রকেট ছুটিয়েছ?'

সুদর্শন হাসে। অম্বর ভুল বলেনি। সত্যি, তাদের স্পীড ধরতে

পারা, ঠিক তার আগের জেনারেসনের লোকদের পক্ষেও সম্ভব নয়। এর ওপর সে লোক যদি মাস্টার হয়, তাহলে তো কথাই নেই।

সুদর্শন তার বাড়ির কথা ভাবতে থাকে। বাড়িকে সে তো চির-কালের মত পেছনে ফেলে এসেছে। কোন কিছু টান নেই তার। কেন থাকবে? কার জন্যে থাকবে? মা কিংবা বাবা একজনও কেউ যদি বেঁচে থাকতো তাহলে না হয় কিছু থাকতো—কিন্তু তার তো এখন কিছুই নেই, কেউ নেই। আসলে দাদাটা সেকেলে হয়েই যত গণ্ড-গোলে ফেলেছে। হোক না শিক্ষিত, তা বলে কি এই স্পীডের দুনিয়ার ছেলেমেয়েদের বোঝা অতই সোজা? দাদা কি এমন দেখেছে তাকে? রাস্তার মোড়ে দু-চারটে যুবতীমেয়ের সঙ্গে হাসাহাসি, কি বড়জোর স্টেশনের কাছে রেস্টুরেন্টের কেবিনে ঢোকা? এতেই এতো রাগ? আজকের দুনিয়ার কতটুক জানে ও লোকটা?

ভাবতে গিয়ে সুদর্শন কতবার আপন মনেই হেসেছে, মনে মনে দাদা বেচারাকে করুণা করেছে। তার জানা নেই যে দাদাটির পঁচিশ বছর পড়তে যখন বিয়ে হয়েছিল, তখন, সেই বিয়ের মাসকয়েক আগেই—তার আঠারো বছরের ছোট ভাইটি মেয়েমানুষের শরীর থেকে মজা পেতে শিখে গিয়েছিল। কুসুমকাকী যে কখন আঠারো বছরের সুদর্শনের হাতে বন্ধ ঘরের চাবি তুলে দিয়েছিল সে খবর দাদা পাবে কি করে?

অর্জুন গান গাইতে শুরু করল। হাতে মাইক। বাজনা বাজছে তালে তালে। প্রথমে বাংলা গান। চেনা গান। 'জেনে শুনে বিষ করেছি পান।' রবীন্দ্র-সংগীত না?

খুব যত্ন করে গাইল অর্জুন। মুখ হেলিয়ে, কোমর দুলিয়ে, আবেগ নিঙড়ে নিঙড়ে গাইল। পরের গানটা হিন্দি ছবির হিট। মাতিয়ে দিল অর্জুন। বাহাদুর বটে।

অম্বর ডেকে বলল, 'আরে কার কথা এতো ভাবছো দোস্ত?'

'ঠিক কারো কথা নয়।'

'ড্রামা পার্টিতে কি হলো ?'

'কি হবে আবার ?'

'লেড়কি ফিট্ হলো না ?'

'উঁ ?'

'চীজ কি রকম ?'

'ভাল।'

'তুলবি ?'

'এ ছিপে উঠবে না।'

'কি করে বুঝলি ?'

'আমি শ্লা মেয়েমানুষের চোখ দেখলে বুঝবো না ?'

'দিস্ ইস্ ক্যালকাটা—ম্যান।'

'হলেই বা।'

'জায়গাটা কোথায় ?'

'বালিগঞ্জ।'

'আবার দেখলে চিনতে পারবি তো ?'

'তুমি শ্লা—এতদিনে আমায় এই চিনলে।' গ্লাসের অবশিষ্ট মুখে ঢেলে সুদর্শন বলে, 'একবার মেয়ে দেখলে আমার সব মনে থাকে।'

'সব ?'

অম্বরের স্বরের ইঙ্গিতে সুদর্শন হাসে, বলে, 'ইয়েস ম্যান, —স-অ-ব।

ব্লুফক্স থেকে বেরিয়ে, অম্বরের পাশাপাশি চলতে চলতে সুদর্শন বলে, 'আমার একবার চান করা দরকার। না হলে ঘুমোতে পারব না। শরীর জ্বলে যাচ্ছে।'

'জ্বলবে না ? যা ফুয়েল হোডিং করলি—তোকে শ্লা মিসায় পোরা উচিত।'

'সে তো তুই আমায় সব সময় টেক্কা দিয়ে যাস্।'

'আমার সঙ্গে কম্‌পেয়ার কোরো না ইয়ার। বহুৎ পুরানা।'

হাঁটতে হাঁটতে দুজনে বাসস্ট্যাণ্ডে এসে দাঁড়ায়। অন্য রুটের একটা বাস এসে দাঁড়াল তাদের সামনে।

'কি ব্যাপার বল্ তো? ট্যাক্সিগুলো সব গেল কোথায়?

অম্বর ট্যাক্সির আশায় রাস্তার দিকে তাকিয়ে থাকে।

অল্পদূর থেকে একটি তরুণী এসে ওঠার পর বাসটা ছেড়ে দেয়

হঠাৎ চলন্ত বাসের দিকে তাকিয়ে সুদর্শন অস্ফুট শব্দ করে ওঠে।

'কি হলো আবার? তুই শ্লা যেখানে যা দেখবি হাত বাড়াবি।' অম্বর দূরে চলেযাওয়া বাসটার দিকে তাকিয়ে বলে।

'নারে! ওই মেয়েটা।' সুদর্শনের কণ্ঠে একটু বিস্ময় মেশানো, 'কিন্তু সে তো বাড়িতে নেমে গেল।'

'তুমি শ্লা—বিচিত্রবীর্য নাম্বার ওয়ান!' বলে অম্বর হাসতে থাকে।

'আমার ভুল হয় না।'

'এখন তো হরবকৎ ভুল হবে ইয়ার।'

'ওই বাসটাতে উঠলে পারতাম।'

'ও তো অন্য রুটের বাস। কথায় কথায় মেয়ে তুলতে গেলে যে গোড়াতেই ফাঁক হয়ে যাবি।'

'চুপ কর তো। আমি কি মেয়ে তুলছি।'

'তাহলে আবার কি?'

সুদর্শন একটু অন্যরকম গলায় বলে, 'ছুনিয়ার সব মেয়েই দেহ বেচছে নাকি?'

অম্বরও হঠাৎ কেমন যেন পাল্টা মেজাজ নিয়ে বলে, 'বেচেছে না তো কি? আমার তো শ্লা নিজের মা ছাড়া ছুনিয়ার আর সব মেয়েকে তাই মনে হয়।'

অম্বর মাঝে মধ্যে এ রকম উজবুকের মত কথা বলে। বেশির ভাগ না ভেবেই বলে। সুদর্শন বোঝে, সব মানুষেরই কোথাও না কোথাও

একটা ক্রোধ আছে, আর সেই ক্রোধের কাছে কোন যুক্তিতর্ক খাটে না।

খানিক থেমে অম্বর আবার অন্য গলায় বলে, 'তা তোর হঠাৎ হলো কি? দুসরা কি মতলব বাবা? লড়কি তো—'

অনেকটা যেন তর্কের খাতিরেই সুদর্শন বলে, 'দুসরা হতে দোষ কি?'

'মানে?'

'মানে—মানে তোকে বোঝাতে পারব না।'

'চেপে যাও গুরু। ওসব ডিভাইন লাভের গুগলি অন্য উইকেটে ছেড়ো, এখানে সুবিধে করতে পারবে না।'

ব্যাপারটা নিয়ে তার আর অম্বরের সঙ্গে তর্ক করতে ইচ্ছে করে না। আসলে, সুদর্শন তর্ক করতে পারে না। সাজিয়ে সাজিয়ে কথা বলাটা তার ঠিক আসে না। তাছাড়া, অম্বরকে এসব বলতে যাওয়ারও মানে হয় না কোন। অম্বর যে শুধু বুঝবে না তা নয়, এসব তো সুদর্শন নিজেকেও নিজে ঠিক বোঝাতে পারবে না। সত্যি কথা বলতে কি, তার কুসুমকাকী সেই যে স্বপ্নলোকের চাবি তুলে দিয়েছিল তার হাতে, তারপর থেকে, মেয়ে বলতে তো সে একটাই অর্থ বোঝে—তা হল শরীরে—দেহতত্ত্ব। আর এই শহরটাতে সে তো এসেছে সেই শরীর-খেলায় বাজিমাৎ করতে। নিজের ওপর অনেক বিশ্বাস নিয়ে, পাকা খেলোয়াড়ের জমিতে দাঁড়িয়েই সে ভেবেছে, এ খেলায় তার হার হতে পারে না—কিছুতেই পারে না।

অনেকদিন আগে, সুদর্শনের বয়স যখন আঠারো, তার কুসুমকাকী তার চোখের দিকে তাকিয়ে বলেছিল সে জয়ী হবে। হাসতে হাসতে মেয়েমানুষের সর্বস্ব লুটতে পারবে।

সুদর্শনের আঠারো বছরের শরীরটার মধ্যে থেকে কুসুমকাকী

তপ্ত পুরুষটাকে টেনে এনেছিল, সুদর্শনকে পুরুষ হওয়ার দাম শিখিয়েছিল। সেই প্রথম সুদর্শন স্পষ্ট করে জেনেছিল তার প্রসারিত কাঁধ, ছফুটের কাছাকাছি লম্বা শরীরটার মধ্যে কতখানি আগুন লুকিয়ে আছে। জেনেছিল তার শরীরের একটা আলাদা দাম আছে।

সেদিন চৈত্র মাস।

চৈত্র মাসের শেষ দিন ছিল সেটা।

চৈত্র-সংক্রান্তির সময় কালিতলায় বিরাট মেলা বসে। জায়গাটা সুদর্শনের বাড়ি থেকে মাইল কুড়ি দূরে। জনাচারেক বন্ধু মিলে তারা মেলায় গিয়েছিল সারারাত যাত্রা শুনবে বলে। ঝড়জলের জন্যে যাত্রা হলো না সে রাতে। সঙ্গের তিন বন্ধু গিয়ে উঠেছিল তাদেরই মধ্যে একজনের চেনা বাড়িতে। আর সুদর্শনের ব্যবস্থা হয়েছিল তার ওই দূর-সম্পর্কের কেমন যেন আত্মীয়া—কুসুমকাকীর কাছে থাকার।

সেই চৈত্র মাসের শেষরাতে কুসুমকাকী সমস্ত রাত সুদর্শনকে শরীরের মধ্যে গেঁথে রেখেছিল। সুদর্শনের শরীরের ওপর যেন নিজেকে ভেঙে গুঁড়িয়ে দিতে পারলে বাঁচে এমন করে মাতামাতি করেছিল। সুদর্শন সেই প্রথম মারাত্মকভাবে বুঝেছিল, তার দেহের খাঁচায় লুকিয়ে আছে এক তীব্র সুখ। সেই সুখকে মোচড় দিয়ে খাঁচার বাইরে না আনতে পারলে ভয়ঙ্কর রোষের মত, কি একটা ভেতরে ভেতরে ফুঁসতে থাকে। তখন তার রক্তের মধ্যে প্রচণ্ড বেগে কি যেন একটা দৌড়তে থাকে, হাঁপাতে থাকে।

সুদর্শন হঠাৎ বলে, 'চল্, খানিকটা হেঁটে যাই, রাত তো তেমন হয়নি।'

অম্বর কব্জি-ঘড়ির দিকে তাকিয়ে বলে, 'চল্। ফাইন হাওয়া দিচ্ছে।'

পথ চলতে চলতে, দু-এক জায়গায় বাজারী মেয়েদের পেরিয়ে যেতে হয়।

সুদর্শন মন্তব্য করে, 'খাসা মাইরী! মায়ের হাতে খাঁড়াটা ধরিয়ে দিতে বাকি শুধু।'

ঘোর কালো রঙ। ঠোঁটে লাল লিপস্টিক। হাতে গোছা গোছা কাঁচের চুড়ি। একটা নয়। পরপর অনেকগুলো মেয়ে দাঁড়িয়ে।

অম্বর আপন মনে বলে যায়, 'কোথা থেকে যে এত ভিখিরি আসে, বেশ্যা আসে, মালুম হয় না। দিনের কলকাতা এক, রাতে বিলকুল আলাদা।'

সুদর্শন জানে, এই শহরটার বুকের মধ্যে সুখের নেশা আছে। সেই সুখ, সেই মজাকে দুহাতে লুটে নেওয়ার জন্যে যে তার সর্বস্ব পান করে আসা।

সুখ চাই তার—উপছে পড়া সুখ।

সুদর্শন নিজে কখনো দারিদ্র্যের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার মধ্যে গিয়ে পড়েনি। সচ্ছলতার অভাব হয়নি কখনো তার। তবু অভাবের চেহারাটা তো সে দেখেছে। গ্রামে আর মফস্বলে অভাবের চেহারা দেখে দেখে সে ক্লান্ত হয়ে গেছে। অভাবের চেহারা তার দু-চক্ষের বিষ।

সিনেমার পর্দায়, নীল লাল হলুদ সবুজ রঙের ফিল্মে, জীবনের যে প্রাচুর্য, যে বিলাস সে দেখে—তা ভোগ করতে না পারলে বেঁচে থেকে লাভ কি? ছোট শহরে, তার প্রিয় নায়ক-নায়িকাদের ছবি দেখতে দেখতে সে তো বারবার ওই স্বপ্নলোকের কথা ভেবেছে। ওই জীবন, ওই পর্দার মধ্যেকার মানুষগুলোর মত বাড়িঘর, মদ, মেয়েমানুষ, অফুরন্ত মজা তার চাই।

॥ আট ॥

ঠিক এই ধরনের অবস্থায় কখনো পড়েনি অর্ণব। গ্রুপ থিয়েটার মানেই তার আষ্টেপৃষ্ঠে সমস্যা জড়ানো। অনেকগুলো সংস্কৃতিমনস্ক মানুষ একজায়গায় থাকবে অথচ তাদের মধ্যে কোনরকমের সংকট থাকবে না এমনটা আশা করাই তো মস্ত ভুল। বাইরের সমস্যাগুলো মোটামুটি এক ধরনের। কম বেশি তা কলকাতার সবগ্রুপ থিয়েটারেই এক। আর্থিক সংকট যা কিনা সব কিছুর মূলে তা যে কোনকালে মিটবে—অতিবড় আশাবাদীও তা ভাবতে পারে না বোধহয়। মহড়ার জায়গা, অভিনেত্রী, ঠিকমত দিনে মঞ্চ পাওয়া, খবরের কাগজের বিজ্ঞাপন দেওয়ার জন্যে সাধ্যের বাইরে খরচ—এই সবকটি ক্ষতচিহ্ন বুঝিবা গ্রুপ থিয়েটারের মরা বাঁচার লড়াই-এর স্মারকচিহ্ন। ওতো অঙ্গের ভূষণ করে নিয়েছে সবাই। ধরে নিয়েছে এগুলো চিরকালই ছিল, আজও আছে। ভবিষ্যতেও থাকবে। এগুলো নিয়েই অ-ব্যবসায়িক নাট্যগোষ্ঠীগুলোর বেঁচে থাকা। এ সবের আঘাতে গোষ্ঠী মাঝে মাঝে খুব বেকায়দায় পড়ে যায় ঠিক, কিন্তু ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে যায় না। বরং এর তলায় তলায় কোথায যেন মরিয়া হয়ে ওঠার আগুন পেয়ে যায়।

গোষ্ঠী ভাঙে তার ভেতরের ধ্বসে। প্রখর অনুভূতিসম্পন্ন, বড় বেশি অভিমানী এই মানুষগুলোর ভেতরের তারগুলো যে একটুতেই খুব বেশি বেজে ওঠে। বাজা স্বাভাবিক। শুধু ভালবেসে পরিশ্রম, শুধু আমি কিছু একটা গড়ছি এই তৃপ্তিতে অনেককিছু ছেড়ে আসা, এছাড়া আর কি লাভ আছে এখানে? শুধু নাটককে ভালবাসার টানেই তো দিনের পর দিন আসে সবাই? নরম মাটিতে যেমন খুদে পাখির নখের দাগও স্পষ্ট হয়ে ওঠে—এখানকার মানুষাদের আত্মপ্রকাশের সামান্য-তম এদিক-ওদিক হওয়াও রীতিমত নাড়া খেয়ে যায়। একটুতেই,

বেশির ভাগ সময় অন্যজনের অজান্তেই হয়তো ক্ষুণ্ণ হয় একজন। ঈর্ষা তো সৃষ্টিমানদের আত্মজা। একজনকে পালন করতে অন্যজন স্বভাবতই প্রশ্রয় পায়। খুব সাধারণ একজন সদস্য হিসেবে কয়েকবছর আগে যে ছেলেটি বা মেয়েটি দলে এসেছিল, তিলে তিলে যাকে সমস্ত শক্তি ঢেলে শিল্পিতে রূপান্তরিত করার চেষ্টা চলল, অনেককিছু ক্ষতি স্বীকার করে, পারিবারিক অনেক ধিক্কার ভর্ৎসনা সয়ে, যে সাধনা চালিয়ে, উপযুক্ত করে তুলল নিজেকে—আজ সে তো আর সেই আগের দিনের সাধারণ মানুষটি নেই। আজ তার সঙ্গে আছে তার যশ। আর যশ যে একজন মানুষকে একটু আলাদা করবেই -এটাকে অস্বীকার করার চেয়ে আর বড় মূর্খামি কি হতে পারে? কিন্তু তার এই আলাদা হতে চাওয়াটা দলের অন্যান্য সদস্যদের মনে ভিন্ন প্রতিক্রিয়া আনে। তারা ভাবে দলের কাছ থেকে সুযোগ সুবিধে পেয়েছে বলেই না আজ ও অত খ্যাতি হচ্ছে। তারা ভাবে, তাহলে আমরা কেন পাব না ওই ধরনের সুযোগ সুবিধে। তাহলে কি দলের মাথায় যাঁরা আছেন তাঁরা তাদের প্রতি যথেষ্ট মনোযোগ দিচ্ছেন না? নিশ্চয়ই তাই।

এই ভাবে তাদের মন ভাঙতে থাকে। দল ভাঙতে থাকে। একবার নয়, এমন পরিস্থিতির মধ্যে অর্ণব বার বার পড়েছে, আবার উৎরেও এসেছে। কখনো কখনো দমে গেছে খুব। ভেবেছে, কি হবে এই ভূতের বোঝা বয়ে? কেন দিনের পর দিন রাতের পর রাত এই বেগার খেটে মরা? এর চেয়ে একা একা নিজের পড়াশোনার জগৎটার মধ্যে একেবারে ডুবে থাকা ভাল। তনয়াও বোধহয় স্বস্তি পেত তাতে। অর্ণব বোঝে তনয়ার মনের একটা দিক যেমন চায় 'অন্বীক্ষা' বড় হয়ে উঠুক। প্রযোজনার নাম হোক, দলের ছেলেমেয়েদের খ্যাতি ছড়িয়ে পড়ুক চারদিকে, তেমনি কি আর একটা মনে চায় না—অর্ণব আর একটু সংসারের ভবিষ্যতের কথা ভাবুক, বিয়ের আগে যে জগতের মধ্যে যেমন করে প্রাণমন সঁপে ছিল, সে জগতের দায় ধীরে ধীরে নামিয়ে ফেলুক এবার?

তনয়া তো গ্রুপের প্রতিটি খবর রাখে। বিশেষ করে কারো সঙ্গে কারো বোঝাপড়ার অভাব হলে, সামান্য মর্যাদার লড়াইয়ের ইঙ্গিত থাকলে—অর্ণবের চেয়েও তনয়া ভাল বোঝে তা। হয়তো মেয়েদের স্বাভাবিক ক্ষমতাতেই বোঝে। অর্ণব বরং চায় তনয়া এসব কম জানুক। কেননা, দলের মধ্যে কোথাও যদি কারো সঙ্গে কারো চোরা মনোমালিন্য থেকে থাকে তবে তাকে বড় করে দেখার কোন মানে হয় না। সেটার চেয়ে মিলে মিশে থাকাটাকেই বড় করে দেখা উচিত। সেটাই বড় সত্য। 'অন্বীক্ষা'র সবাই—এক পরিবারের সদস্য। সুখে দুঃখে, বিবাহে শ্মশানে সব সময় তারা একে অপরের পাশে আছে—এই ভাবটাই তো সবকিছুকে ছাপিয়ে ওঠে। ওঠে বলেই 'অন্বীক্ষা' এতকাল টিকে আছে, ভবিষ্যতেও টিকে থাকবে।

কিন্তু সেসব সমস্যার সঙ্গে আজকের এই সমস্যার কোন মিল নেই। আজকের মতো অবস্থায় কোনদিন তাকে পড়তে হয়নি। ডক্টর পালিতও হয়তো খুব বিশদ করে সবকিছু তাকে বলেননি। কিন্তু যতটুকু বলেছেন—যে কোন বুদ্ধিমান লোকের পক্ষে ওর থেকেই বুঝে নেওয়া সহজ। শুভাকে এ নিয়ে কিছু বলবেন না তিনি। না—বলতে চেয়ে ভালই করেছেন। অর্ণবের জানা দরকার—তাই জানিয়েছেন। আর কারো জানা ঠিক নয়। অর্ণব নিজেই বারণ করে এসেছে ডক্টর পালিতকে—উজ্জ্বল যেন না জানে। এমনকি তনয়াকেও বলা চলবে না। যদিও এর মধ্যেও বার কয়েক শুভার অসুখের প্রসঙ্গে কথা তুলেছে তনয়া, অর্ণব প্রতিবারই অন্যকথায় এড়িয়ে গেছে। শুভার অসুখকে গুরুত্ব দেয়নি। শুধু বলেছে—এরপর থেকে ওকে অফিস ক্লাবের নাটক কমাতে হয়। মুখে বলেছে তাই ; আর মনে ভেবেছে—অসম্ভব। অফিস ক্লাবের ডাক কমিয়ে দিলে—শুভাকে সুনিশ্চিত—সর্বনাশের পথে ঠেলে দেওয়া হবে। অবশ্য তার জানা নেই এই সর্বনাশের শুরু হয়েছে কবে থেকে। শুভার জন্যে দুঃখ অনুভব করে অর্ণব।

এখন, সিগারেট ধরিয়ে অধ্যাপকদের ঘরের একটা চেয়ারে বসে চুপচাপ ভেবে যাচ্ছিল অর্ণব। সামনে একটা বই খোলা। বইটা পড়তে পড়তে অনেকক্ষণ আগে মুখ তুলে জানলা দিয়ে বাইরে তাকিয়েছে সে। তারপর বইয়ে আর মুখ ফেরানো হয়নি। পরের ঘণ্টা পড়ার সময়ও এগিয়ে এলো। পাসের ক্লাস আছে একটা। এটা হয়ে গেলে আজকের মত হয়ে গেল। অল্প একটু দূরে, জিমি কার্টারের পলিসি নিয়ে সোচ্চার আলোচনা করে যাচ্ছেন দুই অধ্যাপক। অর্ণব বেয়ারাকে ডেকে এক গ্লাস জল চাইল। বেয়ারা জল নিয়ে আসার আগেই অধ্যাপক চক্রবর্তী বললেন, 'অর্ণববাবু আপনার ফোন এসেছে।'

'আমার'—বলে খোলা বইটা বন্ধ করে অর্ণব উঠে গেল। প্রায় শেষ হয়ে আসা সিগারেটটা ফেলে দিয়ে ফোনের রিসিভার ধরল।

'হ্যালো! অর্ণব মিত্র বলছি।'

'অর্ণবদা, আমি নীরা, লেকগার্ডেনস থেকে বলছি।'

'নীরা? কবে এলে কলকাতায়?'

'এই তো কাল এলাম সবে।'

'কদিন থাকছ?'

'দিন সাতেক। তনয়াদি কেমন আছেন?'

'ওর শরীরটা কদিন ভাল যাচ্ছে না।'

'কি হয়েছে?'

'তেমন কিছু নয়, ওই সীজন্‌চেঞ্জের এফেক্ট আর কি।'

'হ্যাঁ—অনেকেরই দেখছি তাই। এ বাড়িতেও তো। শুনুন, কাল সন্ধ্যের দিকে যাবো আপনার বাড়ি।'

'কাল। খুব ভাল। এসো। তোমাদের দিদিতো থাকছেই। আমিও থাকবো। একা এসেছো? মিস্টার দত্ত আসেননি।'

'না। ওকে অফিসের কাজে বম্বে যেতে হলো। আমি তাই কদিন চলে এলাম। 'অন্বীক্ষা'র খবর কি?'

'এখনো পর্যন্ত ভাল। তবে রিহার্সল রুম নিয়ে সমস্যায় পড়তে হবে। ওই বাড়িটা তো ভাঙা হবে শীঘ্রি।'

'এই এক সমস্যা।' অল্প থেমে নীরা আবার বলে, 'শুভা তো এখন খুব ভাল অভিনয় করছে। মাস কয়েক আগে কাগজে একদিন ওর খুব প্রশংসা দেখলাম। এর মধ্যে আমাদের কোন 'শো' নেই?'

'না, এর মধ্যে তো শো নেই কোন। তুমি রিহার্সালে এসো না একদিন।'

'ঠিক আছে। কাল সন্ধ্যেবেলা যাচ্ছি আপনার বাড়ি। রাখছি, কেমন?

'ঠিক আছে।' অর্ণব রিসিভার রেখে দেয়।

বেয়ারা জল এনেছে। বেয়ারার হাত থেকে জলের গ্লাসটা নিয়ে নেয়।

এই নীরা চলে যাবার পর শুভা এসেছিল 'অন্বীক্ষা'য়। দুর্গাপুর এজোন কমিউনিটি সেণ্টার মঞ্চে অভিনয় ছিল দলেব। আমন্ত্রিত অভিনয়। টাকা পয়সা নেওয়া হয়ে গেছে। বিজ্ঞপ্তিও দেওয়া হয়েছে খুব। অভিনয়ের তখন দিনদশেক বাকি। নীরার বিয়ের দিন ঠিক হয়ে গেল। অভিনয়ের তারিখের দুদিন পর নীরার বিয়ের তারিখ। তেমন চেষ্টা করলে অভিনয় মিটিয়ে এসে পরের পরের দিন বিয়ের পিঁড়িতে বসা খুব একটা অসুবিধের ব্যাপার ছিল না নীরার পক্ষে। কিন্তু অর্ণব সেটা ঠিক বলে মনে করেনি।

'কি করবো তাহলে অর্ণবদা? এতো ভাল একটা কল্ শো ক্যানসেল করে দেবো? আমাদের কিন্তু খুব বদনাম হয়ে যাবে।' উজ্জ্বল খুব উদ্গ্রীব হয়ে তাকিয়ে ছিল অর্ণবের দিকে।

'আমি তো কিছু ভেবে পাচ্ছি না। সাবস্টিটিউট কেউ নেই। রোলটা শক্ত। যাকে তাকে দিয়ে হবে না।'

'ভাল অভিনেত্রী পেলেও এই কদিনে তো আর তাকে তৈরী

করা যাবে না।' শক্তি মন্তব্য করেছিল।

অর্ণব বলেছিল, 'যাবে না বলব না। তেমন শিল্পী পেলে প্রাণপণ চেষ্টা করে দেখতাম অন্তত।'

তনয়া চেষ্টা করলে ওই ভূমিকায় নামতে পারতো, কিন্তু তনয়াকে উজ্জ্বলের পাশে মানানো মুশকিল, মেকআপ যতই থাক—নীরার জায়গায় তনয়া যতই ভাল অভিনয় করুক—প্রযোজনা জমানো যাবে না।

হঠাৎ শক্তির এক বন্ধু—যে মোটেই নাটকের ছেলে নয়, সে এনে দিল শুভার খবর। শুনে উজ্জ্বল নিজে গিয়ে দেখা করল শুভার সঙ্গে।

শুভার বাড়িতে নয়। শক্তির বন্ধু উজ্জ্বলের সঙ্গে শুভার যোগা-যোগ করিয়ে দিল এক রেস্টুরেণ্টে। সেখানেই প্রথম কথা হলো। প্রতি শোর জন্যে কতটাকা দিতে হবে শুভাকে সেটাও মোটামুটি ঠিক হলো রেস্টুরেণ্টে বসেই। পরের দিন শুভা এসেছিল মহড়ায়।

'অন্বীক্ষা'য় এর আগে পর্যন্ত যে সব অভিনেত্রী এসেছে—তারা সবাই চেনাজানার মধ্যে। অর্ণবের ছাত্রী কিংবা গ্রুপেরই কোন ছেলের আত্মীয়া অথবা বান্ধবী। স্ত্রী-ভূমিকার জন্যে আলাদা করে কোন খরচ ছিল না দলের। তাই টাকা দিয়ে বাইরের থেকে অভিনেত্রী আনার জন্যে প্রস্তুত ছিল না কেউ। কিন্তু দলের প্রয়োজনেই এতকালের নিয়মটার ব্যতিক্রম করা হলো।

প্রথমদিন মহড়া দেখে অর্ণব বলল,—'এ পারবে। মেয়েটার ক্ষমতা আছে। গড়ে নিতে পারলে ভাল অভিনেত্রী হবে একদিন।'

প্রথম সেদিন—গোষ্ঠীর সবাই শুভাকে খুব সহজভাবে নিতে পারেনি। সাধারণতঃ অফিস ক্লাবে বা অন্যত্র, কলকাতায় কিংবা মফস্বলে যে সব মেয়ে অভিনয় করে বেড়ায়—শুভার কথা শোনার পর সবাই তাকে সেই গোত্রের বলেই ধরে নিয়ে ছিল।

তনয়ারও কোথায় যেন আপত্তি ছিল মৃদু।

'না হয় ক্যানসেলই হল কল শোটা—গ্রুপের মধ্যে হঠাৎ প্রফেসনাল মেয়ে আনা কি ঠিক হবে?' সংশয় জড়ানো গলায় বলেছিল তনয়া।

'এই অভিনয়টা না হয় বাতিল করলাম। কিন্তু তারপরেও যে আমরা করতে পারবো এ নাটকটা—তার আশাই বা তুমি পাচ্ছ কি করে? আমাদের মধ্যে থেকে নন-প্রফেসনাল কাউকে পাই যদি তখন ওকে বাদ দিয়ে দিলেই হবে। আর তা যদি না করি—তবে ধরেই নিতে হবে—এ নাটকটা ভবিষ্যতে আর হচ্ছে না।'

তনয়া আর কিছু বলেনি। অর্ণব বলেছিল, 'আগে নিজের চোখে দেখা তো যাক মেয়েটাকে।'

চোখে দেখার পর শুভা সম্পর্কে তনয়ার মত বদল হতে শুরু করল। শুভার শান্ত ভাব। সবার মধ্যে খুব সহজ হয়ে মিশে যাওয়ার আশ্চর্য ক্ষমতা কয়েকটা দিনের মধ্যে ওকে 'অন্বীক্ষা'র একজন করে তুলল।

প্রতিদিনই ক্রমশ ভাল অভিনয় তুলতে থাকায় আরো চোখে পড়ল সকলের। তবুও দলের সবাই ভাবতে পারেনি দুর্গাপুরে শুভা এত ভাল অভিনয় করবে। নাটকের শেষ সংলাপটা ছিল শুভার মুখে। দীর্ঘ সংলাপ। অর্ণবের এখনো পরিস্কার মনে পড়ে সংলাপের শেষে—পরদা পড়ছে যখন—সমস্ত প্রেক্ষাগৃহ জুড়ে কি উত্তাল অভিনন্দন।

শোর পরে উজ্জ্বল যখন কথামত টাকা দিতে গেল শুভাকে, শুভা নিল না। ফেরত দিল।

'কি হলো শুভা?' অর্ণব জানতে চেয়েছিল।

'অর্ণবদা, 'অন্বীক্ষা'র কাছ থেকে আমি টাকা নেব না। আপনি বরং আমায় কিছু অফিস ক্লাবের শোর যোগাযোগ করিয়ে দেবেন—তাহলে আমার অসুবিধে হবে না। এখানে এখন সবাই আমার নিজেদের লোকের মত হয়ে গেছে। কেউই যখন টাকা নেয় ন

আগেও কেউ নেয়নি—হঠাৎ আমি এসে নেব—এটা আমার ভাল লাগছে না।'

'কিন্তু এই শোটার জন্যে তো তোমার জন্যে টাকা আলাদা করেই রেখেছে গ্রুপ।'

'বেশ তো—আমার টাকাটা নাহয় ক্লাব ফাণ্ডে ডোনেট করলাম আমি—তা পারি তো?'

'পারো—নিশ্চয়ই পারো' উজ্জ্বল হাসতে হাসতে বলেছিল, 'আমাদের ফাণ্ডের যা অবস্থা।'

এরপর থেকে শুভা 'অন্বীক্ষা'র হয়ে গেল।

শুভাকে দলে পাওয়ার পর অনেকটা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলেছিল অর্ণব। খুশি হয়ে ছিল সবাই। বিশেষ করে তনয়া। তারপর নতুন পুরনো—পরপর অনেকগুলো নাটকের চরিত্রে শুভা তৈরী হলো। শুভাকে বাদ দিয়ে আজ 'অন্বীক্ষা'র কথা ভাবা যায় না।

রোলকলের খাতাটা হাতে নিয়ে ক্লাসরুমের দিকে এগোতে এগোতে ভাবে অর্ণব, এ কিসের ইঙ্গিত পাচ্ছে সে। শুভা ভেতরে ভেতরে এমন একটা অসুখ চেপে রেখেছে এতদিন—ওর মুখের দিকে তাকিয়ে তো একবারও মনে হয়নি। মানুষের দুঃখ সুখের কত সামান্য হিসেব পাওয়া যায় তার বাইরেটায়। বিশেষ করে যে মানুষের রক্তে আছে অভিনয়।

নয়

অসহ্য গুমোটে কেটেছে সমস্ত দিনটা। কলকাতার মাথার ওপরের আকাশটার দিকে তাকালে মনে হয় না ওখানে কখনো মেঘের আভাস পাওয়া যেতে পারে। একে চড়া রোদ, তার ওপর বাতাস বইছে না মোটে। সারাদিন ঘরের মধ্যে থাকতেও অসহ্য লাগে। বাইরে বেরনো মানে কোন সিনেমা হাউসে গিয়ে ঢোকা। সুদর্শন চুপচাপ শুয়ে কাটাল দুপুরটা। একা একা চুপচাপ থাকলেই উত্তর বাংলার শহরটা, তার মানুষজন চিন্তার মধ্যে জড়াতে থাকে। না চাইলেও খানিকটা বিব্রত করে সুদর্শনকে।

রোদ পড়ে যাওয়ার পর বিকেলটা বেশ আরামের। বিকেল শেষে বাতাস বইতে থাকে। দক্ষিণের সমুদ্রের বাতাস, ভারি ভাল লাগে তার।

সন্ধ্যে হলে আবার পার্ক স্ট্রীট।

অম্বর ওখানেই আসবে। কখন আসবে ঠিক নেই। তবু আর কোথাও যেতে ইচ্ছে করে না সুদর্শনের। আর কোথাও তেমন টানে না তাকে। অর্ণবদার নাটকের লোকজন মোটেই তার মেজাজের মানুষ নয়। ওদের মধ্যে মজার একটা খ্যাপামি আছে ঠিকই—কিন্তু সুদর্শন তার থেকে তো ছিটেফোঁটাও মজা পায় না।

ট্রাম থেকে নেমে, নির্ভার মন নিয়ে হাঁটতে হাঁটতে এগোয় সুদর্শন। পার্ক হোটেলের সামনেটা দিয়ে যাওয়ার সময় কালকের সেই যুবকটির সঙ্গে দেখা হয়ে যায়।

সময়টা একই আছে। যুবকটির সাজপোশাকে কোথাও হেরফের নেই গত কালকের থেকে। হাতে সেই কালো ফ্ল্যাপ।

সুদর্শন আজ প্রথমেই বলে, 'আমার নাম সুদর্শন সান্যাল, আপনার নামটা কিন্তু জানা হয়নি।'

'সিন্ধু। পুরোটা হলো করুণাসিন্ধু গাঙ্গুলী।'

'কোথায় আছেন? মানে—' সুদর্শন সিগারেট বাড়িয়ে দেয়, 'সার্ভিস?'

সিন্ধু হাসল।

'সার্ভিসে নেই!' সুদর্শন যেন একটু অবাক হলো। তারই মত আপাতত বেকার তাহলে। দেখে মনে হয় না।

'একেবারে নেই বলা যায় না। না থাকলে আমাদের মত মানুষদের চলবে কি করে? একটা হোটেলে আপাততঃ রিসেপশনিস্ট গোছের'—কথাটা খানিকটা অসমাপ্ত রাখে সিন্ধু।

'কোন্ হোটেলে?' জিজ্ঞাসা করতে গিয়েও সুদর্শন থেমে যায়। মনে পড়ে যায় অম্বরের মন্তব্য, হি ইস এ ফিসি ক্যারেকটার। সুদর্শন অন্য কথা বলে, 'বেশ মজার চাকরী তাহলে?'

মজার কতখানি জানি না। করি—এই পর্যন্ত। আপনি কোথায় আছেন?'

'আমি কলকাতায় এসেছি বিজনেসের ব্যাপারে। একটা মিনিবাস বার করার পসিবিলিটি আছে।'

'আচ্ছা!' বলে সিন্ধু অন্য কথায় আসে, 'হ্যাট সর্দারজী, কাল যাকে দেখলাম?'

'ও আমার অনেকদিনের বন্ধু। ওরাও আগে শিলিগুড়িতে ছিল। আপনি ওকে চেনেন বোধহয়?'

'মুখ চেনা আছে। এখানে অনেকেই অনেককে চেনে। চেনে ওপরে ওপরে। জানে না কেউ কাউকে।'

সিন্ধুর কথাবার্তা বলার ধরনটা অন্যরকমের। ওর ছিমছাম মার্জিত চেহারার সঙ্গে একসুরে বাঁধা। চোখে মুখে যেন একটা অন্য জগতের ছাপ আছে যা এই পার্ক স্ট্রীটের জগতের সঙ্গে মেলে না।

'আজও কি আপনার ওই বন্ধুর আসার কথা?' সিন্ধু প্রশ্ন করে।

'হ্যাঁ, সেরকমই কথা আছে। চলুন ভেতরে গিয়ে বসি একটু। আপনার হাতে সময় হবে তো খানিকটা ?'

'তা হবে, কিন্তু আপনার বন্ধু ?'

'ও ঠিক আমাদের খুঁজে নেবে। ও এসে একবার ভেতরটা না দেখে তো ফিরে যাবে না। চলুন।'

'যাচ্ছি। কিন্তু আমি শুধু আপনাকে 'স্ল করার সঙ্গই দিতে পারবো। এখান থেকে আমায় ডিউটিতে যেতে হবে তো।'

'তাতে কি ?'

'আমি একবার শুরু করলে চট্ করে থামাতে পারি না। বুঝছেন তো—নিজে মাত্রা চড়ালে তারপর মাতালদের নিয়ে কাজ করা কত মুশকিল। হোটেলের নাইট ডিউটি তো।' সিন্ধু হাসে।

'কোন হোটেলে ?' ইচ্ছে না থাকলেও আচমকা কথাটা সুদর্শনের মুখ থেকে বেরিয়ে যায়।

সিন্ধু আবার হাসে। বলে, 'ওটা একটু রহস্য থাক পরে বলবো।' দু পা এগিয়ে আবার বলে, 'এ ফিসি ম্যাটার, মাই ফ্রেণ্ড।'

সিন্ধুর এই কথা গোপন করার ভঙ্গিমাটা এমন অকপট, এত আন্তরিকতার স্বরে বলা যে উত্তরটা তার খারাপ না লেগে বরং আরো ভাল লাগে—বেশ বন্ধু বন্ধু মনে হয়।

টেবিলে মুখোমুখি বসার পর, আবার নতুন করে সিগারেট জ্বলে। একটা প্যাকেট থেকে সিগারেট বেরিয়ে, দুজনের মুখে এসে থামার পর, ফস্ করে শব্দ হয় কাঠি জ্বালানোর। তামাকের ধোঁয়া ওড়ে এক টেবিল দূরত্বে। ওয়েটার ট্রে থেকে পানীয় নামিয়ে দিয়ে যায়। ওরা পরস্পরের দিকে তাকায়। চীয়ার্স করে।

অল্প সময় কথা বলার পর, সুদর্শন একসময় বলে, 'ভালই হলো এ পাড়ায় একজন ফ্রেণ্ড পেয়ে।'

সিন্ধু নিঃশব্দে হাসল, তারপর বলল, 'একটা বয়সের পর মানুষের বোধহয় আর নতুন করে কিছু পাওয়ার থাকে না। সে বয়সটার পর

থেকে সবকিছু শুধু হারায়। স্নেহ, বন্ধুত্ব, ভালবাসা সব। আমার বোধহয় এখন সেই বয়সটা।' খুব ধীরে ধীরে কথাগুলো বলতে বলতে গ্লাসে ঠোঁট নামায়।

সুদর্শন গ্লাস থেকে মুখ তুলে সিন্ধুর দিকে তাকায়। এক মুহূর্ত স্থির থেকে সিন্ধুর কথাটা উপলব্ধি করে, তারপর হেসে বলে, সকলেই কি হারায়? কেউ কেউ আবার নতুন করে পেতেও তো পারে; পারে না?'

'তেমন ভাগ্যবান লাখে না মেলে এক। অন্তত আমার তো তাই মনে হয়।' সিন্ধুর বাংলা উচ্চারণ খুব স্পষ্ট; স্বরে খানিকটা ভরাট জোয়ারি খেলে।

'বিয়ে হয়েছে?' সুদর্শন প্রশ্ন করে।

সিন্ধু রসিকতার গলায় বলে, 'একটা পাত্রী হলেই হয়ে যায়।'

'প্রেমট্রেম?' সুদর্শনের গলায় খানিকটা ঘনিষ্ঠ বন্ধুত্বের উত্তাপ বেজে ওঠে।

'খুচরো দু-একটা হয়নি তা নয়, খুব মাইনর কেস।' বলে সিন্ধু পুরানো বন্ধুর মত জানতে চায়। 'তোমার?

'না।'

'সে কি! এরকম একটা ফিল্ম হীরোর মত ফিগার—।'

'ভাই ফ্র্যাঙ্ক কথা বলি। প্রেমট্রেম নিয়ে কপচানি আমার ধাতে নেই। আমি ধর তক্তা মার পেরেক র‍্যাঙ্কের ছেলে, মেয়েমানুষ ধারে কাছে এলে, গুরু, একরকম বই দুরকম চিন্তা করতে পারি না।'

'সে তো আমি তোমার চোখ দেখেই বুঝতে পেরেছি।' সুদর্শনের চোখের দিকে তাকিয়ে বলে সিন্ধু।

'সিন্ধুর কথায় সুদর্শন চমকে হেসে উঠে বলে, 'মানে?'

'গর্ব করছি না, ও আমার এক ধরনের ক্ষমতা তৈরী হয়ে গেছে। ছেলে কিংবা মেয়ে—শুধু চোখের দিকে তাকিয়েই বলে দিতে পারি—তার সেক্সলাইফ কেমন। এক সময় তো আমার

খুব নাম ছড়িয়েছিল—দারুণ হাত দেখতে পারি বলে। এখন আর দেখি না।'

'একেবারেই ছাখো না? অন্তত আর একবার—'

'তোমার হাত দেখার কথা বলছো তো? তোমার ভাগ্যের কথা আমি তো তোমার মুখ দেখেই বলে দিতে পারি। হ্যাঁ, এখন ফেসরিডিং পাওয়ারটা আমার বেশ শক্তিশালী হয়ে উঠেছে। অবিশ্যি জানি না, কতকাল এটা থাকবে।'

'কতকাল থাকবে মানে?'

'এসব ক্ষমতা তো সকলের চিরকাল থাকে না। যে এসব বিচার করে তার নিজের বিচার করার ক্ষমতাও নানা প্ল্যানেটের যোগা-যোগের ওপর নির্ভর করে কিনা।'

'সে যাই হোক। আমার ব্যাপারটা বলো তো—'

'কি বলবো?'

'যা বলেছিলে—মেয়েদের ব্যাপারে আমার সাকসেস—'

'সে তো তোমার চেহারার দিকে তাকিয়েই বোঝা যায়। তোমার হাবভাবের মধ্যে একটা টম জোন্স গোছের ব্যাপার আছে তো।'

সুদর্শন টম জোন্স প্রসঙ্গ বোঝে না। প্রসঙ্গ এড়িয়ে গিয়ে বলে, 'তার মানে বলছ—জয় আমার সুনিশ্চিত?'

'সুনিশ্চিত।'

খানিকক্ষণ থেমে, সিগারেটের একরাশ ধোঁয়া ছেড়ে সুদর্শন আবার বলে, 'এবার তোমার ব্যাপারটা ঠিকঠাক বল তো?' প্রশ্নটা করার পর সুদর্শনের নিজেরই অবাক লাগে বেশ—এত অল্প সময়ের মধ্যে এদের দুজনের আলোচনা এমন ব্যক্তিগত ব্যাপারে, কেমন অনায়াসে চলে এলো দেখে। অম্বরের সঙ্গেও সে ব্যক্তিগত সবকিছু নিয়েই আলোচনা করে, কিন্তু তবুও কোথায় যেন একটা দূরত্ব থেকে যায়।

'বললাম তো।' বলে সিন্ধু হাসল আবার।

'কোথায় বললে? কলকাতায় এত স্কোপ—এখানে তো মেঘ না চাইতেই জল পাওয়া যায়।'

'খুব ভুল ধারণা।' সিন্ধু সিগারেটের ধোঁয়া ছাড়ে।

'ভুল! ভুল কেন? রাস্তায় রাস্তায় মেয়ে কিলবিল করছে এখানে।'

'মেয়ে নয়, মেয়েমানুষ বলো।' অল্প থেমে সিন্ধু কেমন যেন আনমনা হয়ে বলে, একদিক থেকে তোমার কথাটা মিথ্যে নয়। এক এক সময় মনে হয় গোটা শহরটাই একটা প্রেস কোয়ার্টার্স হয়ে যাচ্ছে।

'আরে ঠিক এই কথাটাই তো আমি ভাবছিলাম—'

সুদর্শনের কথায় সিন্ধু একবার তার মুখের দিকে তাকায়। তারপর চোখ যায় পাশের টেবিলে।

পাশের টেবিলের দুটি তরুণ তখন দরজার কাছে কোন একজনকে দেখে সেদিকে যাওয়ার জন্যে উঠে দাঁড়িয়েছে টেবিল ছেড়ে। সুদর্শন তাদের চোখকে অনুসরণ করে ছাখে, দরজার কাছটাতে সেই ভদ্রলোক —ক্যাপ্টেন মালহোত্রা দাঁড়িয়ে।

সুদর্শন আর সিন্ধু পরস্পরের দিকে তাকায় আর একবার। সিন্ধু পুরনো কথার জের টেনে বলে, 'তবু দিস ইজ এ ফ্যান্‌টাসটিক সিটি। এ রিয়েল ওয়াণ্ডার!'

বেয়ারা এসে সুদর্শনের গ্লাস ভরে দিয়ে যায়। সিন্ধু মুখে বলেছিল একবার শুরু করলে সে আর নিজেকে থামাতে পারে না। কিন্তু লক্ষ্য করা গেল, সেদিক থেকে খুব সহজেই নিজেকে রুখতে পারে ছেলেটা। প্রথমবার সুদর্শনের বাড়তি অনুরোধ সে রেখেছে, দ্বিতীয়বার নিজের থেকে নিষেধ করেছে বেয়ারাকে।

সিগারেটের ধোঁয়া ছেড়ে সিন্ধু বলে চলে, 'আমাদের চারপাশে যে কলকাতা—তাতে আসল কলকাতার চেহারা কতটুকু দেখতে পাই। কত পারসেণ্ট? কলকাতা কি এর ওপরে বেঁচে থাকতে পারে?'

এখন সিন্ধুর কথা বলার ধরনটা আরো যেন অন্যরকম মনে হয়।

অর্ণবদার মত নয়, কিন্তু অনেকটা যেন সেই দিকেই যেতে চাওয়া। ঠিক কি বলতে চাইছে সিন্ধু—তা সুদর্শন ধরতে পারে না।

সে চোখ ফিরিয়ে দেখল, তাদের পাশের টেবিলের সেই অল্পবয়স্ক ছেলে ছুটি ক্যাপ্টেন মালহোত্রার সঙ্গে বেরিয়ে গেল। ওরা চলে যাওয়ার পর, দরজার থেকে চোখ ফিরিয়ে সে সিন্ধুকে হঠাৎ প্রশ্ন করল, 'তুমি কতদূর পড়াশোনা করেছ?'

মাঝে মধ্যে সুদর্শনের ছু-একটা কথা, বিশেষ করে কথাটা বলার ধরনে বোঝা যায় চেহারায় চালচলনে সে যত সহজেই 'পস্' হয়ে উঠতে পারে—বলনে তেমন পারে না। আজ আর, আগেকার মত মফঃস্বল আর কলকাতার চরিত্রকে এক নজরে আলাদা করা যায় না। যায় না তার কারণ, আগেকার দিনের মত কলকাতাতো এখন শুধু আর কলকাতার মধ্যে আটকে নেই—সে ছড়িয়ে গেছে সারা দেশে। মফঃস্বলের যে কোন ছেলে এই ভিড়ের মধ্যে এসে পড়ে—অতি সহজেই কলকাতার নিজস্ব চরিত্রে একাকার হয়ে যেতে পারে। সুদর্শনও তাই। তবু খুব ভাল করে লক্ষ্য করলে, ওর একটা ছুটো কথা ধরিয়ে দেয় বইকি—এ শহরের পালিশটা ঠিক মত পেতে এখনো তার বাকি আছে।

'হঠাৎ এ প্রশ্ন কেন?' সুদর্শনের প্রশ্নে সিন্ধু খানিকটা অবাক হয়ে বলে, 'সাত বছর আগে বি. এ. পাস করেছি।'

'না, এমনি। গো অন। কি যেন বলছিলে—'

'বোর ফিল করছো? তোমার বন্ধু তো এখনো এলো না?'

'না, না। তুমি না থাকলেই আরো বোর হতাম। ছাখো, আমি ভাই তোমায় সাফ কথা বলছি—আমি কলকাতায় এসেছি মজা লুটতে। সুখ চাই আমার। যেমন করে পারি আমার যা চাই তা আমি লুটে নেবোই।'

সিন্ধু হেসে বলে, 'চাইলে আমি তোমায় সাহায্য করতে পারি।'

'তোমার নিজেরই তো বলছো—'

'তাতে কি? একা থাকা আমার অভ্যেস হয়ে গেছে। জানো তো, এক জাতের মানুষ আছে—নিঃসঙ্গতাই যাদের একমাত্র সঙ্গ। আমি তাদের দলে।'

'কলকাতার কিছু লোক খুব ভাল কথা বলতে পারে। আমি তো কিছুতেই তোমাদের মতো গুছিয়ে বলতে পারি না।'

সিন্ধু এবার মৃদু শব্দ করে হাসে, বলে, 'কথা না বলতে পারলে আমার পেট চালানো দায় হতো ভাই।' বলেই সিন্ধু তার হাতঘড়ির দিকে তাকায়। সিন্ধুর ঘড়ি দেখা লক্ষ্য করে সুদর্শন বলে, 'দেরি করিয়ে দিলাম।'

'সবাই যখন রেস্ট নেয়, তখন কাজে ছুটতে হয় আমায়।'

'তার মানে সকলে যখন কাজে ছুটছে—তোমার তখন রেস্ট।'

'আমার রেস্ট নেই। ছুটছি শুধু ছুটছি।'

'কেন?'

'আজ উঠি। পরে একদিন বলবো কেমন।'

সিন্ধুকে উঠতে দেখে দূরের একটা টেবিল থেকে অল্প মোটা গোছের একটা মেয়ে হাত নাড়ল।

উঠে দাঁড়িয়ে সিন্ধুও হাত নাড়ে মেয়েটির উদ্দেশ্যে। টেবিল ছেড়ে যাওয়ার আগে পাশের চেয়ারে রাখা তার কালো চামড়ার স্ল্যাপটা তুলে নেয়।

সুদর্শন তাকায় সেটার দিকে। বলে, 'এটা সব সময় তোমার সঙ্গে থাকে?'

'সব সময় নয়। শুধু কাজের সময়। মানে সন্ধ্যের পর। চলি।' নিঃশব্দে হেসে চলে যায় সিন্ধু।

দরজা পেরিয়ে সিন্ধু রাস্তায় নেমে যাওয়ার পর সুদর্শনের আবার মনে পড়ে অম্বরের মন্তব্যটা। ফিসি ক্যারেকটার। আরো কিছুটা সময় অপেক্ষা করার পর, সুদর্শন যখন বিল মিটিয়ে বেরিয়ে আসছে, অম্বর তখন খুব হন্তদন্ত হয়ে ঢুকল।

বসতে হল আবার। অম্বরই ডাকল ওয়েটারকে। ওয়েটারকে অর্ডার দেওয়ার পর, রুমাল বার করে মুখ মুছতে মুছতে অম্বর বলল, প্রিন্স, টুমরো আমায় দিল্লী যেতে হবে।'

'একেবারে কালই?'

'আর বোল না ম্যান, একটা দিনও শ্লা দেরি করা চলবে না।'

'কিন্তু টিকিট পাবি কি করে?'

'সেজন্যেই তো এত দেরি হলো। সব পাকা অ্যারেঞ্জমেণ্ট করে আসতে হলো তো।' বলতে বলতে টাই-এর নটটা আলগা করে নেয় অম্বর।

এই অম্বর শিলিগুড়িতে বেশির ভাগ সময় পড়ে থাকত। ডোরাকাটা রঙীন পায়জামা আর মোটা কাপড়ের পাঞ্জাবী। এখন এবেলা ওবেলা টাই-এর রঙ বদলায় অম্বর। খুব চড়া রঙ পছন্দ করে ও। এখন যে টাইটা ওর গলায় ঝুলছে তাতে পাওয়া যাবে না—দুনিয়ার এমন রঙ নেই বোধ হয়। তবে ডিজাইনটা খুব ভাল।

খুব যত্ন নেওয়া দাড়িগোঁফের মাঝখান দিয়ে পরিপূর্ণ আস্থার হাসি রেখে অম্বর আবার কথা শুরু করে, 'কলকাতার আটঘাট সব আমার হাতের মুঠোয় চলে এসেছে। তোমারও আসবে—আরো কিছু দিন থাক।'

অম্বরের দিল্লী যাওয়ার খবরে সুদর্শন একটু উদ্বিগ্ন হয়। অম্বর না থাকলে মিনি বাসের ব্যাপারটা আর এগোবে না। প্রপার চ্যানেল—মানে অ্যাকুরেট ধান্দাবাজী না হলে কোন কিছু এগোনোর উপায় নেই এখানে।

'কতদিন থাকবি দিল্লীতে?'

'কিছু ঠিক নেই। একসঙ্গে একগাদা বিজনেস স্টার্ট করার এই হলো ফ্যাসাদ। খালি চক্কর মারো।'

'এদিকে আমার কি হবে?'

'ঘাবড়াও মৎ। ওর জন্যে অর্জুনকে ফিট্‌ করে দিয়েছি গুরু। কিছু ভেবো না।' বলে অল্প দূরের দিকে তাকিয়ে চাপা গলায় বলে ওঠে, 'শালা।'

সুদর্শন চোখ ফিরিয়ে দেখে ক্যাপ্টেন মালহোত্রা একটি ইরানী মেয়ের সঙ্গে কথা বলছে। ভয়ঙ্কর চোখা চেহারা মেয়েটার। 'সাজা পোশাকও চোখ টেনে রাখে। সুদর্শন দেখল মালহোত্রা বারকয়েক তাকাল তার দিকে।

॥ দশ ॥

তনয়াকে অর্ণব সব কথাই বলে। কিন্তু শুভার অসুখটা কি বলল না খুলে। শুধু তনয়ার মনে যাতে কোন রকমের প্রশ্ন না উঁকি দেয়—সেদিকে লক্ষ্য রেখেই বলল কয়েকটা কথা। তনয়া খুঁটিয়ে কিছু জানতে চাইল না ঠিকই। তবু অর্ণবের কোথায় যে একটা উদ্বেগ জমছে তা তনয়ার দৃষ্টি এড়াল না। এর মধ্যেই শক্তি একদিন বিকেলে এসে খবর দিল অজয়দার সংকটজনক অবস্থা।

সব কাজ ফেলে রেখে ওরা দুজনেই ছুটে গেল অজয় চক্রবর্তীর বাড়ি। তিলজলা বস্তির কাছে পুরনো স্যাঁতসেঁতে সেই দোতলা বাড়িটায় তখন তালা মারা। নিচের তলার বাসিন্দারা জানাল, আগের দিন সন্ধ্যেবেলা হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়েছে অজয়দাকে। নিয়ে গেছে নাটকের দলের ছেলেমেয়েরাই।

সুখলাল কারনানি হস্‌পিটাল।

অর্ণব আর তনয়া হাসপাতালে পৌঁছে দেখল, মেইন বিল্ডিং-এর সামনের পার্কটার রেলিংএর কাছে জটলা বেঁধে অজয়দার গ্রুপের অনেকগুলো ছেলে। পরিতোষও আছে। পরিতোষ এখন আর নাটকের গ্রুপে নেই। ফিল্মে নামে। অজয়ের হাতেই তৈরী ছেলে। পরিতোষের মত অবিশ্যি আরো অনেক ছেলেমেয়েকেই অভিনয় জগতে দাঁড় করিয়েছেন অজয়দা। তাদের কাউকেই এখন আশেপাশে দেখা গেল না। হয়তো খবর পায়নি। কিংবা খবর পেয়েও ছুটে আসার সময় পায়নি।

অজয়দার স্ত্রী মারা গেছেন বহুকাল। একটিমাত্র ছেলে। চাকরী করে জামশেদপুরে। ছেলের সঙ্গে বনে না অজয়দার। কি একটা ভয়ঙ্কর অভিমান আছে ওর মধ্যে যার জন্যে ছেলের পাঠানো

কোন সাহায্য কোন উপহার নেন না। নিজের ছেলেকে পর্যন্ত রেগে গিয়ে যা-তা ভাষায় গালাগাল করেন।

ভিজিটিং আওয়ার্স শেষ হয়ে এসেছিল প্রায়। পরিতোষই দুটো কার্ড যোগাড় করে দিয়েছিল অর্ণব আর তনয়াকে। ওরা সিঁড়ি দিয়ে উঠে গেল।

হাসপাতালে ঢুকলেই মনটা কিরকম যেন হয়ে আসে। সারি সারি বেড। মানুষ শুয়ে আছে, বসে আছে, আত্মীয়স্বজন পরিবৃত হয়ে আছে অধিকাংশ। হাসপাতালে ঢুকলেই কেমন মন খারাপ হয়ে যায়। মানুষের শরীরের সঙ্কট বড় প্রকট হয়ে ওঠে।

অজয়দার বেডের দুপাশে এবং পায়ের কাছে কয়েকজন দাঁড়িয়ে। শান্তা মল্লিক এসেছে দেখে ভাল লাগে অর্ণবের। দশ-বার বছর শান্তারও হাতেখড়ি অজয়দার হাতে। পরিতোষের মত শান্তাও ফিল্মে নামার পর আস্তে আস্তে নাটক থেকে সরে গেল। পরিতোষ তবু কখনো কখনো কমার্সিয়াল স্টেজে থাকে। শান্তা একেবারেই বিচ্ছিন্ন। শান্তার হাতে পরিতোষের তুলনায় ফিল্মও অনেক বেশি।

মাঝে মাসদেড়েক দেখা হয়নি অজয়দার সঙ্গে অর্ণবের। কদিন থেকেই অর্ণব আসবো আসবো করছিল, আসা হচ্ছিল না। আজ আসতে হলো হাসপাতালে।

বিছানার সঙ্গে মিশে আছে অজয়দার দেহটা। অক্সিজেন দেওয়া হয়েছে। মানুষটার দিকে তাকিয়ে চোখে জল এসে গেল তনয়ার।

চার দশক ধরে বাংলা নাটকের জন্যে নিজেকে বিলিয়ে দিয়েছে ওই মানুষটা। অর্ণবের মত অত ঘনিষ্ঠভাবে অজয়দাকে না দেখলেও—তনয়াও তো কম দেখেনি,—কি অমানুষিক পরিশ্রম করতে পারেন ওই শীর্ণ শরীর নিয়ে। যেমন একের পর এক ভাল নাটক লিখেছেন—তেমনি আশ্চর্য শক্তি নিয়ে অভিনয় করে গেছেন দিনের পর দিন। কিন্তু এতো করে কি হলো?

এতো নাটক লিখলেন, এতো অভিনয় করলেন, এতো অভিনেতা

অভিনেত্রী তৈরী করলেন নিজের সমস্ত প্রাণশক্তি ব্যয় করে, তারপর একদিন অসুস্থ হয়ে অচৈতন্য অবস্থায় হাসপাতালের বিছানায় নিঃশব্দে মুছে গেলেন জীবন থেকে, এই তো।

হ্যাঁ, বিছানার দিকে তাকিয়ে মৃত্যুর কথাই সবার আগে মনে পড়ছে তনয়ার। তবু বোধহয় মৃত্যুর মধ্যেও খানিকটা শান্তি আছে। যে জীবনের মাঝখানে অজয়দা থেকেছেন এতোকাল—কি পেয়েছেন সেখানে। শুধু নাটক করার আনন্দ। নিবেদনের সুখ।

তনয়ার বুক ঠেলে দীর্ঘশ্বাস নামে।

অজয়দার মুখের দিকে তাকিয়ে, তনয়ার নিজের মনের মধ্যে চাপা দেওয়া আশংকাটা তাকে আচ্ছন্ন করে ক্রমশ। এই তো পরিণতি। এই তো শিল্পসাধ। সমস্ত জীবন দিয়ে নাটককে ভালবাসার মাসুল। কে জানে অর্ণবের শেষ জীবনে কি আছে।

তনয়া জানে, এ নিয়ে অর্ণবকে প্রশ্ন তুললেই অর্ণব বলবে—অজয়দার সঙ্গে আমার তুলনা কোরো না। কোনো কোনো মানুষ অসম্ভব ত্যাগ করতে পারে। অজয়দা পেরেছেন। আমার তো সেদিক থেকে তেমন কিছুই ত্যাগ করতে হয়নি। অজয়দা নাটকের জন্যে সমস্ত রকমের জীবিকা ছেড়েছেন। শুধু নাটকের ওপর নির্ভর করে এদেশে কি সচ্ছলভাবে বাঁচা যায়! কোনক্রমে দিন চালাতেও অসুবিধে হয়। জনবহুল রুচির সঙ্গে আপোষ করে চললে হয়তো এই অনটনে পড়তে হতো না অজয়দাকে। কিন্তু তা তো হওয়ার নয়।

মানুষটা কি ভয়ঙ্কর জেদি—তা তনয়া জানে। ছেলের সঙ্গে মতের মিল নেই বলে যেমন তিনি ছেলের পাঠানো টাকা ফেরত দেন, তেমনি আবার যাদের সঙ্গে তার মনের মিল তারা কিছু সাহায্য করতে এগিয়ে এলেও চটে যান। দেখতে দেখতে কয়েকটা বছরের মধ্যে মানুষটার অমন সুন্দর সাবলীল স্বাস্থ্য ভেঙে গেল। ব্লাডপ্রেসার বাড়তে বাড়তে মারাত্মক অবস্থায় পৌঁছেছে। কিডনির ট্রাবল চলেছে সমানে। কিন্তু কোন কিছুই জেদি মানুষটাকে থামিয়ে রাখতে পারে না।

কিন্তু, এখন—এই মুহূর্তে কি ভয়ঙ্কর অসহায় আর নিঃসঙ্গ মনে হচ্ছে মানুষটাকে। ট্রাজেডির শেষ দৃশ্যে আসার সময় বুকের ভেতরটা যেন মোচড় দিয়ে যাচ্ছে। তনয়া চোখের জল রোখার জন্যে মুখ ফিরিয়ে নেয়। অর্ণব দাঁড়িয়ে আছে পাশে। একদৃষ্টে তাকিয়ে আছে অজয়দার দিকে।

অজয়দা প্রায়ই বলে, আমরা মিটে গেছিরে ভাই—আমরা এখন মিটে যাওয়ার দলে। অর্ণব তোরা এবার হিসেব বুঝে নে। অনেক বেশি কর্জ হয়ে গেছে রে ভাই। শোধের ভার তোদের হাতে রইল।

অর্ণবকে এ কথা বললে অর্ণব উত্তরে বলেছে, কি যে বলেন অজয়দা। আপনারা তো তবু উপার্জন করতে শিখেছিলেন। তাতেও যদি আপনাদের দেনা হয়ে থাকে—তাহলে আমরা তো থাকবো দেউলে হওয়ার দলে। আমরা তো উপার্জন করাই শিখিনি।

না রে ভাই, তোদের মধ্যে ব্যালেন্স আছে। ভারসাম্য রেখে অনেকটা যেতে পারবি। আমরা যে শালা গোড়াতেই টাল খেয়ে গেছি। এটুকু বলেই অজয়দা খিস্তি করতে শুরু করে দিতেন। এমন আশ্চর্য গুণী মানুষটার মুখ দিয়ে কখনো কখনো এমন অকথ্য গালি-গালাজ বেরতে শুরু করে যে ধৈর্যের সীমা পেরিয়ে যায়। যত বয়স হয়েছে, অজয়দার এই গালাগাল করাটা অসম্ভব বেড়েছে। রিহার্সালের সময় ছেলেমেয়েদের একটু এদিক ওদিক হলে—মুখে যা আসে বলে যান। নতুন ছেলেমেয়েরা তাই দলে থাকেও না। তারাই বা থাকবে কেন? তারা তো এধরনের আচরণে অভ্যস্ত নয়। আগেকার দিন হলে এসব মেনে নিত সবাই, এখন মানে না। দু তিন প্রজন্মে এদেশের নাটকের মহড়ার চেহারাটাই বদলে গেছে একেবারে।

অজয়দা বলবে, আজকাল ছেলেপুলেরা বড় বেশি সাকসেস ওরিয়েন্টেড। নাটক করতে আসে কিন্তু অন্তিম লক্ষ্যটা হল ফিল্মে চান্স পাওয়া। কেউ কমিটেড নয়। আরে বাপু, কমিটেড না হলে কি আর্ট হয়!

এই প্রজন্মের ছেলেমেয়েদের অজয়দা এ কথাটা কিছুতেই বুঝিয়ে উঠতে পারেন না। পারেননি। পারবেনও না।

ঘণ্টা পড়ল। ভিজিটার্সদের আর থাকা চলবে না। সবাই নেমে যাচ্ছে। দুপাশে সারি সারি সাদা বিছানা পেরিয়ে অন্যান্যদের সঙ্গে অর্ণব আর তনয়াও ফিরে এলো। নিচে এসে গাড়িবারান্দায় গৌতমের সঙ্গে দেখা।

'তুমি এখানে?' তনয়া জানতে চায়।

'আমার এক বন্ধু আছে ম্যাকেঞ্জি ওয়ার্ডে। দেখতে এসেছিলাম।' বলেই অর্ণবের দিকে চোখ পড়াতে বলে, 'অর্ণবদা, আপনার কাছে একবার যেতে হবে—একটা লেখা নিয়ে।'

'কি লেখা?'

'নাটক নয়। আমার সাবজেক্টই।'

'তোমার সাবজেক্ট নিয়ে আমার কাছে কেন? জিয়োগ্রাফী তো আমি স্কুল-ফাইনালের পর আর পড়িনি।'

'আপনাকে একদিন বলেছিলাম, মনে আছে কি—পার্ক স্ট্রীটের ওপর একটা রিসার্চ পেপার মতো করছি। আপনি বলেছিলেন খুব ইণ্টারেস্টিং সাবজেক্ট।'

শুনে তনয়া হেসে বলল, 'তোমার অর্ণবদার কাছে কোন্ সাবজেক্টটা যে ঠিক ইণ্টারেস্টিং নয়—তা তো আমি আজও বুঝে উঠতে পারলাম না।'

গৌতম অর্ণবকে বলে, 'পেপারটা তো তৈরী হয়েছে। ইংরেজীতে লেখা। টাইপ করিয়ে নিয়েছি। এখন ওর থেকে একটা বাংলা আর্টিকেল তৈরী করতে হবে একটা ম্যাগাজিনের জন্যে। সে জন্যেই আপনার কাছে যাবো।'

'এসো। আমারও তোমার পেপারটা পড়ার ইচ্ছে আছে।'

'আপনারা এখানে এসেছিলেন কার কাছে?'

'অজয়দা—অজয় চৌধুরীর কাছে। ইউরেমিয়া।'

'অজয় চৌধুরী, মানে, অ্যাক্টর ?'

'শুধু অ্যাক্টর নয়, আরো অনেক কিছু। তুমি কবে আসছ ?'

'রোববার সকালে। থাকবেন তো ?'

'থাকব।'

হাসপাতাল থেকে বেরিয়ে অর্ণব আর তনয়া হেঁটে এলো ট্রাম লাইন পর্যন্ত।

এখান থেকে এখন রিহার্সালে যেতে হবে। এমনিতে খুব স্বাভাবিকভাবে, প্রয়োজন হলে হাসির কথা হাসির সুরে বললেও, তনয়ার মনের তলায় একটা ভার জমতে শুরু করল এই বিকেল থেকেই। অজয়দার জন্যে উদ্বেগটা তার ভেতরকার নিজস্ব প্রচ্ছন্ন উদ্বেগের সঙ্গে তেমন যেন একাকার হয়ে গেল। আর বোধ হয়, এই উদ্বেগেই অনেকটা আড়াল হয়ে গেল শুভার অসুখ সম্পর্কে তনয়ার খুঁটিনাটি জানতে চাওয়াটা। এরপর থেকে অর্ণবের চিন্তা জড়ানো মুখের রেখাকে সে অজয়দার অসুস্থতার সঙ্গে জড়িয়ে ফেলল।

সেদিন মহড়া ঘরে আসতে একটু দেরি হলো দুজনের। সবাই এসে বসে ছিল। শুভাও।

অজয়দার খবরটা শক্তি ইতিমধ্যে সবাইকে জানিয়ে দিয়েছে।

অর্ণব আর তনয়া ফেরার পর, তাই—অজয়দাকে নিয়েই আলোচনা হলো কিছুক্ষণ।

অর্ণব জানাল, 'আজ পুরো রিহার্সাল হবে না। প্রথম দুটো দৃশ্য হবে। রিহার্সালের আগেই চা-টা হয়ে গেলে ভাল হয়।'

সুদর্শন এল এমন সময়।

সুদর্শন স্যু খুলতে খুলতে বলল, 'চলে এলাম। অম্বর নেই। সন্ধ্যেটা বের হবে—তাই—'

'বেশ করেছ। আমাদের রিহার্সাল যে তোমাকেও টানবে ভাবতে পারিনি।' তনয়া একটু শানিয়ে বলল।

'কেন ? আমাদের মহড়া কি দেখার মত নয় ?' শুভা প্রতিবাদের গলায় বলে।

'না না, আমি তা বলিনি। ওর তো হিট্ হিন্দি ছবি ছাড়া আর কিছুই ভাল লাগে না।'

'লাগে না বলে লাগবে না—তা তো বলা যায় না। যায় কি ?' শুভা সুদর্শনের পক্ষ টেনে বলে।

'ঠিক বলেছেন। তনয়াদি আমায় খুব ডাউন দিতে চাইছে। ওঁর সঙ্গে তো আমি কথায় পারবো না।'

'না-কথায় পারবে তো ?' এবার বলে অর্ণব।

'মানে ?'

'মানে, একটাও কথা বোলো না—দেখবে প্রতিপক্ষ আপনি চুপ করে যাবে।'

সুদর্শন ঘরের মধ্যে এসে বসতে বসতে বলে, 'সেটা ভাল আইডিয়া। অন্তত আমার পক্ষে খুব সুবিধে।'

অর্ণব লক্ষ্য করল, সুদর্শন এমন জায়গায় বসল যেখান থেকে শুভার সঙ্গে সহজে কথা বলা যায়। শুভাও সুদর্শন আসার পর থেকে ঘন ঘন তাকাচ্ছে ওর দিকে। সুদর্শনে-র চেহারাটা তাকানোর মতই —কমবয়সী মেয়েদের ফিরে ফিরে তাকানোটা স্বাভাবিক। সেদিন ট্যাক্সিতে কি ওদের বেশ আলাপ হয়ে গেছে। তা তা হলে—যে টাইপের ছেলে—তাতে এখানে আসার কোন সঠিক কারণ খুঁজে পাওয়া যাবে না। অম্বর নেই তো কি, মজা করার জন্যে শহরের অনেকটা তো পড়ে আছে।

এরপর চা এলো যখন, চা দিতে গিয়ে সুদর্শনের ভাঁড় ধরা নিয়ে আগের দিনের জের টেনে আর এক প্রস্থ রসিকতা করল শুভা। সব সময়ই খুব চাপা মেজাজে—শুভা বরাবর যেমনটা ঠিক যেন তেমনটা

নয়। অর্ণবের বারবার মনে এলো ডাক্তার পালিতের কথাগুলো। খুব অস্বস্তি লাগছে।

মহড়া তেমন জমল না।

যাওয়ার মুখে আজ আর সুদর্শনকে অর্ণবের বলে দিতে হল না। সুদর্শন নিজের থেকেই শুভাকে পৌঁছে দেবার কথা বলল।

সারাদিন বিশ্রী গুমোট গেছে। রিহার্সাল বসার মুখটায় একটা ঠাণ্ডা হাওয়া দিয়েছিল। দূরে কোথাও বৃষ্টি হয়েছে বুঝিবা। এখানে দু-এক ফোঁটা পড়ে থেমে গেল।

ঠাণ্ডা হাওয়াটাও পড়ে গেল আচমকা।

রিহার্সাল রুম থেকে বেরিয়ে পথে নামার পর অর্ণব বলল সুদর্শনকে, 'তুমি একদিন বিকেলের দিকে এসো আমাদের বাড়িতে।'

বিশেষ কোন দরকার আছে—না এমনি—অর্ণবদা?' সুদর্শন একটু কৌতূহলী হয়ে জিজ্ঞাসা করে।

'বিশেষ দরকারই বলতে পারো। তবে তাড়া নেই কিছু। তোমার সময় মত এসো। আমি তো সাধারণত বিকেলের দিকটায় বাড়ি থাকিই।'

'আমার হাতে তো এখন দেদার সময়। চলে যাবো। আসি। আসছি তনয়াদি।'

অল্প হেঁটে গিয়েই ট্যাক্সি পাওয়া গেল।

দরজা খুলে শুভাকে ওঠানোর পর, নিজে শুভার পাশে বসে দরজা টেনে শব্দ করে বন্ধ করে দিয়ে সুদর্শন বলল, 'পার্কসার্কাস যাবেন তো?'

'আপনি কি আজও ওই দিকে যাচ্ছেন—নাকি শুধু আমার জন্যেই মিছিমিছি—আমার তো আজ তেমন তাড়া নেই—বরং এতো তাড়াতাড়ি বাড়ি ফিরতেই ভাল লাগছে না।'

'তাহলে চলুন কোথাও গিয়ে একটু বসি। আমার বেশ খিদে পেয়েছে।' বলে সুদর্শন ড্রাইভারকে বলল, গড়িয়াহাট দিয়ে চলুন বালিগঞ্জ ফাঁড়ি।'

কোয়ালিটির সামনে ওরা ট্যাক্সি ছেড়ে দিল।

'আমি কিন্তু শুধু চা খাব—অন্য কিছু খাওয়া চলবে না। আপনি খান।' শুভা রেস্টুরেন্টে বসতে বসতে বলে।

'সে আমি অ্যালাও করতে পারি না। আমি খেয়ে যাবো আর আপনি দেখবেন—তা হচ্ছে না।'

'বারে। আপনার খিদে পেয়েছে। আমার তো আর খিদে পায়নি।'

'পায়নি তো কি হয়েছে—পাইয়ে নিন।'

'এই না,—সত্যি,—আমার খাওয়া চলবে না—ইদানীং আমার শরীর ভাল যাচ্ছে না। পরে একদিন খাওয়া যাবে।'

সুদর্শন শুভার চোখের দিকে তাকাল।

'এই না, সত্যি' বলার ধরনটা যেমন মিষ্টি তেমনি খুব টানে ওই চোখ দুটো।

'ঠিক আছে, অল্প কিছু খান', বলে সুদর্শন ওয়েটারকে ডাকে।

অর্ডার দেওয়ার পর শুভাকে বলে, 'কি হয়েছে আপনার? সবাই আপনার অসুখ নিয়ে খুব ব্যস্ত দেখি!'

'সবাই বলতে?'

'সবাই বলতে অর্ণবদা, তনয়াবৌদি, আপনাদের উজ্জ্বল ব্যানার্জী।'

'আমার আপন লোক বলতে তো ওরাই।' কেমন অবশ আর করুণ স্বরে শুভা বলে কথাটা। সুদর্শনের ভেতরে গিয়ে বাজে।

'অসুখটা কি?' সুদর্শনের স্বরে এবার সহানুভূতি আরো ঘন হয়।

'আমিই কি জানি ছাই। সাংঘাতিক কিছু একটা হবে।'

বলার সময় খুব উদাস হয়ে যায় শুভা।

'আপনি যেন পাত্তাই দিতে চাচ্ছেন না অসুখটাকে!'

'না পাত্তা দিলে অসুখ তো আমায় ছেড়ে যাচ্ছে না। ওর শোধও তুলে নেবে।' বলেই শুভা আচমকা অপ্রস্তুতের হাসি হাসে।

'বুঝতে পারলাম না—কি বলতে চাইছেন।'

'বুঝতে চাইবেন না। আমিও চাই না। বোঝা মানে তো কষ্টের

বোঝা। একদিন ঝুপ করে মরে যাবো—ব্যস্, মিটে যাবে সব বোঝা-বুঝি।'

'যারা অসুখ টিকিয়ে রাখে তারা সহজে মরে না—জানেন তো।' সুদর্শন কথাটাকে হাল্কা করে বলার চেষ্টা করে।

'সেটাই আমার সবচেয়ে ভয়! ধুঁকে ধুঁকে মরার কথা ভাবলেই'—

'ছাড়ুন তো! আমরা কি এখানে মরার গল্প করতে এলাম।' সুদর্শন অন্য কথায় যেতে চায়। 'এতো খাটেন কেন বলুন তো! এতো নাটকের রিহার্সাল দিতে দিতে কি টায়ার্ড ফিল করেন না?'

'টায়ার্ড লাগলেও অভিনয় করায় আনন্দ আছে—এ পরিশ্রম আমার গায়ে লাগে না।'

'তাহলে আবার কি পরিশ্রম আছে আপনার? আপনি কি চাকরী করেন?'

'না, চাকরী ঠিক নয়।' বলে শুভা কেমন বিষাদের হাসি ছড়িয়ে রাখে মুখে। অল্প পরে বলে, 'সংসারের কাজকর্ম তো আমাকেই দেখতে হয়। আমার মা নেই। বাবার মাথা খারাপ। বুড়ি এক পিসিমা আছে—চোখে কম ত্মাখে, কানে প্রায় শুনতেই পায় না। ছোট বোন পড়ছে লেডি ব্রাবনে। সব সামলাতে হয় আমাকেই।' বলতে বলতে খানিকটা অন্যমনস্ক হয়ে যায় শুভা। চুপ করে থাকে কিছুক্ষণ। তারপর হাসির মত করে বলে ওঠে, 'এই দেখুন, কেমন সেন্টিমেন্টাল হয়ে যাচ্ছি। হঠাৎ কিরকম নিজের ঘরের কথা শোনাতে আরম্ভ করে দিলাম। আশ্চর্য! এভাবে তো কাউকে বলি না আমি। কোনদিন বলিনি কাউকে। আপনাকে বলে ফেললাম। কেন যে বললাম!'

'কেন?' সিগারেট ধরাতে ধরাতে সুদর্শন প্রশ্ন করে।

'জানি না। হঠাৎ কি রকম মুড হল। এরকমটা আমার হয় না কখনো।'

বেয়ারা এসে ঠাণ্ডা জলের গ্লাস দুটো রেখে গেল।

সুদর্শন আবার শুভার চোখের দিকে তাকায়।

শুভাও তাকিয়ে আছে তার দিকে। দুজনের চোখ দুজনের চাউনিতে থেমে থাকে কিছুক্ষণ।

মেয়েদের চোখের ভাষার সঙ্গে সুদর্শনের অনেক কালের পরিচয়। এ ভাষাটাই বোধহয় সে সবচেয়ে ভাল বোঝে। ইঙ্গিত, আকর্ষণ, আমন্ত্রণ কিংবা উচ্ছ্বাস— দৃষ্টিপাতের যে সব একান্ত পরিচিত ভঙ্গিমার কাছে সে অভ্যস্ত—শুভার চোখের কথায় তার কোনটাই নেই। অন্যরকম। কেমন যেন নির্ভরতা খোঁজার ভাব। অথৈ জলের মধ্যে ডুবে যেতে যেতে একবারটি বুঝি বা মাথা তুলে ডাঙা দেখার আকুলতা।

শুভা হাসে। দুঃখ ভেঙে ভেঙে ছড়াচ্ছে সে হাসি। বলে, এক এক সময় ভাবি, মানুষের সঙ্গে মানুষের স্বার্থের সম্পর্কের বাইরে কি সত্যিই আর কিছু নেই। ভাবলে এতো খারাপ লাগে না—কি বলব।'

'আমি এসব ভাবি না। কোন মানে হয় না ভাবার। যা পাওয়া যায় না তা নিয়ে ভেবে লাভ কি—বলুন।'

'তবুও তো পেতে ইচ্ছে করে,—করে না? মনে হয় না— জীবনে অন্তঃত একটা মানুষের দরকার যে শুধুই লোভের চোখ নিয়ে তাকিয়ে থাকবে না—যার সঙ্গে খুব সহজ হয়ে কথা বলা যাবে।'

সুদর্শন লক্ষ্য করে শুভা কথা বলতে বলতে কেমন যেন অন্যমনা হয়ে পড়ছে। অন্যমনা, তবু আবেগ ছুঁয়ে আছে প্রতিটি কথাতে। যত শোনা যায়, ততই কেমন নেশার মত লাগে শুভার গলার স্বর। ওর দাঁতগুলো ভারি সুন্দর। চমৎকার সাজানো।

'এই, কি দেখছেন?' আচমকা শুভা দৃষ্টি ভেঙে বলে।

'আমি একেবারেই সবকিছু দেখতে পাই না।'

'বারবারে একটু একটু করে দেখেন তাই?'

'আপত্তি আছে?'

'আছে বইকি। যার দিকে তাকাবেন—তার কথাও ভাবুন। একটু একটু করে দেখার সুযোগটা তো তাকেও দেবেন? না কি?'

সুদর্শন হেসে বলে, 'দিচ্ছি।'

॥ এগার ॥

রোজই দিনের বেলাটায়, মিনিবাসের ব্যাপারে এদিক ওদিক ছোটাছুটি করতে হচ্ছে সুদর্শনকে। অম্বর চলে যাওয়ায়—কলকাঠি নাড়ার ভারটা এখন অর্জুন সিং বেদির। কিন্তু অর্জুনকে পাওয়া তো অম্বরকে পাওয়ার চেয়েও অনেক কঠিন। গোটা কয়েক ব্যবসার সঙ্গে আছে গানের ব্যবসা। পরপর দুদিন ব্লু ফক্সে এসেও ওকে পাওয়া গেল না। মনে মনে সুদর্শন খুব বিরক্ত হয়ে ওঠে। পাঁচ-ছটা ফোন নাম্বার আছে অর্জুনের। ফোন করে করে নাজেহাল হতে হয়। লোকটা কথা দিয়েও কথা রাখে না। সুদর্শন খুব চটে যায়। তবু রাগ না চেপে উপায় কি! দরকারটা তো তারই।

আজ সন্ধ্যের মুখে ব্লু ফক্সে ফোন করল সুদর্শন। জানা গেল অর্জুন ওখানে আসতে পারে। প্রোগ্রাম নেই। তবে খানিকক্ষণ বসে দেখা যেতে পারে। অন্তত পৌনে আটটা পর্যন্ত তো দেখা যাবে। আটটার সময় শুভাব সঙ্গে দেখা হবার কথা। দু-এক মিনিট এদিক ওদিক হলে কিছু যায় আসে না। শুভাকে বলাই আছে। দশ থেকে পনেরো মিনিট দু পক্ষেরই ছাড।

সুদর্শনের পোশাক আজ রীতিমত জমকালো। অর্ডার দেওয়া সার্ট-প্যান্ট আজ সকালেই সে ডেলিভারি নিয়েছে। চওড়া বেল্ট কিনেছে একটা। ঘড়ির ব্যাণ্ড পাল্টেছে। ঘরের আয়নায় আজ একটু বেশি সময় সে নিজেকে দেখে নিল সন্ধ্যেয় বেরোনোর আগে। সকালে একটা খবর শুনে মনটা একটু খারাপ হয়ে গেছিল সুদর্শনের। নিতাই খুড়োর স্ট্রোক হয়ে গেছে। বড় মেয়ে ঠিকানা খুঁজে খুঁজে এসেছিল সুদর্শনের কাছে। আজ আর হলো না—আসছে কাল একবার হাসপাতালে গিয়ে দেখে আসতে হবে খুড়োকে। খুড়োর

বড় মেয়ে সন্ধ্যা ভারি শান্ত মেয়ে। খুব নিস্তেজ। বাবার জন্যে আরো কেমন যেন মিইয়ে ছিল। সুদর্শন ঠিকমত তাই তাকায়নি মেয়েটার দিকে। খুব গুটিয়ে থাকা মেয়ে। সন্ধ্যাকে খুব ছোটবেলায় দেখেছে সুদর্শন। একবার ভেবেছিল, সন্ধ্যার হাতে কয়েকটা টাকা তুলে দেবে সাহায্য হিসেবে। তারপর ভাবল—আগে তো হসপিটালে যাই একবার। তারপর দেওয়া যাবে। মানুষের বিপদে এটুকু করা দরকার। বিপদ যে কখন কোথা থেকে আসে। দুদিন আগে যে লোকটাকে সুস্থ শরীরে কাজ করতে দেখে এলো—এর মধ্যে সে হাসপাতালে। এখনো কথা বলতে পারছে না। একটা হাতে সাড় নেই কোন।

ব্লুফক্সে অর্জুন সিংকে পাওয়া গেল না। আসেনি তখনো। আসবে কিনা কেউ বলতে পারল না। সুদর্শন ভাবল এ সময় সিন্ধুর সঙ্গে দেখা হলেও বেশ হতো। খানিকক্ষণ গল্প করে কাটানো যেত। এ কথাটা ভাবতে ভাবতেই তার মনে হল শুভার হাতের আঙুলগুলো ভারি সুন্দর। আচমকা মনে হলো।

সময়মত একই জায়গায় অনেকক্ষণ দাঁড়িয়েও সিন্ধুর দেখা পাওয়া গেল না যখন, সুদর্শন ভাবল, বারে গিয়ে একা খানিকটা বসবে কিনা —কিন্তু শুভার কথা ভেবে আর এগোল না।

'একস্‌কিউস মি, আপনার সঙ্গে আমার একটু দরকার ছিল।'

সুদর্শন তাকিয়ে দেখল ক্যাপ্টেন মালহোত্রা দাঁড়িয়ে তার সামনে। লোকটা অদ্ভুতভাবে তাকিয়ে আছে তার দিকে।

'আমার সঙ্গে?' সুদর্শন বিস্ময়ের গলায় বলে।

'আপনার হাতে যদি সময় থাকে, তাহলে ভেতরে বসে আপনাকে ব্যাপারটা ক্লিয়ার করে বলি।' সুদর্শন লক্ষ্য করল মালহোত্রা বাংলা খারাপ বলে না।

'চলুন। আমার এখন তেমন তাড়া নেই।'

দুজনে ভেতরে গিয়ে বসে।

ড্রিঙ্কস্‌-এর অর্ডার দিয়ে মালহোত্রা কার্ড বার করে যথাস. আত্মপরিচয় দেয়। কুকুরের ব্যবসার কথা বলে। তারপর জানা চায়—সুদর্শন কি কাজ করে।

সুদর্শন প্রথম পরিচয় হওয়ার পর সবাইকে যেমন বলে, সে একই রকম করে একই কথা আরো একবার আউড়ে যায়। অম্ব সিংএর কথা বলে। বলে শীঘ্রিই মিনিবাস কিনছে। ব্যবস্থা ম মোটামুটি পাকা।

একটু থেমে, সুদর্শনের চোখের দিকে তাকিয়ে ক্যাপ্টেন বলে, 'সাইড বিজনেস করতে আপত্তি আছে কিছু?'

মালহোত্রার স্বরে এবার রহস্য।

'বিজনেস? কিসের?' সুদর্শন মালহোত্রার চোখের দিকে তাকিয়েই বলে।

চওড়া মুখটার মধ্যে ছোট ছোট চোখ। চোখের কোণে কালি পড়েছে। মুখে ভাঁজ পড়তে শুরু করেছে। অবশ্য লোকটার চলাফেরার কায়দা দেখে বয়সটা ঠিক ধরা মুশকিল।

মুখে সেই রহস্যের হাসিটা আরো একটু ছড়িয়ে মালহোত্রা আবার বলে, 'ঠিক বিজনেস নয়—সার্ভিস বলতে পারেন। ভাল পয়সা।'

'আগে সার্ভিসটা কি শুনি?'

'এক মিডল্‌ এজেড লেডিকে দুদিন কম্প্যানি দিতে হবে।'

'দিনরাত?'

'দিনরাত হলে ভাল হয়। একান্ত অসুবিধে হলে সন্ধ্যের থেকে হলেও চলবে। জাস্ট টু ডেজ।'

'দুদিন মানে কবে, কবে?'

'টুমরো অ্যাণ্ড ডে-আফটার টুমরো। আমি যদিও এমনিতে মোটামুটি একটা ব্যবস্থা করে রেখেছি, কিন্তু যার সঙ্গে ব্যবস্থা হয়েছে তাকে দিয়ে ঠিক সুবিধে হবে না। আমি গতকালও আপনার খোঁজ করেছিলাম। পাইনি।'

সুদর্শনের স্বর থেকে তখনো বিস্ময় মেলায় না। সে বলে, 'কিন্তু আপনি আমার কথা ভাবলেন কেন?'

মালহোত্রা হাসিতে রহস্য পাকায়। জানায়, 'পাকা জহুরীর চোখ তো। না কষেই বলে দিতে পারি।'

অল্প একটু চুপ থেকে আবার সেই রহস্যচাপা হাসির ভাঁজ থেকে মালহোত্রা বলে, 'আপনি যদি রাজি থাকেন তাহলে মাঝে-মধ্যে এ ধরনের কাজ আপনাকে এনে দিতে পারি। এতে আপনার চারদিক থেকেই লাভ।'

এত স্পষ্ট আর এত সোজাসুজি কথাগুলো উচ্চারিত হয় যে সুদর্শন প্রথমটায় কি উত্তর দেবে ভেবে পায় না। আশ্চর্য! কেউ যে এত তাড়াতাড়ি এমন সরাসরি কথা বলতে পারে সুদর্শনের ধারণা ছিল না।

ক্যাপ্টেন মালহোত্রা সত্যিই পাকা লোক। সুদর্শনকে ভাববার সময় দিয়ে ল্যাট্রিন যাবার জন্যে চেয়ার ছেড়ে উঠে পড়ে। যাবার আগে বলে যায়, 'ভদ্রমহিলাটি এসেছেন বাঙ্গালোর থেকে। কলকাতায় রেসের মাঠে ওঁর ঘোড়া আছে। এর আগে যতবার এসেছেন, এখানকার একটি ছেলে—অসিত মেহেরা ওঁকে কম্প্যানি দিয়েছে খুব। রিয়্যালি, অ্যামিট্ ওয়াস এ স্মার্ট গ্যই। দারুণ স্পীডি ছেলে। গত মাসে কানাডায় চলে গেল। ও থাকলে আমি নিশ্চিন্ত থাকতাম। আপনি ভাবুন। মোটা টাকা কিন্তু।'

একসঙ্গে অনেকগুলো ভাবনা জড়াতে থাকল সুদর্শনের চিন্তায়। এজেড্ লেডিকে কম্প্যানি! কত এজেড্! কি ধরনের কম্প্যানি! কলকাতা সম্পর্কে অনেক আজব কথা জানে সুদর্শন। এটা জানা ছিল না। যেন তার জন্যে—স্রেফ তার জন্যেই এমন একটা খবর ঘটতে যাচ্ছে। স্টার! বৃষ রাশি সম্পর্কে আজ কাগজে কি ভাগ্যলিপি ছিল? লোকটা অন্য কোন ধান্দায় নেই তো! অন্য আর কিসের ধান্দা হবে! দেখাই যাক না। আর কিছু না হোক একটা নতুন ব্যাপারে অভিজ্ঞতা তো হবে। এ তো পড়ে পাওয়া চোদ্দ আনা।

তার চেহারাটা যে আর পাঁচজনের কাছে আকর্ষণীয়—এটা বোঝার ক্ষমতা হওয়ার পর থেকে যতবার সে শুনেছে ততবারই নতুন নতুন করে খুশি হয়েছে। কুসুমকাকী তো শুরু মাত্র। তারপর বয়স বেড়েছে যত, ততই সে নিঃসন্দেহ হয়েছে—তার শরীরই তার স্বপ্নলোকের চাবি। এই যে অম্বরের কথায় সে কলকাতায় চলে এলো দাদার সঙ্গে ঝগড়া করে—তা কিসের ওপর নির্ভর করে? আর তাই যদি হয় তাহলে মালহোত্রার এই অদ্ভুত প্রস্তাব লুফে নিতে কোন রকমের সঙ্কোচ থাকার কথা নয়।

কিন্তু শুভা।

শুভার মুখটা চকিতে মনে পড়তেই কেমন যেন দমে যায় সে। সর্বনাশ, সুদর্শন কি প্রেমে পড়ল। তা না হলে এসবের মধ্যে শুভা আসে কেন। ঘটনা তো জীবনে কম ঘটল না তার, কিন্তু তার মধ্যে কোনটাই তো তাকে এভাবে টানেনি। ভাৎ। কি আছে মেয়েটার। চোখ? গলার স্বর? হাতের আঙুলের গড়ন? তবে? আচ্ছা, এই ধরনের আলাদীনের আশ্চর্য প্রদীপ হয়ে মালহোত্রা প্যাটার্নের একদিন কেউ তার কাছে আসবে—এমন কোন স্বপ্ন কি কোনদিন তার মনে জায়গা পায়নি? তার তুলনায় শুভা কতটুকু?

কিন্তু ওই লোকটা? ক্যাপ্টেন? মালহোত্রার কথায় কি রাজী হওয়া যায়। লোকটাকে বিশ্বাস করতে বাধে। কলকাতার ভেতরের আর কতটুকু জানা আছে সুদর্শনের। এক কথায় ক্যাপ্টেনকে বিশ্বাস করা ঠিক হবে না। অন্তত সিন্ধুকে একবার জিজ্ঞাসা—

দূর—এসব সিন্ধুকেই বা জিজ্ঞাসা করবে কি করে। বোগাস। নাহ্, এসব ফাঁদে পা না দেওয়াই ভাল। মালহোত্রা টেবিলে ফিরে আসার আগে সুদর্শন মনে মনে ঠিক করে নেয়, মালহোত্রার কথায় সে রাজী হবে না।

টয়লেট থেকে ক্যাপ্টেন ফিরে এল। এখনো তার মুখে বদখদ হাসিটা লেপ্টে আছে। কোন কোন লোককে হাসলেও খারাপ

দেখায়। ওটা কি হাসি—না লোকটার মুখের আদলটাই ওই ধরনের। এর আগে তো শুধু দূর থেকেই দেখা গেছে। সেটাই বরং ভাল ছিল।

ক্যাপ্টেন ফিরে এসে নিজের চেয়ারে বসে। কেমন একটা নিশ্চিন্ত ভাব লোকটার চোখে মুখে। যেন সুদর্শন রাজী হয়েই গেছে—শুধু যাওয়ার অপেক্ষা। সুদর্শনের দিকে না তাকিয়েই রুমালে হাত মুছতে মুছতে ক্যাপ্টেন টাকার অঙ্কটা বলে দেয়।

সুদর্শন কোন কথা বলে না। নিঃশব্দে হাতঘড়ির দিকে তাকায় একবার। অর্জুনের সঙ্গে আজও দেখা হবে না। শুভার কাছে যেতে হবে।

মালহোত্রা বলে যাচ্ছে, 'জাহাজ ছেড়ে দেওয়ার পর আজ একযুগ ধরে আমি পার্ক স্ট্রীটের লোক। এখানে রেগুলার যারা ঘোরা-ফেরা করে—ইয়াং অ্যাণ্ড ওল্ড, বয়েজ অ্যাণ্ড গার্লস—অলমোস্ট সকলেই জানে আমাকে। আমি কখনো ভুল লোককে ধরি না। তাছাড়া, মাইণ্ড ইট, আমি যার কাছে ইনট্রোডিউস করে দিচ্ছি, তার গুডবুকে একবার যে এসেছে—হি ইস লাকি। অসিত মেহেরা এত ইনফ্লুয়েন্স হলো কি করে? কলকাতায়—এই পার্ক স্ট্রীটে একদিন অসিত মেহেরাও ছিল ফালতু। কিছু বলা যায় না, এখান থেকেই হয়তো আপনার সভ্যি-কারের লাক খুলে যাবে। বাংলায় বলে না, হাতের লক্ষ্মী পায়ে ঠেলতে নেই। এমন চান্স মিস করবেন না ব্রাদার।'

সুদর্শন মালহোত্রার দিকে তাকায়। কি বলবে উত্তর খুঁজে পায় না।

'তাহলে, টুমরো অ্যাণ্ড ডে-আফটার টুমরো কোন এনগেজমেণ্ট থাকলে ক্যানসেল ইট। কাল আমি এখানে আসছি—জাস্ট এট সিক্স। ও-কে?'

লোকটার কি অদ্ভুত চোখ। তাকিয়ে যেন সুদর্শনের ভেতরটা পর্যন্ত দেখতে পাচ্ছে। 'না' বলতে গিয়েই সুদর্শন চুপ করে থাকে। ক্যাপ্টেন আগের মত হাসে।

অল্প একটু দেরি হয়ে যায় সুদর্শনের। পার্ক স্ট্রীট থেকে হাজরার মোড়—খুব একটা দূর নয় যদিও। শুভা কথা মত দাঁড়িয়েছিল বসুশ্রীর নিচে।

সুদর্শন অপরাধীর মত বলে, 'অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে আছেন বোধহয়? আমার—'

'না— অনেকক্ষণ নয়—এই সবে এসে দাঁড়িয়েছি।'

'চলুন, ওপরের রেস্টুরেন্টে গিয়ে বসি। আপনি তো খুব টায়ার্ড হয়ে আছেন—দেখেই বোঝা যাচ্ছে।'

সিঁড়ির দিকে এগোতে এগোতে শুভা বলে, 'আজকাল আমায় সব সময় টায়ার্ড দেখায়।'

'আজ তো বিকেল থেকে রিহার্সাল ছিল।' সিঁড়ি দিয়ে উঠতে উঠতে বলে সুদর্শন।

'হওয়ার কথা ছিল। হয়নি।'

'কেন?'

'অজয় চৌধুরী মারা গেছেন আজ বিকেলে। আমাদের গ্রুপের সকলেই প্রায় গিয়েছিল শ্মশানে। ওরা এখনো আছে ওখানে। আমি চলে এলাম।'

'এজন্যেই আপনাকে বেশি টায়ার্ড মনে হচ্ছে।'

'খুব বড় আর্টিস্ট ছিলেন অজয় চৌধুরী। স্টেজে মানুষটার বিরাট কনট্রিবিউশন।' দীর্ঘশ্বাস নামানোর মত করে বলে শুভা।

'হ্যাঁ, সেদিন রিহার্সাল রুমে শুনছিলাম অনেক কথা। আমি কখনো ওঁর অভিনয় দেখিনি।'

'কদিন আগেও স্টেজে নেমেছেন। পরশু রাতে হসপিটালে গেছেন—আজ শেষ।'

সুদর্শনের নিতাই খুড়োর কথা মনে পড়ল। নিতাই খুড়ো হসপিটালে পড়ে আছে। আজও দেখতে যাওয়া হল না। আসছে কাল আর পরশু ক্যাপ্টেন মালহোত্রাকে কথা দেওয়া আছে। কাল

বকেলের দিকে একবারটি যেতেই হবে। মেয়েটা এত করে বলে গল। কিছুই বলা যায় না, মানুষ কখন আছে কখন নেই।

'মারা গিয়ে শান্তি পেয়েছেন মানুষটা। খুব হতাশায় ভুগছিলেন। এভাবে বাঁচার থেকে মরা অনেক সুখের।'

'এভাবে মানে?'

সুদর্শনের আচমকা এই প্রশ্নে শুভা মুখ তুলে তাকায়। চোখে চাখ স্থির হয়ে যায় কয়েক মুহূর্ত। তারপর আস্তে আস্তে বলে, 'এই অনিশ্চিতভাবে বেঁচে থাকার—সব সময় অন্যের দয়ার ওপর নির্ভর হবে থাকা—'

শুভার কথাগুলোকে সুদর্শনের কেমন অসংলগ্ন মনে হয়। সুদর্শন বুঝতে পারে, শুভার সমস্ত কথার তলায় তলায় আর একটা কি অন্য কথা লুকোনো আছে—যাকে শুভা সব সময় আড়াল করতে গিয়েও ঠিকমত আড়াল করতে পারে না যেন। কথার ফাঁকে ফাঁকে বার বার তার দুঃখ উঠে আসে। সুদর্শন বুঝতে পারে শুধু ভেতরের দুঃখটাই নয়, আরো কি এক দুঃখ সব সময় পাকিয়ে আছে শুভাকে। শুভার চোখের দিকে তাকালেই বোঝা যায় কেমন অসহায়ভাবে যেন ভেসে যাচ্ছে মেয়েটা। কিছু একটা আঁকড়ে ধরার জন্যে আকুল হয়ে আছে।

'কে আর নিশ্চিন্তে বেঁচে আছে?' অনেকক্ষণ পর, ঠিক উত্তর নয়, যেন নিজেকে নিজে শোনাচ্ছে এমন স্বরে কথাটা বলে সুদর্শন। শুভা কোন উত্তর করে না। সুদর্শনের চোখের দিকে তাকিয়ে থাকে।

সুদর্শন আলাদা করে কখনো ভেবে ছাখেনি চোখের মধ্যে আত্মপ্রকাশের যে ভাষা থাকে তার চেয়ে আরো বেশি কথা কোথাও থাকতে পারে কিনা। কিন্তু এই মুহূর্তে শুভার চোখের দিকে তাকিয়ে বুঝতে পারে চোখের শুধু এক পলক তাকানোর মধ্যে ধরা পড়ে দুজনের সম্পর্ক। দূরের মানুষ কাছে চলে আসে। লঙ্ সট কেটে আসে চোখের বিগ্ ক্লোসআপে। শুভার চোখের দীর্ঘ পাতা কখনো অনড়,

কখনো বা কাঁপে ঈষৎ। বড় চোখের ঘন কালো মণির কেন্দ্র বুঝিবা অনেক দূরে কোথাও টেনে নিয়ে যেতে চায়।

'কিছু ভাল লাগছে না। সত্যিই বেঁচে থাকার কি মানে বুঝি না।' শুভা একবার চোখ নামিয়ে আবার চোখ তুলতে তুলতে বলে।

'কেন? নাটক আছে তো।'

'সে তো আছে, থাকবেও। আমি থাকবো কিনা কে জানে।'

'কেন? কি হল এমন?'

'ডাক্তার পালিত আমার সম্পর্কে কি রিপোর্ট দিয়েছেন তার ডিটেল্‌স্‌ জানি না। রিপোর্ট যে ভাল নয় তা অর্ণবদার মুখ দেখে বুঝেছি। অর্ণবদাও চান না আমি এতো বেশি নাটক করি। আমার এখন কমপ্লিট রেস্টের দরকার। কিন্তু কি করবো আমি রেস্ট নিয়ে।'

'শরীর সারাবে।'

'শরীর সারাতে গিয়ে আমার বসে থাকলে চলবে না। আমার পক্ষে তা সম্ভব নয়। তোমাদের আমি বোঝাতে পারবো না।'

বেয়ারা এসে দাঁড়াল টেবিলের সামনে। আজ আর সুদর্শন শুভাকে জিজ্ঞাসা করার অপেক্ষা রাখে না। নিজেই অর্ডার দিয়ে দেয় বেয়ারাকে। বেয়ারা চলে গেলে বলে, 'আমার ঘন ঘন খিদে পায়। আর আমার সঙ্গে যে থাকে সে কিছু না খেলে আমি তৃপ্তি করে খেতে পাই না।'

আজ আর শুভা কোন কথা বলে না এ নিয়ে। এ নিয়ে কথা বলার মত মনের অবস্থাও নয় শুভার বোঝা যায়। সে ভরা জলের গ্লাসের দিকে তাকিয়ে থাকে।

দেশলাই বার করে সিগারেট ধরাতে গিয়ে প্রথম কাঠিটা নিভে যায় সুদর্শনের। এরকম হয় না তার বড় একটা। জোর বাতাসেও সে দিব্যি এক কাঠিতে সিগারেট ধরাতে পারে। এখন পারল না।

'তোমার নাটক কমে গেলে যার ক্ষতি হোক না কেন আমার কিন্তু লাভ।' সুদর্শন এবার হাল্কা হওয়ার চেষ্টা করে।

'লাভ ?'

'হ্যাঁ, লাভ নয়! সন্ধ্যেগুলোতে গল্প করার একজন সঙ্গী পাওয়া যাবে। না হলে কলকাতা খুব বোর লাগে।'

'সে তো যতদিন না মিনিবাসের পারমিট বার হচ্ছে।'

'বেরিয়ে যাওয়ার পর তো আরো বেশি করে দরকার।'

'দরকার হলে কলকাতাতে সব পাওয়া যায়।'

'আমি তো সব পেতে চাই না। আমার প্রয়োজন একজনের।'

'চাইলে এমন অনেক একজন পাওয়া যাবে।'

'আমি কলকাতার মানুষদের সঙ্গে কথায় পারব না। ও ব্যাপারে আমার কিছু ঘাটতি আছে।'

'কথা শুনে তা মনে হচ্ছে না। এ কদিনেই ঘাটতি পূরণ হয়ে গেছে অনেকটা।'

'তাই নাকি?' সুদর্শন অল্প শব্দ করে হাসে। হাসতে হাসতে লক্ষ্য করে দূরের টেবিল থেকে দুটি মেয়ে বারবার তাকাচ্ছে তার দিকে। সুদর্শন চোখ ফিরিয়ে নেয়। তার আগ্রহ উন্মুখ হয় না। বরং সমস্ত দুপুর ঠা ঠা রোদ্দুরে হেঁটে ঠাণ্ডা ছায়ায় বসার মত তৃপ্তি নিয়ে সে শুভার সঙ্গে কথা বলে চলে।

'শোনো', সুদর্শন হাসতে হাসতে বলে, 'এবার থেকে কিন্তু তোমায় মাঝে-মধ্যে আমি সত্যিই জ্বালাবো।'

'আপত্তি নেই। ও আমার অভ্যেস আছে।'

'মানে ?'

'মানে জানা আছে—ছেলেরা জ্বালাতে ভালবাসে।'

'আর মেয়েরা কি ভালবাসে ?'

শুভা প্রথমে উত্তর দেয় না। সুদর্শনের চোখের দিকে তাকায়। তারপর হেসে বলে, 'কোন কিছুই ভালবাসে না। কেননা মেয়েরাই বোধহয় খুব তাড়াতাড়ি বুঝতে পারে খাঁটি—ভালবাসা—ওই সোনার পাথর বাটির মত—হয় না।'

সুদর্শন থমকে তাকায়।

এক মুহূর্ত স্থির দৃষ্টি নিবদ্ধ পরস্পর। পর-মুহূর্তে সুদর্শন বলে, 'যা বললে তা কি তোমার নিজের কথা?' তুমি কি তাই ভাব?'

'তুমি ভাবো না?'

'তলিয়ে দেখিনি। হয়তো ভাবি। তবু—'

'তবু কি?'

'তবু মাঝে-মধ্যে মনে হয় না—ওই রকম বেশ একটা কিছু থাকা দরকার?'

'যা নেই তা থাকবে কেমন করে?'

'প্র্যাকটিকালি না হোক—ইমাজিনেশনে থাক।'

'তোমায় কিন্তু, সুদর্শন,—দেখলে তেমন ইম্‌প্রাকটিক্যাল মনে হয় না।'

'তোমায় দেখলে কি মনে হয় বল তো?'

'তুমিই বল।'

'মনে হয় তুমি যা বলতে চাও তুমি তা নও।'

শুভা কেমন চমকে ওঠে। অস্ফুট স্বরে বলে ওঠে, 'কি বলছ?'

সুদর্শন সামান্য শব্দ করে হাসে। বলে, 'এ কি, ওই রকম করে উঠলে কেন? আমি বলতে চাইছি—ঐ যে তুমি সোনার পাথর বাটি-টাটি বলছ, ওগুলো তোমার বাইরের কথা—ভেতরের কথা নয়।'

শুভার মুখের রেখা পাল্টে যায়। স্বাভাবিক হয়ে আসে। হাসির ইঙ্গিত আসে চোখে।

এবার শুভা বলে, 'তোমার কি মনে হয় ছেলে দেখলে আমি চিনতে পারি না?'

'কি ধরনের চেনার কথা বলছ?'

'এই—টাইপটা কেমন?'

'খুব অভিজ্ঞ মনে হচ্ছে?' সুদর্শন হাসে।

'তোমার সঙ্গে পাল্লা দিতে পারি।'

'দিয়ে ছাখো না একবার।'

'দিচ্ছি তো।'

'হয় না।' বলে সুদর্শন জলের গ্লাসটা তুলল।

শুভা বলল, 'কি হয় না?'

গ্লাসটা মুখের কাছে আনতে আনতে সুদর্শন বলল, 'সোনার পাথর বাটি।'

॥ বার ॥

ক্যাপ্টেন মালহোত্রার সঙ্গে কথা ছিল সন্ধ্যে ঠিক ছটার সময় দেখা করার। সুদর্শনের দেরি হলো।

দুপুরে অর্জুনের সঙ্গে দেখা হয়েছিল। মিনিবাসের ব্যাপারটা এগিয়েছে অনেকটা। কি দারুণ চালু ছেলে অর্জুনসিং বেদি। সুদর্শন ভাবে—কত পেছিয়ে আছে সে। আসলে চাই সুযোগ—আর সেই সুযোগকে কাজে লাগানোর মত সাহস। এই দুটো একসঙ্গে না থাকলে—সাকসেস অসম্ভব।

বিকেলের দিকে একবার মনে হয়েছিল হোটেলে ফিরে পোশাক বদলে আবার বেরোবে পার্ক স্ট্রিটের দিকে। তারপর মন বদলালো। গেল হাসপাতালে নিতাই খুড়োকে দেখতে। হাসপাতাল জায়গাটা তার সহ্য হয় না। খুব বাজে লাগে। সুন্দরী নার্স দেখতে মন্দ লাগে না। কিন্তু অ্যাট্‌মোসফিয়ারটা এমন—হাজার চার্ম থাকলেও কেমন ফালতু হয়ে যায়। তবু দেখা করতে গিয়েছিল সুদর্শন। কুড়ি মিনিটের ওপর ছিল ও নিতাই খুড়োর বিছানার সামনে দাঁড়িয়ে। খুব খারাপ লাগছিল। চলে আসার সময় কিছু টাকা তুলে দিয়ে এসেছিল সন্ধ্যার হাতে। সন্ধ্যার মা মারা গেছে অনেকদিন। ওই মেয়ের হাতেই সংসারের সবকিছু। ছোট মেয়েটা কোথায়? রোজ আসে না বুঝি?

হাসপাতালে আরো খানিকটা দেরি হতো যদি তাহলে আজ আর সুদর্শন পার্ক স্ট্রীট আসার কথা ভাবতো না। কিরকম যেন বাধো-বাধো ঠেকছিল। কিন্তু হাসপাতাল থেকে বেরিয়ে হোটেলের ঘরে ফিরে এসে আবার তার বার হতে ইচ্ছে করল।

এতো ভাবার কি আছে? শুভার চোখটা মনে এলো। কলকাতায় কেন এসেছে সে? পেতে—ছিনিয়ে নিতে। তাহলে?

আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে সে নিজেকে দেখতে দেখতে ভাবল প্রিন্স, তোমায় অনেক মজা লুটতে হবে। তুমি শ্লা ধর্মপুত্তুর যুধিষ্ঠিরের ক্যারেকটার সার্টিফিকেট নিতে কলকাতায় আসোনি। কলকাতা মানে—হয় মারো না হলে মার খাও। মাঝখানে কিছু নেই।

ভাবতে ভাবতে সুদর্শন প্যান্ট সার্ট পাল্টাতে শুরু করে। বেশ বানিয়েছে এটা।

ক্যাপ্টেন ঠিক সময়ে এসেই দাঁড়িয়েছিল। সুদর্শন একটু দেরি করে আসার পর, ক্যাপ্টেন ঘড়ির দিকে তাকিয়ে বলে, 'ফার্স্ট অ্যাপয়েন্টমেন্টই দেরি করা ঠিক হয়নি। আর দেরি নয়, ওই যে গাড়ি দাঁড়িয়ে আছে আমাদের। মিসেস শিভালকর বসে আছেন গাড়িতে। গাড়িতে উঠেই মিসেস শিভালকরের কাছে ক্ষমা চেয়ে নিতে হবে লেট হওয়ার জন্যে। আর মনে রাখবেন আপনাকে ইনট্রোডিউস করা হচ্ছে এইভাবে—আপনি এসেছেন চাকরির ব্যাপারে।

দুজনে বিশাল গাড়িটার কাছে এগিয়ে আসতেই ড্রাইভার দরজা খুলে দেয়।

ক্যাপ্টেন বসে ড্রাইভারের পাশে। সুদর্শনকে পেছনের সীটে বসতে বলে।

পেছনের সীটে মিসেস শিভালকর বসে আছেন। দেখলে বোঝার উপায় নেই বয়স পঁয়তাল্লিশ পেরিয়ে গেছে। সুন্দরী নয় মোটেই। যৌবনেও খুব একটা সুন্দরী ছিল বলে মনে হয় না। দামী কসমেটিক্সের জন্যে মুখের রেখায় একধরনের আভিজাত্য আছে।

মালহোত্রা পরিচয় করিয়ে দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সুদর্শন দেরি হওয়ার জন্যে দুঃখ প্রকাশ করে।

মিসেস শিভালকার হাসে। বয়স লুকোতে চাইলে অতিরিক্ত লাস্য দেখালে যে ভাবটা দেখায়—এখন সেটা শিভালকরের হাসিতে।

ন্যাকামোর খানিকটা এই আধিক্য দেখে সুদর্শন বুঝতে পারে—

তার চেহারাটা মহিলার পছন্দ হয়েছে। সুদর্শন জানে, জীবনে যে নারী বহু পুরুষ পরখ করেছে, সুদর্শনের ঝকঝকে দুটো চোখ, ভাঙা চোয়াল, পুরু ঠোঁট, আর একটু চাপা নাক—এ তো আকর্ষণ এড়ানো কঠিন।

এই প্রথম নজরেই সে বুঝতে পারে সাকসেস্ তার দিকে এগিয়ে আসছে। স্বপ্নলোকের চাবিটা যেন তার হাতেব মুঠোয় এসে যাচ্ছে।

সুদর্শনের ধারণা ছিল এই রকম অদ্ভুত পরিস্থিতির মধ্যে তার খুব অস্বস্তি লাগবে। কিন্তু গাড়িতে খুব সহজ হয়েই বসে সে। এমনিতেই তো খুব একটা বেশি কথা সে বলে না। এখন, ইংরেজিতে বলতে হচ্ছে বলে পরিমাণটা আরো কমে যায়। কিন্তু কোন রকম আড়ষ্টতা দেখা দেয় না। যেন এ ধরনের পরিস্থিতির সঙ্গে তার বেশ পরিচয় আছে।

বেশি কথা হয় না। কিছুক্ষণের মধ্যেই গাড়ি একটা বড় ম্যানসনের সামনে এসে দাঁড়ায়।

সুদর্শন গাড়ি থেকে নেমে দবজা খুলে দাঁড়ালে মিসেস শিভালকর নেমে আসেন।

ম্যানসনের চত্বরে দাঁড়িয়ে সুদর্শনের দিকে মুখ তুলে হেসে বলেন, 'য়্যু গট্ অ্যা লাভ্‌লি হাইট—ইয়ং ম্যান।'

সুদর্শন হাসে, খুব পস্ উচ্চারণে বলার চেষ্টা করে—'য়্যু লাইক ইট ?' তারপর মিসেস শিভালকরের সঙ্গে সঙ্গে সে লিফটের দিকে এগোয়।

ড্রাইভার আর মালহোত্রা পেছনে থেকে যায়।

মালটি স্টোরেড বিল্ডিং।

অ্যাপার্টমেন্ট গুণে শেষ করা যায় না।

আটতলায় এসে লিফট্‌টা থামে। ওরা দুজন লিফ্‌টের দরজা খুলে বেরিয়ে আসার পর, লিফ্‌টটা আবার নিচে নেমে যায়।

দু পা এগিয়ে ডান দিকের অ্যাপার্টমেন্টের দরজার সামনে গিয়ে বেল টিপতে দরজা খুলে যায়। একটি মেড সারভেণ্ট দরজা খোলে।

দরজা খুলে সে সুদর্শনকে দেখে নেয় একবার। যুবতী ঝি। ঝিটা এখন কি ভাবছে কল্পনা করে সে মনে মনে হাসে।

বড় বড় লোমওয়ালা সুন্দর একটা কুকুর ছুটে আসে ভেতর থেকে। তাদের সামনে লাফালাফি করে খানিকটা সময়। মিসেস শিভালকর তাকে কোলে নিয়ে আদর করে একটা সোফায় বসতে বসতে। সুদর্শনকে বসতে বলে সামনের সোফায়।

এত দামী জিনিসপত্তর দিয়ে সাজানো ঘর সুদর্শন সিনেমার পর্দায় ছাড়া আর কোথাও দেখেনি। সুদর্শন ভাবে, ঘরটা কি দু-এক-দিনের জন্যে ভাড়া নেওয়া। না—ওই কুকুর—ঝি। তার মানে সারা বছর ধরেই এটা থাকে মিসেস শিভালকরের জন্যে। কলকাতায় এলে এখানেই ওঠেন। কুকুরটাকে খানিকটা সময় আদর করার পর মিসেস শিভালকর উঠে দাঁড়ান। সুদর্শনকে ডাকে তার সঙ্গে আসার জন্যে। সুদর্শন বেশ সপ্রতিভভাবে তাকে অনুসরণ করে। সামনের ঘর পেরিয়ে তারা দুজন ভেতরের ঘরে যায়।

এটি শোওয়ার ঘর।

নরম গদির নিচু খাট। অল্প আলো। হাল্‌কা সবুজ আলো। ভনিতার কোন দরকার নেই তাহলে? ওই যে মালহোত্রা কি সব বলল—চাকরি-বাকরীর কথা। শালা দালালির আবার নক্সা কত!

ওরা দুজন ঘরে এসে বসার পর মেড সার্ভেন্টটি ড্রিঙ্কসের সরঞ্জাম দিয়ে চলে গেল। যাওয়ার সময় চোখের কোণ দিয়ে সুদর্শনকে দেখল আবার। সেই যে গেল আর এল না।

এই অ্যাপার্টমেন্ট, এই হাল্কা সবুজ আলোর নরম ভাব, মিসেস শিভালকর—সবই যেন স্বপ্নের মধ্যে থেকে ভেসে উঠছে, যেন কোনটাই সত্যি নয়।

সুদর্শন উঠে এসে বাইরের দিককার মস্ত জানলার সামনে দাঁড়ায়। জানলা দিয়ে বাইরের দিকে তাকায়। অন্ধকারের ওপর আলোর বিন্দু ছড়ানো শহরটাকে তার খুব অপরিচিত মনে হয়।

এই আটতলাই খুব বেশি উঁচু মনে হচ্ছে। একটু ঝুকতেই পায়ের পাতা থেকে একটা শিহরণ কেঁপে উঠে আসে শরীরের ওপর দিকে। এখান থেকে একটা লাফ দিলে ?

কথাটা মনে হওয়া মাত্র সুদর্শন ভাবে—হঠাৎ এ কি ভাবনা মনে এলো ? লাফিয়ে পড়বে কেন ? পরমুহূর্তে মনে হয়—এখন যদি ওই বিছানায় শুয়ে সে মিসেস শিভালকারকে খুন করে যায় ? সঙ্গে কি টাকা পয়সা আছে ? কোথায় আছে ? পালানো যায় না ? ওই যুবতী কাজের মেয়ে ছাড়া দ্বিতীয় আর কাউকে তো এই অ্যাপার্টমেন্টে পাওয়া গেল না। আচ্ছা—পুরো বাড়িটাই মিসেস শিভালকরের নয় তো। এখানে একটা ঘর পাওয়া যায় না ? ড্রাইভার আর মালহোত্রা কি নিচেই রয়ে গেল, না ওপরে এসেছে ?

আচমকা একটা স্টিরিও সাউণ্ডে সুদর্শনের ভাবনা ছিঁড়ে যায়।

মিসেস শিভালকর সুইচ টিপে দিয়েছেন। মিউজিক বাজতে শুরু করেছে। সুরটা ভারি চমৎকার।

আটতলায় এই উঁচু ঘরটায় ওই সুরটা কি নিচের দুনিয়া থেকে আলাদা করে দেয় ? সুরটা কি রক্তের মধ্যে রিমরিম করে—নেশা ধরায় ? সুরের তালে তালে একটা উত্তেজনা পাক খায়। পাত্রে ড্রিঙ্কস ঢালতে ঢালতে মিসেস শিভালকর বলে, 'কাম, ইয়ং ম্যান··· চিয়ার্স···'

পাশের ঘর থেকে সেই সুন্দর কুকুরটার চাপা ডাক শোনা যায়। সুদর্শনের মনে পড়ে একটু আগেই লোমশ কুকুরটাকে বুকে নিয়ে মিসেস শিভালকরের সোহাগ করার ছবিটা। যুবতী ঝিটা কোথায় গেল ?

সুরের ফাঁকে ফাঁকে, সুরের মধ্যে জড়িয়ে জড়িয়ে, ভেঙে ভেঙে কুকুরটা ডাকছে। ডেকে যাচ্ছে। কুকুরটা রাগছে। চেন দিয়ে আটকে দিয়েছে নাকি ? খুব আদুরে।

কথার দরকার পড়ে না। শরীর আলাপ করে। স্টিরিও সাউণ্ডকে

চিরে চিরে রাগে গজরায় কুকুরটা আরো কিছুক্ষণ। তারপর একসময় শব্দ থেমে যায়। অনেক শব্দের মধ্যে, অনবরত ওঠাপড়ায়…সুদর্শন হু হু করে নেমে যেতে থাকে।

অনেক্ষণ পর যুবতী ঝিটিকে আর একবার দেখা যায়। ট্রের ওপর শূন্য পাত্রগুলো তুলে নিতে নিতে সে সুদর্শনের দিকে তাকায় কিনা ঠিক বোঝা যায় না।

মিসেস শিভালকর তখন দামি সিগারেট ধরিয়ে গল্প শুরু করেছেন। মহিলার সঙ্গে কলকাতার যোগাযোগ অনেক কালের। ওর দিদিমা ছিলেন কলকাতারই মেয়ে। মিসেস শিভালকরের মা নাকি শান্তিনিকেতনে পড়াশোনা করেছিলেন। মার কাছ থেকে মহিলা শুনেছে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কত কি গল্প। দিদিমা আর মায়ের দৌলতেই খানিকটা বাংলা শিখেছে মিসেস শিভালকার।

'আমার মাদার ছিল একটা ট্যালেণ্টেড লেডি। বাংলা খুব ভাল লিখতে পারতো।' বলতে বলতে মহিলা সিগারেটের ছাই ঝাড়ে।

সুদর্শন মনে মনে বলে, তোমাকে দেখে ও কথা বিশ্বাস করা কঠিন। কিন্তু এমনভাবে তাকায়, মনে হয় প্রশংসা আর বিস্ময়ে কোন কথা যোগাচ্ছে না মুখে।

'তবে, আমি বড় দুঃখী মেয়ে, বুঝলে'—বলে ফরাসী কনিয়াক-এর পাত্রে ছোট্ট একটা চুমুক দিয়ে আবার মুখ তোলে মিসেস শিভালকার. 'তোমার নামটা কি যেন?'

'সুদর্শন সান্ন্যাল। এমনি সবাই আমায় 'প্রিন্স' বলে ডাকে।'

'ইয়া—প্রিন্স! আমার এক চ্যাম্পিয়ান ঘোড়া ছিল এই কলকাতার মাঠেই। ওর কথা মনে এলেই আমার চোখে জল এসে যায়। দেখতেও ছিল ওয়াণ্ডারফুল। যখন ছুটতো'—মিসেস শিভাল করের গলায় সত্যি সত্যি কান্না জড়িয়ে আসে।

সুদর্শন কথা বলে না। নতুন করে আবার স্টিরিও বাজতে শুরু

করে। সুরার টান আর চোখের জলে মাখামাখি হয়ে মিসেস শিভালকর গল্প শুনিয়ে চলে। মহিলার দুঃখে সহানুভূতি জানাতে সুদর্শন মুখ দিয়ে চুক চুক শব্দ করে।

টি-ভিতে ছবি দেখতে দেখতে সময় কেটে যায় অনেকটা।

রাত আরো গভীর হলে বিছানায় ডুবে যেতে যেতে মিসেস শিভালকর জানতে চায়, 'প্রিন্স, বলো—তোমার লাইফের কিছু ফ্যাক্টস—আই থিঙ্ক ইট উইল বি ভেরি ইণ্টারেস্টিং।'

'ইণ্টারেস্টিং হবে কি করে—আমি তো ক্যালকাটায় ছিলাম না—'

'তাতে কি—ইট ম্যাটার্স লিটল—বলো—টেল মি অ্যাবাউট দ্য গার্ল য়্যু সিডিউসড্ ফার্স্ট—হাই প্রিন্স—প্লিজ—ন্যারেট ইট—'

সুদর্শন মিসেস শিভালকরের চোখের দিকে তাকায়। বুঝতে পারে একটা কিছু শোনাতেই হবে মহিলাকে। এটাও তার এই পার্টটাইম চাকরির অঙ্গ।

সুদর্শন কায়দা করে বলে, 'আমি তো কাউকে সিডিউস করিনি। রাদার আই ওয়াজ সিডিউসড। আমার বয়স তখন মাত্র দশ।' বলে সুদর্শন শব্দ করে হাসে।

'তাই নাকি?' হাসতে হাসতে উদ্‌গ্রীব হয়ে ওঠে মিসেস শিভালকর। তবে চোখে মুখে উত্তেজনার রেখা কাঁপতে থাকে, 'বলো, প্রিন্স, ন্যারেট ইন ডিটেলস্।'

কুসুমকাকীর ঘটনাটা ছিল আঠারো বছর বয়সের। সুদর্শন যথাসাধ্য গুছিয়ে নন্দাদিদির গল্প বলে। সুদর্শনেব বয়স যখন মাত্র দশ বছর—তখনই নন্দাদিদি নাকি তাকে পুরুষ হতে শিখিয়ে ছিল।

নন্দাদিদিরা থাকতো মালদা টাউনে। সেবারে বড়দিনের ছুটিতে বেড়াতে যাওয়া হয়েছিল নন্দাদিদিদের বাড়ি। একদিন দুপুরে, দরজা জানলা বন্ধ করে, লেপের নিচে শুয়ে নন্দাদিদি তাকে ডেকেছিল। 'সুদা, আমার কাছে এসে শুয়ে পড়্—গল্প শোনাবো।'

শীতের সেই নির্জন দুপুরে নন্দাদিদির পাশে শুয়ে গল্প শুনতে শুনতে যখন একটু তন্দ্রা মতন এসেছে নন্দাদিদি বলেছিল, 'এই সুদা, ঘুমিয়ে পড়ছিস নাকি! ঘুমোস না—আয় একটা মজার খেলা খেলি।' বলতে বলতে নন্দাদিদি সুদর্শনের লম্বা দেহটাকে নিজের দিকে টেনে নিয়েছিল।

'কি মজা হবে?' বোকার মত প্রশ্ন করেছিল সুদর্শন।

'ছাখ্ না; কি রকম মজা পাবি।'

নন্দাদিদির কথামত সুদর্শন যা যা করেছিল, তাতে তার নিজের মজা খুব একটা ছিল বলে মনে পড়ে না। বরং, সে অবাক হয়ে লক্ষ্য করেছিল—যন্ত্রণায় কষ্ট পেলে মানুষ যেমন করে—নন্দাদিদির খোলা শরীরটা তেমন করে কাঁপছিল। নন্দাদিদি সুদর্শনের মুখের ওপর মুখ চেপে ধরেছিল, ঠোঁট কামড়ে ধরেছিল বারবার।

এরপর, নন্দাদিদি যখন খানিকটা শান্ত হয়ে এসেছিল, সুদর্শন খুব চাপা গলায় ধীরে ধীরে বলেছিল, 'নন্দাদিদি, তুমি যে বলেছিলে খুব মজা হবে?'

'তোর হয়নি। আমার হয়েছে। আর একটু বড় হলে তোরও হবে।'

এখন সুদর্শনের কাছ থেকে পুরো গল্পটা শুনে মিসেস শিভালকর উত্তেজনায় থির থির করে হাসতে থাকে। সুদর্শনকে জড়িয়ে সোহাগ করে। সুদর্শনের পুরুষ শরীরের তারিফ করে বারবার।

সুদর্শনও খুশি হয়।

খুশি হয় ওইভাবে আগাগোড়া গুছিয়ে গল্পটা বলতে পারায়। কেননা নন্দাদিদির ঘটনাটা তার জীবনের ঘটনা নয়। তবে পুরোপুরি গল্পটাও সুদর্শনের বানানো নয়। তার বন্ধুর থেকে শোনা। তা হলেও সেটাকে নিজের বলে চালানো—এমন চমৎকার করে বলা কি কম কথা!

রাতে আর হোটেলে ফেরা হল না।

সকালবেলায় অ্যাপার্টমেণ্ট ছেড়ে আসার সময় ক্যাপ্টেন মালহোত্রার সঙ্গে দেখা হল সুদর্শনের। পাওয়া টাকা থেকে খানিকটা দিতে হল লোকটাকে। ক্যাপ্টেন তার পিঠ চাপড়ে বলল, 'আজ তাহলে নিজেই চলে আসবেন—কথা হয়ে গেছে তো? 'আই থিঙ্ক নো প্রবলেম্।'

'এভরিথিং ও-কে?'

'ও-কে।'

সুদর্শন লিফ্‌টে করে নামতে থাকে।

॥ তেরো ॥

একটু বেশি যারা অনুভূতিপ্রবণ তাদের ভাবনাচিন্তার জটি বেশি। সেক্ষেত্রে জটিলতাকে সরল করা যায় না সহজে। বরং সরল করতে গিয়ে পাকিয়ে যায় আরো। তাই কখনো কখনো মনে হ এসব এড়িয়ে যাওয়াই ভাল। 'অন্বীক্ষা'র ছেলেমেয়েদের নিজস্ সমস্যাগুলোর মধ্যে অর্ণব তাই কখনো কখনো এগিয়ে যেতে চায় না অথচ না চাইলেও যেতে হয়। মাঝে মাঝে সেজন্যে অসহ্য মনে হ অর্ণবের। মনে হয় আর এসবের মধ্যে না থাকাই ভাল।

নাটকের দলকে ঠিক রাখতে গেলে কখনো কখনো প্রয়োজনে তুলনায় একটু বেশি কঠোর হতে হয়। অর্ণব যে কঠোর হয় না ত নয়, কিন্তু মূলত সে কোমল মনের মানুষ—তাই বেশি সময় সেই কঠোরতার আবরণের মধ্যে থাকাও তার পক্ষে সম্ভব হয় না মাঝখান থেকে তার নিজের মনের ওপর অত্যাচারটা হয়ে যায় বেশি রকমের।

উজ্জ্বল আর শক্তির মধ্যে বাইরে বাইরে এত বন্ধুত্ব থাকলেও ভেতরে ভেতরে চলেছে ঠাণ্ডা লড়াই। শিল্প সাহিত্য করে যার তাদের নিয়ে চলার এই একটা বিপদ। সেন্টিমেণ্ট বড় বেশি রকমে কাজ করে এখানে। 'অন্বীক্ষা'র সেক্রেটারী হিসেবে কখনো কখনে হয়তো উজ্জ্বলকে এমন সব ব্যবহার করতে হয় যা শক্তি পছন্দ করে না বা শক্তির পক্ষে মেনে নেওয়া সম্ভব হয় না। তাই প্রসঙ্গত দু-একট মন্তব্য করে ফেলে সে। আর মন্তব্য একবার করলে হল, কিছু ছেলে মেয়ে আছে যারা কথা কানাকানি করিয়ে একটা উত্তেজনা তৈরী করতে ভালবাসে। এর কথায় একটু রঙ চড়িয়ে ওর কাছে—আবার ওর কথায় একটু রঙ চড়িয়ে এর কাছে বলাবলি করে ঠাণ্ডা লড়াইটাবে

জিইয়ে রাখে। নেহাৎ দলকে টিকিয়ে রাখবার জন্যে কখনো কখনো অর্ণবকেও এর শিকার হতে হয়। আর তখনই তার মনে হয় এ সব-কিছু ছেড়ে-ছুড়ে দিয়ে কলকাতার থেকে দূরে কোথাও গিয়ে চাকরি নেয়।

কলকাতায় থাকলে তা হবে না। তার এই জন্ম শহরের হাওয়ায় এমন এক নেশা আছে যা অর্ণবকে কিছুতেই চুপচাপ নিভৃতে থাকতে দেবে না। এ তার শহরকে ভালবাসার মাশুল। এর থেকে সে মুক্তি পাবে না। মুক্তি পেলে সেই মুক্ত জীবনটা নিয়েও তো সে তৃপ্ত হতে পারবে না। তার কাছে স্বর্গও যে কলকাতার বিকল্প হতে পারে না।

রবিবার সকালে গৌতম এলো তার ফাইল সঙ্গে নিয়ে। একবার চা খাওয়া হয়ে গেছে। দ্বিতীয় পর্বের চা এলো গৌতম আসাতে।

ছেলেটা খুব পরিশ্রমী। বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষাগুলোতে ও যে বরাবর ভাল ফল দেখাতে পারছে তার মূলে আছে গৌতমের এই আশ্চর্য পরিশ্রম করার ক্ষমতা। মেধা ওর আর পাঁচটা সাধারণ ছেলের মতই।

অর্ণব পাতা উল্টে উল্টে দেখছিল।

'১৪৯৮ সালে বিপ্রদাস পিপিলাই তাঁর মনসা মঙ্গলে উল্লেখ করেছেন গঙ্গার দু পাড়ে ছোট ছোট কুটিরের কথা। তিনি কলিকাতা নামটিও উল্লেখ করে গেছেন।

১৬৯১ সালে সুতানটি (বাগবাজার, শোভাবাজার) অঞ্চলে জব চার্ণক এক কুটি বানালেন। গঙ্গার-পাড়ে এই জায়গাটা লম্বায় তিন মাইল আর চওড়ায় দেড় মাইল।......

গোড়ায় কলকাতার শহর পত্তনের ছোট্ট একটা ইতিহাস দিয়ে নিয়েছে গৌতম। তারপর এসেছে নিজের জায়গার আলোচনায়। পার্ক স্ট্রীটের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস শুরু এরপর। কদিন ঘুরে ঘুরে মোট উনপঞ্চাশটি পরিবারের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছিল সে, নমুনা পর্যবেক্ষণ

বিশেষে। 'এ অঞ্চলটায় থাকে সমাজের সুবিধাভোগী শ্রেণীরা—বেশির ভাগই অবাঙালী। উনপঞ্চাশটার মধ্যে দশটি পরিবার পশ্চিমবঙ্গের। অন্যান্যরা এসেছে—গুজরাট, পাঞ্জাব, আসাম, মাদ্রাজ—এমনকি আরব দেশ কিংবা খোদ বিলেত থেকে আসা পরিবারও আছে। তাদের উপার্জন ক্ষমতা এক লক্ষ থেকে ত্রিশ লক্ষ পর্যন্ত প্রতিমাসে। এইসব পরিবারের অধিকাংশেরই কর্মস্থল ডালহৌসি এবং তার চারি পাশে। উনপঞ্চাশটি পরিবারের মধ্যে বত্রিশটি পরিবারের নিজস্ব গাড়ি আছে, বাকিরা ট্যাক্সি কিংবা অফিসের গাড়ি ব্যবহার করে। সমস্ত কলকাতা যখন ঘুমিয়ে পড়ে, সেই গভীর রাতেও পার্ক স্ট্রীট জেগে থাকে তার বিদেশী গান, নাচ, যুবক-যুবতীদের হাসির শব্দ। একে তুলনা করা যেতে পারে লণ্ডনের পিকাডেলির সঙ্গে।'

ফাইল থেকে চোখ তুলে অর্ণব বলল, 'তোমার আলোচনার বিষয়টা ছিল পার্ক স্ট্রীটের যানবাহন সমস্যা?'

'হ্যাঁ—এই পেপারটায় তো তাই ছিল। এখন আমি এটার সাহায্য নিয়ে বাংলায় একটা লেখা লিখতে চাই—যাতে অর্থনৈতিক-সামাজিক সমস্যাটা থাকবে।'

'তাহলে তো তোমায় আরো ডেটা যোগাড় করতে হবে।'

'করছি। ইংরেজিতে মোটামুটি একটা খাড়া করে দেব। সমস্যা হল পড়তে ভাল লাগে এমন বাংলায় লেখা।'

তনয়া বাজার করে ফিরল এই সময়।

তনয়ার পেছনে পেছনে সুদর্শনকে আসতে দেখে অর্ণব হেসে বলল, 'ওকে কোথা থেকে ধরে আনলে?'

তনয়া কিছু উত্তর দেওয়ার আগেই সুদর্শন বলল, 'আমাকে ধরে আনতে হয়নি—আমিই বরং তনয়াদিকে ধরে আনলাম।'

তনয়া বলল, 'দেখেছো—এই কদিনে কেমন কথা শিখেছে!'

অর্ণব বলল সুদর্শনকে, 'কোথা থেকে ধরে আনলে?'

'রাস্তায় এক ভদ্রমহিলার সঙ্গে অ্যায়সা গল্প করছিলেন—আমি না টেনে আনলে অন্তত আরো আধঘণ্টা।'

তনয়া অর্ণবকে বলল, 'কমল চক্রবর্তীর স্ত্রী—রানুদির সঙ্গে—অজয়দার কথা বলছিলাম—ওর কিরকম দূর সম্পর্কের আত্মীয় হয় তো।'

'তা তো হয় জানি—কিন্তু মারা যাবার পরও একবার তো যাওয়ার সময় পেল না।' অর্ণবের স্বরে বিরক্তি ফুটে ওঠে।

তনয়া গৌতমের দিকে চেয়ে বলে, 'তুমি কতক্ষণ? সুদর্শনের সঙ্গে তো আলাপ নেই তোমার?'

অর্ণব পরিচয় করিয়ে দেয়।

তনয়া ভেতরে চলে গেল। গীতা আজ তাড়াতাড়ি চলে যাবে।

আজও তার মেয়ে দেখানো আছে।

'তোমার মিনিবাসের কতদূর?' অর্ণব প্রশ্ন করে সুদর্শনকে।

'ওই নিয়েই তো আছি সারাদিন—ছোটাছুটি করছি।'

গৌতম জানলা দিয়ে বাইরের দিকে তাকিয়ে বলল, 'এই সকালেই আকাশের অবস্থা দেখেছেন? রোববারটা পুরো মাটি করবে দেখছি।'

সকাল থেকেই মেঘলা মেঘলা ছিল। এখন দেখতে দেখতে ঘন মেঘে ছেয়ে গেছে আকাশ। গাঢ় কালো মেঘ। গ্রীষ্মকালে এমনটা হয় না বড় একটা!

'তেড়ে কিছুটা বৃষ্টি হয়ে গেলে ভাল হয়। যা গরম যাচ্ছে কদিন! একটু না ঠাণ্ডা হলে চলছে না।' সুদর্শন মন্তব্য করে।

গৌতম আকাশের দিকে তাকিয়ে খানিকটা উদ্বিগ্ন হয় বোধহয়। বলে, 'যা অবস্থা দেখছি—কিছুক্ষণের মধ্যেই নামবে বোঝা যাচ্ছে। আজ বরং আমি চলি অর্ণবদা। সামনের রোববার আসবো। এর মধ্যে আপনি পড়ে রাখবেন পুরোটা।' বলতে বলতে গৌতম উঠে পড়ে। সুদর্শনের দিকে তাকিয়ে বলে, 'চলি। আজ আপনার সঙ্গে আলাপ

হলো না ভাল করে। আপনাকে যেন কোথায় দেখেছি দেখেছি মনে হচ্ছে।'

অর্ণব বলে, 'ওকে যদি কলকাতায় দেখে থাকো তো অল্প কিছুদিনের মধ্যেই দেখেছো। এর আগে তো ও ছিল নর্থ বেঙ্গলের প্রিন্স। হালে কলকাতা জয়ে এসেছে।'

হালকা গলায় কথাটা বলে অর্ণব সুদর্শনের দিকে তাকায়।

সুদর্শন চুপ করে থাকে না। জবাব দেয়। বলে, 'কি যে বলেন অর্ণবদা—আপনাদের মতন হাইলি কোয়ালিফায়েড লোকেরা এতো বছর ধরে ট্রাই করেও কলকাতা কঙ্কার করতে পারল না আর আমি কিনা জিতে নেবো বলছেন।'

'তোমার হিসেবে ভুল হয়ে গেল সুদর্শন। আমরা তো কলকাতা জয় করতে আসিনি। এ তো আমাদেরই শহর, জয় করার কোন প্রশ্নই ওঠে না।'

'আপনাদের সঙ্গে কথায় আমি কোনকালে পারব না অর্ণবদা, এ তো আমি রিপিটেডলি কনফেস্ করছি।'

গৌতম চলে যাওয়ার আগে জিজ্ঞাসা করে সুদর্শনকে, 'আপনি কি 'অন্বীক্ষা' গ্রুপে নাটক করছেন?'

সুদর্শন কিছু উত্তর দেওয়ার আগে অর্ণব বলে, 'ওকে দেখে কি তোমার নাটকের লোক বলে মনে হয়? না—ফিল্মের হীরো ভাবতে ইচ্ছে করে? ওর জায়গা হচ্ছে ফিল্ম—প্রথমে কলকাতায় একটা ছুটো—তারপর সোজা বোম্বাই। সেখানে প্রিন্স রীতিমত পাল্লা দিতে পারবে।'

সুদর্শন বলে, 'অর্ণবদা আজ অন্যরকম মুডে আছেন মনে হচ্ছে।'

গৌতম হেসে বলল, 'অর্ণবদাকে তাহলে আসল মুডে দেখেননি।' চলি অর্ণবদা,—তনয়াদিকে বলে দেবেন।'

গৌতম চলে যায়।

সুদর্শন গৌতম আর অর্ণবের নিঃস্ব চায়ের পেয়ালার দিকে

তাকিয়ে বলে, 'চা হয়ে গেছে দেখছি।' বলার মধ্যে দিয়ে সুদর্শন বেশ ঘরোয়া হওয়ার চেষ্টা করে। উজ্জ্বল যেমন করে।

অর্ণব আগের হাসিটা অক্ষুণ্ণ রেখে বলে, 'আরো দেখবে—একটু অপেক্ষা কর।'

বেশিক্ষণ অপেক্ষা করতে হল না। নিজে চা তৈরী করে, ট্রেতে সাজিয়ে নিয়ে আসে তনয়া। কাপ এগিয়ে দিয়ে বসতে বসতে বলে অর্ণবের দিকে তাকিয়ে, 'প্রিন্স দুঃখ করছিল—এখনো পর্যন্ত আমাদের একটাও শো দেখল না বলে।'

'কেন? দেখেছে তো—শিলিগুড়িতে বসেই দেখেছে।'

'সে তো আগের দেখা।' বলে তনয়া একবার সুদর্শনের দিকে তাকিয়ে হেসে নেয়, 'এখন কত নতুন ছেলেমেয়ে এসেছে—তাদের অভিনয় তো ও দেখেনি।'

'এ মাসে তো একটাই শো।' বলার সময় অর্ণব দেওয়ালের ক্যালেণ্ডারের দিকে তাকায়।

'এটাতে আবার শুভা নেই।'

সুদর্শন জিজ্ঞাসা করে, 'শুভাকে আপনি নাকি রেস্ট নিতে বলেছেন?'

'ঠিক আমি বলিনি। ডাক্তারী পরামর্শ। শুভা তোমায় বলেছে নাকি?'

'হ্যাঁ। কথায় কথায় বলছিল সেদিন।'

তনয়া জানতে চাইল, 'তোমার সঙ্গে দেখা হয়েছে এরমধ্যে?'

'হ্যাঁ। ওই যেদিন আপনারা শ্মশানে গেছিলেন—অজয় চৌধুরী মারা যেতে।'

'হ্যাঁ। শুভা তো সেদিন থাকেনি বেশিক্ষণ। ওর শরীর ভাল ছিল না। তোমার সঙ্গে দেখা হল কোথায়?'

'রাসবিহারীর মোড়ে।' সুদর্শন অল্প মিথ্যে বলল। তারপর কাপে দুটো চুমুক দিয়ে নিয়ে জিজ্ঞাসা করল আবার, 'ওর অসুখটা কি?'

সুদর্শনের প্রশ্নে তনয়াও তাকায় অর্ণবের দিকে।

অর্ণব খানিকটা সময় নিয়ে বলল, 'ডক্টর পালিত আমায় স্পষ্ট করে কিছু বলেননি। তবে শুভার শরীরের অবস্থা যে রীতিমত খারাপ সে কথা বলেছেন বারবার। লো-প্রেসার আছে।'

তনয়া বলে, 'আমি তো ওকে কবে থেকে বলে আসছি—শুভা আগে নিজের শরীরটা দ্যাখো—তুমি বিছানায় পড়লে তোমার ফ্যামিলিকে দেখার কেউ থাকবে না। শরীরের দোষ কি। এভাবে অতিরিক্ত পরিশ্রম করলে—হবে না।'

অর্ণব বলে, 'মেয়েটা এতো ভাল। গ্রুপের প্রতিটি ছেলেমেয়েকে এমন আপন করে ভালবাসে—অথচ'—অর্ণব কথাটি আর শেষ করে না।

'গ্রুপে এই রকম মেয়ে দরকার। সব মেয়ে তো সবার সঙ্গে মানিয়ে চলতে পারে না। এমনিতেই তো মেয়েরা একটু গণ্ডগোলে। সেদিক থেকে শুভার তুলনা হয়না। যতটা পারে অন্যকে সাহায্য করে—ওকে সাহায্য করার লোকেরই অভাব।'—তনয়া বলে যায়।

অর্ণব তনয়ার মুখের দিকে তাকায়। একটু খুঁটিয়ে লক্ষ্য করে। অর্ণব তনয়ার কণ্ঠস্বর থেকে তার মনের গতিটা আঁচ করতে পারে। সুদর্শনের কাছে এসব বলার কি দরকার। তনয়া কি চায় শুভার জন্যে সুদর্শনের আগ্রহ বাড়ুক ? সুদর্শন সম্পর্কে তনয়া কি হিসেব করেছে !

অর্ণব সুদর্শনকে জিজ্ঞাসা করে, 'শিলিগুড়ির খবর কি ? বাড়িতে চিঠিপত্র কি একেবারেই লিখছ না ?'

'লেখার মতো কিছু না হলে লিখে কি হবে।' বলে সুদর্শন প্রসঙ্গটা এড়িয়ে যায়।

তনয়া হেসে বলে, 'লেখার মত কিছু হলেও যে তুমি বাড়িতে জানাতে ব্যস্ত হবে—তা তো নয়। কলকাতায় এসে পৌঁছানোর পর না না করেও অনেকদিন কাটল—এরমধ্যে চিঠি পাঠাবার মতো কোন কিছুই ঘটল না—তাকি হয় ?'

'গতকাল তোমার দাদার একটা চিঠি এসেছে।'

অর্ণবের কথা শুনে সুদর্শন তার মুখের দিকে তাকায়। অর্ণবের মুখ দেখে চট্ করে কিছু আঁচ করে নেওয়া যায় না। এমনিতেই তো বেশির ভাগ সময় চোখেমুখে একটা সিরিয়াস ভাব থাকে। তাই আলাদা করে কিছু বুঝে নেওয়া শক্ত। চিঠি এসেছে তো এসেছে। বলার মত খবর আছে কি কিছু? অর্ণবদা চুপ করে গেল কেন? আমার আগ্রহ লক্ষ্য করছে? বাড়ির ব্যাপারে আমি লিস্ট ইন্টারেস্টেড। আর আমার ইম্পর্টেন্ট ঘটনা? মালহোত্রা? মিসেস শিভালকর? নাকি শুভা। দূর—শুভা আবার ঘটনা হল কোথায়—শুভা ঠিক ঘটনা হওয়ার নয়। তাহলে? তাহলে কি?

'কি লিখেছে দাদা?' সুদর্শনের তেমন একটা কৌতূহল না থাকলেও জানতে চায়, 'আমার সম্পর্কে যাতা লিখেছে তো।'

'না। যাতা লিখবে কেন?' তনয়া বলে, 'তুমি যা—তাই লিখেছে।'

অর্ণব ধীরে ধীরে বলে, 'খুব ঘা খেয়েছে বেচারা। জানোইতো তোমার দাদার মনটা একটু বেশি রকমের নরম।'

'আমার সঙ্গে দাদার কিছুই মেলে না অর্ণবদা।'

'হ্যাঁ, তোমাদের সঙ্গে আমাদের অনেক কিছুই মেলে না তো।' অর্ণব অল্প হাসির আভা রেখে কথাটা বলে নেয়।

অল্প পরে তনয়া উঠে ভেতরে চলে যায়। অর্ণব সিগারেট ধরায়। সুদর্শন খবরের কাগজের খেলার পাতায় চোখ রেখে ভাবে—কারো সঙ্গেই কারো মেজাজ মেলে না। ক্যাপ্টেন মালহোত্রা কিংবা মিসেস শিভালকর—কারো সঙ্গে সে নিজেকে মেলাতে পারল কি? পরের সন্ধ্যেয় যাবার কথা দিয়ে এসেও যায়নি সুদর্শন। কি যে হল শেষ পর্যন্ত কিছুতেই আর যাওয়া হল না সেই আটতলার ফ্ল্যাটে। এমনকি কম বয়সী সেই মেড সার্ভেন্টটির দেহটা বারবার মনে পড়ার পরও

ঠিক করল যাবে না কিছুতেই। কেন গেল না? গেলে কি হতো? শুভার সঙ্গে দেখা করতে ইচ্ছে করছিল? কিন্তু শুভাকে তখন পাবে কোথায়? অম্বীক্ষার রিহার্সাল রুম ছাড়া শুভার সঙ্গে যোগাযোগ করার আর পথই বা কই!

অর্ণব আবার আগের মত ধীরে ধীরে বলে, 'আজ আমি উত্তর লিখবো তোমার দাদাকে।'

'আমার সম্পর্কে কিছু লিখবেন না। জানেন তো এমনিতে একটু নার্ভাস টাইপ আছে।'

'জানি। তোমার দাদাকে তো আমি অনেক দিন চিনি।'

সুদর্শন চুপ করে থাকে। মাঝে তনয়া এসে নিজে খালি কাপ প্লেটগুলো নিয়ে যায়। আর ঠিক তারপরই উজ্জ্বল এসে পড়ে। ঢুকেই বলে, 'আসেনি তো?'

'আসার কথা ছিল নাকি?' অর্ণব জানতে চায়।

উজ্জ্বল বসতে বসতে বলে, 'বলেছিল পারলে আসবে একবার।'

'পারে নি বোঝা যাচ্ছে।'

'তাই তো দেখছি' বলে সুদর্শনের দিকে তাকিয়ে বলে, 'আপ'ন কতক্ষণ, প্রিন্স।'

'বেশিক্ষণ নয়। এককাপ ধ্বংস করেছি মাত্র।' বলে সুদর্শন বেশ কায়দা করে হাসে। হাসতে হাসতে উজ্জ্বলের মুখ খুঁটিয়ে ছাখে। শুভার সঙ্গে উজ্জ্বলের সম্পর্কটা কি একটু অন্য রকম? গ্রুপের আর সকলের থেকে আলাদা কি?

'অর্ণবদা' উজ্জ্বল বলে, 'আমি তো তাহলে খুব বিপদে পড়ে গেলাম এখন। শুভাকে ছাড়া আর কোন নায়িকার কথাতো আমি ভাবিইনি।'

'তুমি কি বলো, ডাক্তার পালিতের বলার পর আমাদের দিক থেকে কি আর উচিত হবে—ওকে কোন রকম জড়িয়ে ফেলা। কিছু দিন ওর টানা বিশ্রাম খুবই দরকার।'

'আপনি তাহলে একটা সাজেসন্ দিন—শুভার জায়গায় কাকে নেওয়া যায় তাহলে। আমাদের অফিস ফাংসনের আর মাসখানেক বাকি।'

'বীথিকে নিতে পারো। ইদানিং বেশ ভাল অভিনয় করছে মেয়েটা। তোমার সঙ্গে মানায়ও ভাল।'

'কিন্তু বীথির সঙ্গে, জানেন তো, শুভার একটু'—

'জানি। কিন্তু এ তো তুমি ইচ্ছে করে করছো না—দায়ে পড়ে নিচ্ছো ওকে—সেটুকু শুভা বুঝবে। তুমি ওকে বুঝিয়ে বোলো।'

'না—না—আমি বললে হবে না। আপনি বলবেন। অন্যসব ব্যাপারে আমি ওর সঙ্গে কথা বলতে পারি। অভিনয়ের ব্যাপারটা এতো ডেলিকেট—তার ওপর আবার আমার অপোজিটেই এ্যাকটিং সো।'

উজ্জ্বলের কথা শুনতে শুনতে সুদর্শনের ভাবনাটা আরো পাক খেতে থাকে। শুভার সঙ্গে আজ দেখা করতে হবে। আজ রিহার্সাল আছে তো? শুভা আসবে তো রিহার্সালে? অর্ণবদাকে জিজ্ঞাসা করব একবার? না, সেটা ঠিক হবে না। উজ্জ্বলকে একা পেলে জেনে নেওয়া যেত। শুভাকে নিয়ে এরা তিনজনেই বেশ চিন্তিত দেখছি। মেয়েটার মধ্যে সত্যিই কি যেন একটা আছে।

অন্য দুজন একটা বিষয় নিয়ে কথা বললে ঘরের তৃতীয় জনের চুপচাপ বসে থাকা কারো কারো পক্ষে যেমন স্বাভাবিক, কারো কারো পক্ষে তেমনি অস্বাভাবিক রকমের অস্বস্তিকর। সুদর্শনের পক্ষে যেমন। অর্ণব আর উজ্জ্বলের কথার মধ্যে তার বলার কিছু নেই। তবু একটা কিছু বলার জন্যেই যেন সে বলে, 'আচ্ছা, অর্ণবদা—একটা শো করার জন্যে ফিমেল ক্যারেকটাররা কত টাকা নেয়?'

'সবাই সমান নেয় না। কেন বলো তো?'

'এর থেকে বাংলা ফিল্মে সাইড এ্যাকটিংএ তো বেশি টাকা।'

'সবক্ষেত্রে নয়। বাংলা ছবির হালতো ভাল নয়।'

'আমার একজন পাঞ্জাবী বন্ধু—সেই অম্বরের থ্রুতে পরিচয়—সে একটা বাংলা ফিল্ম প্রোডিউস করতে যাচ্ছে—আমি তাকে শুভার কথা বলেছি। এদিকে শুভার সঙ্গে তো চট্ করে যোগাযোগ করতে পারছি না।'

'শুভাকে পেতে চাইলে আজ আমাদের রিহার্সাল রুমে চলে আসুন। আজ সকালে এখানে ওর আসার কথা ছিল। এখানে আসেনি যখন রিহার্সলে আসবে ঠিক।' উজ্জ্বল জানায়।

'আমার যেতে হয়তো একটু দেরি হবে। একটা কাজ মিটিয়ে যাবো।'

'বেশ তো—তাই যাবেন। আমি ওকে বলে রাখবো।' চমৎকার সাজিয়ে কথা বলতে পারায় সুদর্শন খুব খুশি হলো।

॥ চোদ্দ ॥

দেখা হল। একটু বেশি করে খুঁটিয়ে দেখল আজ। এক নজরে যতটা ভাল লাগে, তার চেয়ে আরও বেশি ভাল লাগে খুঁটিয়ে দেখলে। চোখের কোলে ক্লান্তিটা চিনতে দেরি হচ্ছে না আজ। মুখের রেখায় উদ্বেগ আর অশান্তি। হাসলে সব ধুয়ে যায়। আড়ালে চলে যায়। তাকিয়ে থাকতে ইচ্ছে করে তখন। অনেকক্ষণ তাকিয়ে থাকতে ইচ্ছে করে।

'তোমার সঙ্গে আজ আমার কয়েকটা কথা আছে—সময় হবে তো?' সুদর্শন নামানো গলায় বলে রাখে।

'তাহলে একটু তাড়াতাড়ি বেরবো এখান থেকে। আজ তো আমার কোন রিহার্সাল নেই।'

আজ মহড়া ঘর থেকে বেরিয়ে ট্যাক্সি না নিয়ে সুদর্শন হাঁটতে শুরু করল। শুভা আস্তে হাঁটে। পাশাপাশি চলতে চলতে সুদর্শন বলে, 'তুমি কি নাটক করা ছেড়ে দিচ্ছ?'

'কে বললে ছেড়ে দিচ্ছি। নাটক ছেড়ে দিলে আমি কি নিয়ে বাঁচবো? তবে ডাক্তারী পরামর্শে কিছুদিন খানিকটা বিশ্রামে থাকতে হবে। নইলে গোলমাল বাঁধতে পারে—মানে শরীর গোলমাল বাঁধাতে পারে। ওটা আমার আয়ত্তের বাইরে যেতে যেতে একেবারেই হাতছাড়া হয়ে গেছে।'

'অফিস ক্লাবে আর করছো না?'

'একেবারে না করলে আমার চলবে কি করে? আমার কি আর বসে খাবার উপায় আছে?' খুব পরিচিত বন্ধুর মত অন্তরঙ্গ গলায় বলে শুভা।

পথটায় লোক চলাচল কম। বড় বড় বাড়ি পরপর।

পাশাপাশি হাঁটতে ভাল লাগে সুদর্শনের। শুভা কি আজ সেণ্ট মেখেছে! এতোক্ষণ টের পাওয়া যাচ্ছিল না তো।

ওহ্, না—ওটা ফুলের গন্ধ। সামনের বাড়িটার লোহার গেটের কাছটায় দেখা যাচ্ছে লম্বা গন্ধরাজের গাছটা। ফুলে ফুলে ছেয়ে সাদা হয়ে আছে। দু দণ্ড দাঁড়িয়ে যেতে ইচ্ছে করে।

'উজ্জ্বলদের অফিসে নাটক করার কথা ছিল?'

'ছিল কেন—এখনো আছে তো! আমি অবশ্য এবার টাকাটা একটু বেশি চেয়েছি। উজ্জ্বল অফিসে কথা বলে জানাবে বলেছিল। আজ তো আমরা তাড়াতাড়ি বেরিয়ে এলাম—জানা হলো না। কিন্তু এ খবরটা তুমি জানলে কি করে?'

চলতে চলতে শুভা সুদর্শনের মুখের দিকে তাকিয়ে নেয় একবার।

'আজ সকালে অর্ণবদার বাড়ি গেছিলাম—তখন শুনলাম।'

'কি শুনলে?'

'তুমি করছো না।'

'অর্ণবদা বললেন?'

'তোমাকে না নিতে বললেন উজ্জ্বলকে।'

'হ্যাঁ। আমাকেও তো বলেছেন—একেবারে রেস্টে থাকতে।'

'তোমার বদলে আর একজনকে নেওয়ার কথা বললেন অর্ণবদা।

'কাকে?'

'কি—বীথি না কি যেন—'

'বীথি? বীথির কথা বললেন অর্ণবদা?' শুভা দাঁড়িয়ে পড়ল।

'হ্যাঁ। উনি তো প্রেইজ করলেন তার অ্যাক্টিং-এর।'

'কক্ষনো নয়।'

'নয় মানে? তা না হলে আমি জানলাম কি করে বলো।' আমি তো এ লাইনের কাউকেই চিনি না বলতে গেলে।'

'উজ্জ্বল? শুনে উজ্জ্বল কি বলল?' শুভার কণ্ঠস্বর কেমন যেন

অস্বাভাবিক হয়ে এলো।

'উজ্জ্বলও রাজি হলো সে কথায়। শুধু—'

'শুধু কি? প্লীজ কিছু লুকিয়ো না—'

'না না, লুকোবো কেন? লুকিয়ে আমার লাভটা কোথায়? উজ্জ্বল একবার খালি বলতে চেয়েছিল—তোমার সঙ্গে ওই বীথি নামের ভদ্রমহিলার বেশ খটাখটি আছে—'

'তারপরও ওরা ঠিক করলো—আমার বদলে বীথিকে নেওয়া হবে?' শুভার গলার স্বরে কাঁপন এসে যায়।

'সেরকমই তো কথা হলো।' বলে সুদর্শন শুভার চোখ লক্ষ্য করল।

কেমন একটা অস্ফুট শব্দ উচ্চারণ করল শুভা। তারপর চুপ। নিঃশব্দে পাশাপাশি হাঁটা হলো খানিকটা পথ।

'এদিকটায় তো কখনো আসিনি।' সুদর্শন চুপচাপ অবস্থাটা ভাঙার জন্যে বলে, 'বোধহয় ওইদিকটায় লেক তাই না?'

'হ্যাঁ। এই রাস্তাটা সোজা গেছে—'

'এটা দিয়ে গেলেই তো হয়—'

'না। ওদিকে যাবো না।'

'কেন? বসে খানিকটা কথা বলা যেত।'

'অন্য কোথাও চলো। আমার আর হাঁটতে ইচ্ছে করছে না।'

'তাহলে—পুরোনো জায়গাতেই যাই—মানে কোয়ালিটিতে—'

শুভা হ্যাঁ-না কিছুই বলে না।

ট্যাক্সি পাওয়ার জন্যে আরো খানিকটা হাঁটতে হয় দুজনকে।

রেস্টুরেন্টে এসে মুখোমুখি বসার পর, শুভার মুখ আরো স্পষ্ট করে লক্ষ্য করে সুদর্শন। কেমন শক্ত হয়ে আছে। ক্ষোভে চোখে জল আসতে চাইছে বুঝিবা। সুদর্শন কি বলবে ভেবে পায় না। ওই সামান্য একটা কথাতেই এমন অস্থির হয়ে উঠল কেন শুভা?

অভিমান হলো ? কার ওপর ? উজ্জ্বল, না অর্ণবদা ? নাকি দুজনের ওপরই ?

'আমার মনে হয়', সুদর্শন সান্ত্বনা দেওয়ার ভঙ্গিমায় বলে, 'উজ্জ্বল ব্যাপারটা ফাইনাল করার আগে তোমার সঙ্গে একবার কথা বলে নেবে।'

শুভার কোন উত্তর নেই।

'ওরা দুজনেই তোমাকে নিয়ে বেশ চিন্তিত।'

'আর আমার নিজের বুঝি কোন চিন্তা নেই।' হঠাৎ ক্রোধের স্বর লাফিয়ে ওঠে শুভার গলায়, 'আমার কতটুকু জানে ওরা ? রেস্টে থাকার অবস্থা থাকলে আমি থাকতাম না ?' ক্ষোভে গলার স্বর আটকে আসে তার, 'সব সমান। যতক্ষণ কাজে লাগবে ততক্ষণ আদর—তারপর ছুঁড়ে ফেলে দাও—'

'না না, এভাবে চিন্তা করো না—'

'আমি চিনে নিয়েছি। এই বয়সটার মধ্যে আমায় অনেক কিছু চিনে নিতে হয়েছে।'

'কিন্তু ওরা তো তোমার শরীরের কথা ভেবেই—'

'আর আমায় ওসব বোলো না। আর আমার কিছু ভাবতে ইচ্ছে করছে না। কপালে যা আছে হবে।'

শেষের কথাটায় শুভার গলায় কান্না জড়িয়ে আসে।

সুদর্শন কি বলবে ভেবে পায় না। অস্বস্তি লাগে।

ওয়েটার এগিয়ে এলে কোল্ড ড্রিঙ্কস্-এর অর্ডার দিয়ে সে আবার ঝুঁকে পড়ে শুভার দিকে।

'তোমাকে একটা কথা বলার ছিল।'

সুদর্শনের গলার আন্তরিকতায় শুভা চোখ তুলে তাকায়।

'বল।'

'তুমি যদি আমায় রিয়্যালি ফ্রেণ্ড মনে কর—তাহলেই বলতে পারি।' একটু সঙ্কোচ থাকে তার কথায়।

'আমি তো, যেদিন তোমার সঙ্গে প্রথম আলাপ হলো সেদিন থেকেই তাই মনে করছি। বাকিটা তোমার ওপর তোমায় তো আগেই বলেছি কোন ছেলের সঙ্গে আমার এই সম্পর্কটাই সবচেয়ে ভাল লাগে। যদিও ভাল লাগলেও পাওয়া যায় না। একটা ছেলে আর একটা মেয়ে এক সঙ্গে হলেই অমনি একটা স্বার্থ জড়িয়ে যায় তাদের মধ্যে। তোমাকে আমি তার বাইরে দেখছি।'

'উজ্জ্বলকে ?'

'উজ্জ্বলের মধ্যে বন্ধুর চেয়ে ভাই-এর ভাবটাই বেশি। যেমন অর্ণবদাকে দেখেছি একেবারে নিজের দাদার মত করে। এতদিন ধারণা ছিল ওরাও আমায় সেই চোখেই দেখেছে। এখন সব কেমন গোলমেলে মনে হচ্ছে।'

'ব্যাপারটা এভাবে নিও না।' সুদর্শন সিগারেট ধরায়।

একটু চুপ থেকে শুভা বলে, 'কি বলবে বলছিলে ?'

'বলছিলাম', খুব ধীরে ধীরে বলে সুদর্শন, 'তুমি তো এখন খানিকটা মানিটারি ক্রাইসিসে আছো…'

শোনামাত্রই শুভার মুখের রেখা কঠিন হয়ে আসে।

'আমায় হেল্প করতে চাও—এই তো ?' আচমকা বলে শুভা। গলার স্বরে তিক্ততা ফুটে ওঠে। হঠাৎ যেন এতোক্ষণের সম্পর্কটা ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে গেল মনে হয়।

'তুমি বিরক্ত হলে মনে হচ্ছে।'

'না। বলে যাও। বিনিময়ে আমার কাছ থেকে কতটুকু চাও তুমি ?' নিরুত্তাপ গলায় জানতে চায় শুভা।

'কতটুকু চাই মানে ?' বহু নারীর অভিজ্ঞতা পেরিয়ে আসা সুদর্শনও প্রথমটায় ধরতে পারে না শুভার কথা।

শুভা ঠিক আগের মতই কঠোর গলায় বলে, 'এ ধরনের প্রস্তাব আমার কাছে একবার নয়—অনেকবার এসেছে। যদিও তাদের

সঙ্গে তোমাকে এক করা যায় না। কোন দিক থেকেই নয়।'

সুদর্শন আহত স্বরে বলে, 'আমি ভাবতে পারিনি, তুমি আমার রিকোয়েস্টটাকে এভাবে নেবে।'

শুভা তাকায় নিঃশব্দে। ভ্রূর চুল খুঁটে তোলা নয়—তবু এক নজরে দেখলে মনে হয় তাই—তুলি দিয়ে আঁকার মত। দুই ভুরুর মাঝখানে, ঠিক মাঝখানে নয়—মাঝখানটার একটু ওপরে—গোল সবুজ টিপ বড় করে এঁকেছে শুভা।

টিপের রঙের সঙ্গে শাড়ি মানান করা। মেয়েটার কোথাও বাড়তি কিছু নেই। কথাতেও নয়।

'দ্যাখ, তুমি যে আমায় সাহায্য করতে চেয়েছ—এই অনেক।' শুভা এবার কঠোরতা ভেঙে বলে, 'সত্যি বলতে কি খালি হাতে আমার পক্ষে কিছু নেওয়া সম্ভব নয়। কখনো নিইনি। নিতে গেলে নিজেকে খুব ছোট ছোট মনে হয়।'

'শুভা', সুদর্শন আরও ধীর গলায় বলে, 'আমি বোধহয় নিজের থেকে কোনদিন কাউকে সাহায্য করবো বলিনি—আজ তোমায় বললাম—'

'প্রিন্স, আমার সমস্যা এতো জটিল,—এতো পাকানো—বলে তোমায় বোঝাতে পারবো না। বিশ্বাস করো, মাঝে মাঝে অবস্থা এমন সহ্যের বাইরে চলে যায়—সুইসাইড করতে ইচ্ছে করে।'

'তোমার ফ্যামেলী ট্রাবলস্-এর কথা বলছো?'

'এক এক সময় মনে হয় সবকিছু ছেড়েছুড়ে দিয়ে চলে যাই। মরুক ওরা। অন্যকে সুখী করার জন্যে আমি মরবো কেন? আমি নিজে কেন সুখী হতে চাইবো না? ওদের জন্য আমার জীবনটা কেন ফেল্‌নার হয়ে যাবে?' শুভার গলায় আবেগ হাহা করতে থাকে। অনেক দিনের অনেক চাপা কথা হঠাৎ যেন হু-হু করে নেমে আসতে চাইছে।

ওয়েটার কোল্ড ডিঙ্কস্ দিতে এলে শুভা কথা থামায়। আবেগ

সংযত করতে চায়। টেবিলের ওপর গ্লাস রেখে ওয়েটর চলে যাবার পর শুভা আবার বলে, 'একটা নাটকের সংলাপ আমার বার বার মনে পড়ে—জীবনকে ফাঁকি দিতে চাইলে—জীবন তার শোধ নেয়। সমস্ত জীবন অসহ্য ফাঁকার মধ্যে পড়ে থেকে—আমি সেই ফাঁকার মধ্যে পড়ে থেকে আমি সেই ফাঁকির মাশুল গুনছি।—সংলাপটা আমার জীবনে কাটায় কাটায় সত্যি হয়ে উঠেছে।'

'ছাখো, আমি তো ওসব শক্ত কথাটথা বুঝি না। আমি বোঝার মধ্যে বুঝি একটাই—যতটুকু পার এনজয় করে নাও। অন্যরকম বুঝলে তো নাঙ্গা সন্ন্যাসী হয়ে বেরিয়ে পড়তাম। আমার লাইফের ক্রেডিট বলতে যা কিছু—তার সবটুকুকে নিয়ে কোলকাতায় আসতুম না। রাইট?'

'তোমার দিক থেকে তুমি রাইট। কিন্তু—'

'বলো—'

'তাহলে—এই যে আমার সঙ্গে বসে আছো—এও কি তোমার এনজয় করার ব্যাপার?' শুভা খুব অর্থপূর্ণ চোখে তাকায়। সুদর্শন চমকে যায় খানিকটা। শুভার চোখে ও কিসের ইঙ্গিত! সুদর্শনের অন্তস্থল থেকে পুরুষ লাফিয়ে উঠতে চায়। শুভার চোখে কি শরীর কথা কইতে চাইছে? একটা বিশাল সুড়ঙ্গে নেমে যাবার মুখের দরজার মতন আড়াল থাকে কারো কারো চোখে। একবার ধাক্কা দিয়ে সে দরজা খুলে দিতে পারলেই—তরতর করে নেমে যাওয়া যায় অনেক—অনেক নীচে। শুভার চোখে কি সেই দরজা খুলে গেল!

সুদর্শন চোখ সরিয়ে নেয়।

এই প্রথম। এই প্রথম সুদর্শন এমন আভাসে নিরুচ্চার থাকল। তার ভেতরকার পুরুষ ছটফট করে ওঠার আগেই সে চোখ নামিয়ে নিল। ভুল হচ্ছে, ভুল হয়ে যাচ্ছে, নিশ্চয়ই কোথাও একটা কিছু মারাত্মক ভুল হয়ে যাচ্ছে। নাকি সুদর্শন মনেপ্রাণে চাইছে—যেন ভুল হয়। দ্বিতীয়বার চোখ ফিরিয়ে যেন সে নিজেকেই ধিক্কার দিতে পারে।

সুদর্শন আবার তাকায় শুভার চোখের দিকে।

কোথায় সুড়ঙ্গ! কোথাও কোন খাদ নেই। যেমন চোখে বরাবর দেখে শুভাকে তেমন সুন্দর গভীর দৃষ্টি। মেয়েদের শরীর নিয়ে অনবরত খেলতে খেলতে একি হচ্ছে তার! ভাগ্যিস অন্তস্থলে লাফিয়ে ওঠা পুরুষটি বেরিয়ে আসেনি!

'তোমার সঙ্গে আমার ফ্রেণ্ডশিপটাই তো অন্যরকম। কারো কারো সঙ্গে দুদণ্ড কথা বললেই এনজয় করা যায়।'

'এটা কম্প্লিমেণ্ট না রিজেকশন?'

'কোনটাই নয়।'

একটু চুপ করে থেকে শুভা আবার বলে, 'তুমি সত্যি যদি আমায় হেল্প করতে চাও—তাহলে একটা অতি সাধারণ ছেলে জুটিয়ে দাও তো!'

'কেন?'

'খুব সাধারণ কিন্তু সৎ। দুবেলা ডাল ভাত জুটলেই অনেক। তোমাদের মতো রাজপুত্র নয়—একেবারে সাদামাটা ছেলে—যে আমাকে বিয়ে করবে, একটু ভালোটালো বাসবে। সত্যি আমি আর পারছি না। আমি শেষ হ'য়ে গেছি, একেবারে শেষ হয়ে গেছি সুদর্শন।'

শুভা মুখ শক্ত করে কান্না আটকালো। কোন কথা যোগাল না সুদর্শনের মুখে।

'তুমি সাদামাটা ছেলে বিয়ে করবে কেন শুভা—তোমার ট্যালেণ্ট আছে—রূপ আছে—তুমি—'

যন্ত্রণায় হেসে ওঠার মতন করে শুভা বলে, 'কলকাতার হাওয়া এখন তোমার গায়ে পুরোপুরি লেগে গেছে দেখছি। খুব তাড়াতাড়ি নরকের ছাড়পত্র পেয়ে গেছ।'

এবার সুদর্শন হালকা গলায় বলে, 'এটা কোন্ নাটকের ডায়লগ?'

'নাটক তো একটাই। চরিত্রও এক। সংলাপ খালি আগে পিছে চলে।'

সুদর্শন শুভার কথা ধরতে পারল না। কোল্ড ড্রিঙ্কের স্ট্রতে মুখ নামাল।

অনেকক্ষণ পর সুদর্শন বলে, 'তোমার সঙ্গে দেখা করতে হলে এই রিহার্সালের দিন ছাড়া তো হয় না—অথচ অন্য সময় তো দেখা হওয়াই মুশকিল। অফিস ক্লাবের রিহার্সালগুলো—'

'ওগুলো তো এখন আর থাকছে না।'

'তা থাকছে না বটে! আচ্ছা, তোমায় একটা ফোন নাম্বার দিয়ে দিচ্ছি—আমার বন্ধু মীনাক্ষি জৈন—ওকে বলে দিও ও আমায় খবর দেবে।' বলে শুভা ব্যাগের থেকে এক টুকরো কাগজ আর ডট্ পেন বার করে ফোন নাম্বারটা লিখে দেয়। তারপর বলে, 'আচ্ছা, তুমি যেখানে আছো—ফোন আছে তো তাদের?'

'আছে।'

'লিখে দাও।' বলে শুভা কাগজ কলম এগিয়ে দেয়। সুদর্শন নাম্বারটা লিখে দিয়ে বলে, 'করলে সকালের দিকে কোরো।'

খানিকক্ষণ পর সুদর্শন আচমকা বলে, 'উজ্জ্বল ছেলেটা কেমন?'

'হঠাৎ?'

'এমনি—জানতে চাইছি।'

'আগেও একবার তুমি উজ্জ্বলের কথা তুলেছো।'

'বলো না।'

'খুবই ভাল ছেলে। সচরাচর দেখা যায় না!'

'সাদামাটা নয় তো?

এবার শুভা চাপা শব্দ করে হাসে। বলে, 'বাইরে থেকে তোমায় যতই শক্ত মনে হোক না কেন—ভেতরে ভেতরে তুমি কিন্তু নরম আছো। বেশ সেন্টিমেণ্টাল।'

'কক্ষনো নয়। আমি খুব প্র্যাকটিক্যাল ছেলে।'

'তাতে কি—একটা মানুষের মধ্যে কি আর দুটো ধরন থাকে না?'

'আমার নেই।'

'খুব আছে।'

'আমার কতটুকু তুমি জানো?'

'যতটুকু জানলে চলে যায়।'

'না—ততটুকু তোমার জানা নেই। আমি যে কি, যেদিন জানতে পারবে—'

'ভয় দেখাচ্ছো! ও সব আর যাকে হোক বোলো—থিয়েটার করে বেড়ানো মেয়েকে বোলো না। একসঙ্গে অনেক চরিত্রের সঙ্গে অভিনয় করতে হয় তো—নিজেকেও একই সঙ্গে অনেক চরিত্র হতে হয়।'

'একদিন তোমায় বলবো। সব বলবো—শুভা।'

'আর শুনবে না? আমি যদি বলতে শুরু করি।'

'একদিন চলো না—সারাদিন কোথাও ঘুরে আসি।'

'কদিন বাদে। শরীরটা এখন একদম নিচ্ছে না। হৈ-চৈ করতে গেলেও ক্লান্তি আসে।'

ওরা রেস্টুরেন্টের দরজা পেরিয়ে বাইরে এসে দেখল—তুমুল বৃষ্টি নেমেছে। চারপাশ ঝাপসা।

॥ পনেরো ॥

মিসেস শিভালকরকে আসবো বলে কথা দিয়েও সুদর্শন শেষ পর্যন্ত যায়নি। তার পর থেকে বেশ কয়েকদিন সে পার্ক স্ট্রীটের চত্বরেই হাঁটেনি। মাঝে শুধু একদিন একটা ফোন করে মালহোত্রাকে জানিয়ে দিয়েছিল—হঠাৎ শরীর খারাপ করায় সেদিন কথামত যাওয়া হলো না। উত্তরে মালহোত্রা কোন রকম রাগের ভাব দেখায়নি।

লোকটা অবশ্য ওই রকম। চটল কি চটল না বাইরে থেকে বোঝা মুশকিল। এই ধরনের লোক খুব ঠাণ্ডা মাথায় মানুষ খুন করতে পারে।

কিন্তু হঠাৎ কি হলো সুদর্শনের? ভেতরে ভেতরে কি যেন একটা হয়ে যাচ্ছে তার। পার্ক স্ট্রীট আর তেমন টানছে না কেন? এই কয়েক মাসেই আলগা হয়ে গেল সব টান? শুধু মজা লুটবে বলেই না দাদার সঙ্গে এমন তুলকালাম করে কলকাতায় আসা! এ রকম হচ্ছে কেন? এরকম হওয়া ঠিক হচ্ছে না। সুদর্শন কেন ঠিকঠাক সুদর্শনের মধ্যে থাকতে পারছে না? শুভা? শুভা জড়িয়ে যাচ্ছে বলে কি? কিন্তু শুভাই বা জড়িয়ে যাচ্ছে কিভাবে? শুভার কাছে ঠিক কি চাওয়ার আছে তার? শুভার চোখের দিকে তাকালে সুদর্শনের ভেতরে যে অনুভূতি জাগে তা তো কোন আকর্ষণের নয়। অথচ মেয়েটা সম্পর্কে একটা দিনও সে উদাসীন থাকতে পারে না কেন?

সবচেয়ে মজার ব্যাপার হলো—কলকাতায় আসার আগে সে যা ভেবেছিল—দাদার বন্ধু ক্লাসের যারা আছে—ওই অর্ণব মিত্র ইত্যাদি—সেই সমস্ত আঁতেল মার্কাদের ধারে-কাছে যাবে না খুব একটা। এই ধরনের মানুষজন তো তার চিরকাল অপছন্দ। অথচ আসার পর

থেকে ক্রমে সে বেশ যাতায়াত শুরু করেছে। টানটা শুভার জন্যে হলেও অর্ণব মিত্র কিংবা উজ্জ্বল ব্যানার্জীদের তো তেমন খারাপ লাগে না তার। বরং মালহোত্রা টাইপের লোকেদের এড়াতে পারলে বাঁচে।

দেখতে দেখতে বর্ষা এসে গেল কলকাতায়। একটু আগেই যেন এলো। বর্ষাকালে রাস্তার চেহারা হয় যা বিদিকিচ্ছিরি—গাড়ির দফারফা করে ছাড়ে। বর্ষায় শহরখানা যা-তা হয়ে যায়। তাকানো যায় না। একদিন ঠাট্টা করে সে বলেও ছিল, 'অর্ণবদা—বর্ষাকালে কলকাতায় নরক আর আলাদা করে চিনতে হয় না।'

উত্তরে অর্ণবদা বলেছিল হেসে, 'হ্যাঁ, স্বর্গের সঙ্গে একাকার হয়ে থাকে তো।'

'স্বর্গ? কলকাতায়? কেন, স্বর্গোদ্যানে ফুটবলের গ্যাঞ্জাম হয় বলে?' দুদিন আগেই ছিল ইডেনে লীগ চ্যাম্পিয়ানশিপের খেলা।'

'আর কদিন থাক। ফেরিওয়ালাদের কিংবা গদীওয়ালাদের মতো লুঠতরাজের মন না নিয়ে একটু ভালবাসার মন নিয়ে তাকাও শহরটার দিকে—দেখবে অন্য রকম লাগবে।' কথাটা অর্ণবদা হাসতে হাসতে বলেছিল কিন্তু বলার মধ্যে এক ধরনের কঠোরতা ছিল।

এই এক দুর্বলতা কলকাতার আঁতেলদের। কলকাতাকে একটু প্রশংসা করলে গলে যায় একেবারে। আর একটু নিন্দে কর ব্যস্—আর দেখতে হচ্ছে না। শহর নিয়ে মানুষ যে এমন সেন্টিমেন্টাল হয় সুদর্শনের জানা ছিল না।

অম্বর যেমন দুম করে কলকাতা থেকে বেরিয়ে দিল্লী-বোম্বে করছিল তেমনি আবার আচমকা একদিন এসে হাজির হলো। এল মাত্র এক সপ্তাহের জন্যে।

পরের সপ্তাহে আবার বাঙ্গালোর।

'একটা নতুন বিজনেস স্টার্ট করছি।'

'মাই গুডনেস। আবার নতুন। এটা কিসের?'

'চুলের। উইগ্ বানাবো—ফ্যাক্টরি করছি। সব পাকা।'

সুদর্শন ঠিক বুঝে উঠতে পারে না। তাকিয়ে থাকে। অম্বর তাকে বোঝায় বিজনেসের ধরনটা। শুনতে শুনতে বেশ অবাক হয় সুদর্শন। কত ধান্দা জানে এরা।

অম্বর যে কদিন থাকল কলকাতায় তার মধ্যে একদিনও সুযোগ হলো না শুভার সঙ্গে দেখা করার। অম্বীক্ষার রিহার্সালে একবার ঘুরে আসার মত সময়ও হাতে পেল না। রাতে ঘুমোনো ছাড়া হোটেলে নেই বা ছিল আর কখন। দুদিন তার নামে ফোন এসেছিল। তার মানে শুভার ফোন। শুভাকে একটা রিংব্যাক করা দরকার। ফোন করে সে জানিয়ে দিল মীনাক্ষি জৈনকে শুভাকে যেন বলে দেয় মিনি-বাসের ব্যাপারে সে খুব ব্যস্ত। দেখা হবে সামনের সপ্তাহে।

যেমন অম্বর, তেমনি হয়েছে অর্জুনেরা, এদের ধরাও মুশকিল। পার্ক স্ট্রিটেই ধরা গেল দুজনকে। সেদিন তার আগেই পাবার পর-পর অন্য দুজনের সঙ্গে দেখা। প্রথমে বাপ্পাদার সঙ্গে—গান্ধী স্ট্যাচুটার ওটা দিকে গৌতমের সঙ্গে। শুধু থিসিস করতেই নয়—এ স্ট্রিটের সঙ্গে গৌতমের যোগাযোগ অনেককালের। এক সময়ে পার্ক ম্যানসনে মেসে নিয়ে থেকে—আলিয়াঁসে ফরাসী ভাষা শিখত। শেখাটা শেষ পর্যন্ত হয়নি কিন্তু আসাটা রয়েছে প্রায় চিরস্থায়ী বন্দোবস্তে। এখানে ফিল্ম শো দেখতে আসে নিয়মিত। ফরাসী কনসোলেট থেকে 'ফ্রান্স' নামে ইংরেজি তর্জমায় যে পত্রিকাটা প্রকাশিত হয় তা সংগ্রহ করে। পরিচিত লোকজনের সঙ্গে আড্ডা মেরে যায়।

থিসিস পেপারটা তৈরী করার সময় এই পার্ক স্ট্রিটের বাড়ি-বাড়ি ঘোরাফেরা করে তথ্য সংগ্রহের ব্যাপারে কত সব মজার ঘটনা ঘটেছিল—তার দু-এক টুকরো শুনিয়ে দিল গৌতম। অর্ণবদার বাড়িতে ছেলেটাকে দেখে কিন্তু মনে হয়নি এমন চট্ করে জমে যেতে পারে।

একটি ফ্ল্যাটে এক মহিলার একক মালিকানা দেখে গৌতম প্রশ্ন করেছিল—বৃত্তি কি? মহিলাটি কেমন অদ্ভুতভাবে জানাল—ম্যয় আওরৎ হুঁ। বলার সময় গৌতমের চোখ মুখ আর কণ্ঠস্বরের অনুকরণ দেখে সুদর্শন হাসল খুব।

এরপর দেখা হয়েছিল ক্যাপ্টেন মালহোত্রার সঙ্গে। সেই মোলায়েম হাসি। মনে মনে খিস্তি মারছে নির্ঘাত। সাপের মত ঠাণ্ডা চাউনি নিয়ে লোকটা কথা বলে যেতে পারে ঘণ্টার পর ঘণ্টা। লোকটাকে কাটাতে কম সময় গেল না। ব্লুফক্সে এসে একসঙ্গে পাওয়া গেল অম্বর সিং আর অর্জুন বেদিকে।

অম্বর তখন মশগুল হয়ে অর্জুনের গৌহাটিতে প্রোগ্রাম করতে যাওয়ার গল্প শুনছে। কোন এক লাস্যময়ী তরুণী গায়িকার সঙ্গে প্লেনের পাশাপাশি আসনে বসে গৌহাটি গেছিল অর্জুন। ফাংসন সেরে এয়ারপোর্টে রাত কাটিয়েছে কিভাবে তার খুঁটিয়ে বর্ণনা চলেছে। প্লেনের ওই স্বল্প সময়ের মধ্যেই কেমন কায়দা করে কতদূর পর্যন্ত এগোতে পেরেছিল তার ফিরিস্তি দিয়ে গেল অর্জুন বেদি। শালা এই সব করে মজা লুটছে অথচ আমার মিনিবাসের ব্যাপারটায় একটু সময় দিচ্ছে না। সুদর্শন মনে মনে গালাগালি দেয় আর ওপরে ওপরে শব্দ করে হেসে চলে। কপালে এও ছিল! অর্জুন বেদির মতো একটা ক্লাউনের কাছে কিনা তাকে মেয়ে-গাঁথার গল্প শুনতে হয়! ·

গল্প শেষ করে অর্জুন সুদর্শনের দিকে তাকিয়ে বলে, 'হাই প্রিন্স—বোলো ভাই—চালবে কি? বোলো?'

সুদর্শন ঠিক বুঝে উঠতে পারে না। মিনিবাসের ব্যাপারে ঘুষের কথা বলছে তো!

'নো লিকুইড বিজনেস—আই প্রেফার সলিড।'

অম্বর বলে দেয়, 'অ্যারেঞ্জ ওয়ান সুইট এইটট্টিন।'

'তোর পারমিট বেরিয়ে গেছে। য়্যু আর লাকি প্রিন্স।'

'ও ফাইন্!' খুশিতে লাফিয়ে উঠতে ইচ্ছে করে সুদর্শনের। নাহ্, সত্যিকারের কাজের ছেলে অর্জুন! একটু আগের সব বিরক্তি খুশিতে উপচে পড়ে খবরটা শুনেই। বাহাদুর ছেলে! সাধে কলকাতা জুতিয়ে মজা মারছে শালাটা!

'চল্—বেরিয়ে পড়ি তাহলে। একটা ভাল নিউজ পাওয়া গেল যখন—সেলিব্রেট করা যাক।' সুদর্শন নিজেই প্রস্তাব দেয় এবার।

'দাঁড়াও গুরু—হোলিম্যানের সঙ্গে আগে তোমার মিট্ করিয়ে দিই—ও শালা অল্ওয়েস লেট আওয়ার্সে আসে। আজ তাড়াতাড়ি আসতে বলেছি।'

'হোলিম্যান কে?' সুদর্শন চেনে না।

'দিলীপ ভট্টাচারিয়া—ওর কথা বলিনি তোকে? যা শ্লা! তোকেই বলিনি—দিলীপকে বলেছি সব। মিনিবাসের ব্যাপারে। ওর ভাই সুদীপ—ভাল ড্রাইভ করে। একটা রুটে চালাচ্ছে এখন। তুই ওকে নিস যদি দিলীপের সঙ্গে কথা বলে রাখ্। ও শালা আসবে ঠিক—মন্দিরের বিজনেস চুকিয়ে আসে তো, দেরি হয় তাই।'

অর্জুন সিং বেদি উঠে গেল। ওহো, সর্দারজীর প্রোগ্রাম আছে এখনো।

সুদর্শন বলল, 'কি কাজ করে তোর ওই দিলীপ ভট্টাচার্য?'

'পুজো করে।'

'অ্যাঁ! পুজো করে মানে!' সুদর্শন একেবারেই বুঝে উঠতে পারে না। পুজো করে—এমন [illegible] খানে আসে!

ব্যাপার বুঝিয়ে বলে সুদর্শনকে।

অনেক পুরুষের যজমানির ব্যবসা দিলীপদের। কলকাতার বনেদি সব পরিবারের কোথাও দেবসম্পত্তি, কোথাও বা পারিবারিক সম্পত্তির মধ্যেই আছে—অনেক কালের প্রতিষ্ঠিত সব বিগ্রহ—ছোট-বড়-মাঝারি গোটা নানান দেব। এই সব বনেদি বাড়িতে নিত্যপুজো করেই দিলীপের বাপঠাকুরদারা কলকাতায় গুছিয়ে

বসেছে। মোটা ইনকাম—ছাড়লে নীট্ লস্। দিলীপও ছাড়েনি। বাবা মারা যাবার আগেই খানিকটা ট্রেনিং নিয়ে রেখেছিল—এখন হেভি লড়ে যাচ্ছে। দক্ষিণে বেহালা থেকে শুরু করে এদিকে জান-বাজার—একেবারে উত্তরে পাথুরেঘাটা পর্যন্ত—সলিড ফিল্ড ওর।

অর্জুন সিং বেদির গান শুরু হয়। সেই এক গান। এখানে অনেক লোকই আসে রেগুলার। ওদের কি বোর লাগে না। লাগে না নিশ্চয়। না হলে প্রথম গানটা ও একই রেখেছে কেন। টেগোর সঙ বলে! শুঁড়িখানাতেও টেগোর মেরে কালচুর। অর্ণবদারা এসব জানে? দেখেছে কোনদিন এই কলকাতাকে? এই জেনে শুনে বিষ পান করার ক্যালকাটানদের। ওই গৌতমরা দেখে নিশ্চয। ওরা তো আবার পার্ক স্ট্রীটের ট্রান্সপোর্ট প্রবলেমের ওপর থিসিস লিখতে গিয়ে এর হিস্ট্রি খুঁজছে! কত রকমের না ইন্টারেস্ট থাকে মানুষের। আচ্ছা, ওদের ভেতরকার ইচ্ছাটিচ্ছাগুলো কি একদম মরে গেছে। লাইফের ভাইটালিটি বলে কি কিছু নেই। তা না হলে কলকাতায় বড় হয়ে উঠলো তবু এনজয় করতে শিখল না? নাকি আমরা যেমন ওদের দিকে তাকিয়ে ভাবি—আহা বেচারারা—উঠতে পারল না, কিংবা ভাবি গুড ফর নাথিং—ওরাও তেমন কিছু ভাবে না কি। ভাবতে চায় নিশ্চয়ই। কিন্তু ভাবলেও তা বিশ্বাস করে কি।

'দিস ইজ আওয়ার হোলিম্যান—দিলীপ ভট্চাজ। অ্যাণ্ড দিস্ ইজ আওয়ার প্রিন্স—সুদর্শন সান্যাল।' দিলীপ ভট্টাচার্য এসে পৌঁছলেই অম্বর পরিচয় করিয়ে দেয়। সুদর্শন অবাক হয়ে ভাবে—এখন ছেলেটিকে দেখলে কে বলবে ও পারিবারিক বিগ্রহ পুজোর পুরোহিত! চেহারাটি ভাল। ফর্সা রঙ। মাঝারি গড়ন। বড় চুল।

সুদর্শন মনে মনে দিলীপের পুরোহিতের বেশটা কল্পনা করে নেয়। এখন প্যারালালস্ আর হার্টব্রেকার সার্টের মধ্যে কল্পনাটা করা একটু শক্ত বটে। খুব জলি ছেলে। অবশ্য সেটুকু না হলে এ তল্লাটে

আসাটা খুব স্বাভাবিক হতো না। ব্যাটা এখন কেমন স্মার্টলি ইংরেজি মারছে—সন্ধ্যে-আরতির সময় সংস্কৃত ঠিক বলে তো!

অর্জুন নতুন গান ধরেছে। কারেন্ট বোম্বাই ছবির হিট সঙ। কোন্ ফিল্ম? হিরো কে? তাই নাকি? আমার হীরোর ফিল্ম? সুদর্শন আগ্রহী হয়ে ওঠে। কি হলো তার—তিন সপ্তাহ হলো ফিল্মটা রিলিজ করে গেছে কলকাতায় অথচ তার দেখা হয়নি। দেখার জন্যে কোন রকম আগ্রহ অনুভব করেনি পর্যন্ত। এরকমটা তো হবার কথা নয়! কিভাবে যে কেটে যাচ্ছে সপ্তাহগুলো! শুভা বা অর্ণবদার কাছে তো শুধু নাটকের খবর। ফিল্ম বলতেও ওরা বোঝে অন্য ধরনের ছবি—যা কিনা দেখতে দেখতে মাথা ধরে যায়। সত্যজিৎ রায় আর ঋত্বিক ঘটকের বাইরে যেন আর ফিল্ম নেই!

দিলীপ চমৎকার খিস্তি মারতে পারে। দূরে বসা একটি মেয়েকে উদ্দেশ্য করে এক নাগাড়ে বলে গেল খানিকটা। অম্বর খুব মজা পাচ্ছে। হাসছে খুব।

অর্জুন মাইক হাতে নিয়ে গুর স্বভাবসুলভ ভাঙ্গতে দুলে দুলে, কখনো কাত হয়ে, কখনো সোজা হয়ে হিট সঙ গেয়ে গেল একটার পর একটা। গান শেষ হওয়ার পর আবার ফিরে এলো সুদর্শনের কাছে।

'চলো, প্রিন্স, বাহার চলো ভাই।'

'কোথায় যাবে?'

'ওই যে—সেলিব্রেট করবো বলেছি—' অম্বর বলে।

সুদর্শন অম্বরের মুখের দিকে তাকায়।

অম্বর বলে, 'সব অ্যারেঞ্জ করা আছে গুরু—শুধু বডি ফেলে দাও—আমরা তোমায় ঘাড়ে করে নিয়ে যাচ্ছি।'

'কোথায়? সুইট এইট্টিন?'

'নো নো, টুডে নাথিং ডুয়িং—ওনলি ভিসুয়্যাল প্লেজার।'

'ব্লু ফিল্ম?'

'একেবারে নিউ স্টক—কারো কাছে পাবে না।'

'আরে আমি তো কোনকালে দেখিইনি। শিলিগুড়িতে একবার একজন দেখাবে বলেছিল। পঁচিশ টাকা চাঁদাও দিয়েছিলুম। শেষ পর্যন্ত ফিল্ম পৌঁছল না। খবর পেলাম—কোলকাতা থেকে যে লোকটা আনছিল সে নাকি রিলসমেত ধরা পড়েছে। রিল কেড়ে নিয়েছে পুলিস অফিসার। লোকটা আটকে ছিল নিশ্চয়ই কিংবা হয়তো সত্যিই ঘুষ দেওয়ার মত টাকা ছিল না সঙ্গে।'

ব্লুফক্স থেকে বেরিয়ে ওরা চারজনে উঠল অর্জুনের সাদা ফিয়াটটাতে। অর্জুন চালাচ্ছে। পাশে অম্বর। দিলীপ আর সুদর্শন পেছনে। গাড়ি স্টার্ট নিয়ে অল্প একটু এগিয়েছে যেই সুদর্শন ডানদিকের পেভমেন্টের দিকে তাকিয়ে বলে উঠল, 'জরা রোখকে দোস্ত্। ওয়ান মিনিট।' অর্জুন গাড়ি থামাল।

সুদর্শন দরজা খুলে নেমে পেভমেণ্টের দিকে ছুটে গেল। গলা তুলে ডাকল, 'হাই—সিন্ধু—সিন্‌ধু—' সিন্ধু এগিয়ে গেছিল অনেকটা। ডাক শুনে পেছন ফিরে তাকাল। সুদর্শনকে দেখে হেসে এগিয়ে এলো তার দিকে। সিন্ধু বলল, 'তোমাকে তো ইদানীং কদিন দেখতে পাইনি এ তল্লাটে। আমি ভাবলাম বুঝি শিলিগুড়ি ফিরে গেলে।'

'কিছু না করে ফিরে যাবো—এমন ছেলে মনে হয় কি আমায় দেখে।'

'সেটা মনে হয় না বলেই তো ভাবছিলাম তোমার কথা।'

'থ্যাটস্ নাইস অফ ইউ।' সুদর্শন কায়দা করে উচ্চারণ করে তারপর বলে, 'রাত আটটার পর তোমাকে তো কোনদিন দেখিনি এদিকে।'

'দেখতে চাও যদি দেখা দিতে পারি।'

'তোমার চাকরি?'

'সে তো আছেই।' সিন্ধু সাদা ফিয়াটের দিকে তাকিয়ে বলে 'তোমার বন্ধুরা বোর হচ্ছে।'

'ঠিক আছে—কাল—না কাল নয়—ডে আফটার টু মরো—আটটার সময় এসো—'

'ও-কে—পার্কের নিচে থাকবো আমি। এইট্ টু এইট ফিফ্‌টিন।'

'ও-কে।'

কালো সেই ফ্ল্যাপটা যথারীতি আছে সিন্ধুর কাছে। সিন্ধু আবার এগিয়ে যায়। সুদর্শন গাড়িতে ফিরে আসে।

'হাট ফিসি ক্যারেকটার।' অম্বরকে বলে সুদর্শন।

'ইয়োর ফ্রেণ্ড?' অর্জুন জানতে চায়। তারপর নিজেই বলে 'আমি ওকে চিনি একটু একটু।' আর কিছু বলে না।

সুদর্শনও আর খোঁচায় না ওদের কাউকে। এমন একটা ইণ্টারন্যাশানল জায়গা কিন্তু পার্ক স্ট্রীটের মানুষজনও যেন একটা গাঁয়ের বাসিন্দে হয়ে যায়—নিয়মিত যারা যাতায়াত করে অনেকেই অনেকের হাঁড়ির খবর রাখে দেখছি। সুদর্শন অন্য কথায় চলে যায়, বলে, 'আমরা এখন ঠিক যাচ্ছি কোথায়? কার বাড়ি?'

'যার বাড়ি যাচ্ছি তিনি এখন আমাদের সঙ্গে নেই। গিয়ে আলাপ হবে।'

'হঠাৎ পুলিস-টুলিস এসে পড়ে কেলেঙ্কারি বাধাবে না তো!' সুদর্শনের শিলিগুড়ির কথা মনে পড়ে যায়।

সুদর্শনের কথা শুনে বাকি তিনজনেই শব্দ করে হেসে ওঠে। সুদর্শন রহস্যটা ধরতে পারে না। কিন্তু দ্বিতীয়বার আর প্রশ্নটা তোলে না। চুপ করে যায়। দিলীপ গালাগালির বিচিত্র শব্দভাণ্ডার উজাড় করতে করতে চলে। ব্যাটা মন্ত্র আওড়াবার সময় এসব বলে ফেলে না তো!

গাড়ি শেষ পর্যন্ত একটা বড় বাড়ির সামনে গিয়ে দাঁড়ায়। সবাই গাড়ি থেকে নামলে ভেতর থেকে আগে কাচগুলো তুলে দেয় অর্জুন। তারপর বেরিয়ে এসে লক্ করে দেয়। চারজনে একসঙ্গে উঠে যায় দোতলার কোয়ার্টার্সের দরজায়। দরজার পাশে নেমপ্লেট

দেখে সুদর্শন বুঝতে পারে ফ্ল্যাটের মালিক পুলিশের বেশ বড় গোছের অফিসার। এতক্ষণে বুঝতে পারা যায় তার মুখ থেকে পুলিসের কথাটা শুনে ওরা তিনজনে একসঙ্গে শব্দ করে হেসে উঠেছিল কেন। বেল টিপতে এক চাকর এসে দরজা খুলল। চাকরটা দিলীপকে চেনে বোঝা গেল। ঢুকেই বসবার ঘর। পরিপাটি করে সাজানো। টিভি সেট—স্টিরিও বক্স—জাপানী লণ্ঠন থেকে শুরু করে টুকিটাকি অনেক কিছু জিনিসপত্তর বেশ গুছিয়ে সাজানো ঘরের মধ্যে।

ওরা চারজনে গিয়ে সোফায় বসার পর মুখার্জী এলো ভেতর থেকে। এন. মুখার্জীর নামটা দেখে সুদর্শন ঠিক আন্দাজ করতে পারছিল না—মানুষটা কেমন হবে। ডিউটি অফ বোঝা যায়। বাড়িতে পাজামা-পাঞ্জাবি পরে বেশ সৌখিন বাঙালী হয়ে বসে ছিল এতক্ষণে বোঝা যাচ্ছে। এমন কিছু বয়স নয়—ত্রিশ থেকে তেত্রিশ। এমন সুন্দর মুখের লোককে পুলিসের চাকরিতে মানায় কি !

দিলীপ সকলের সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিল।

মুখার্জী বেনসনের প্যাকেট খুলে সিগারেট বাড়িয়ে দিতে দিতে বলল, 'আমাদের মশাই রোজই নতুন নতুন লোকের সঙ্গে সাক্ষাৎ-টাক্ষাৎ হয় খুব বাজে পরিস্থিতিতে। একমাত্র আত্মীয়-স্বজন বন্ধু-বান্ধব গোছের লোকের বেলাই একটু যা সুযোগ থাকে ভদ্র পরিবেশে আলাপ হওয়ার। এই দিলীপ শালাটার জন্যে সে চান্সও যেতে বসেছে। ব্যাটা নোংরা ছবি দেখানোর জন্যে বেছে বেছে আমার বাড়িতে টেনে আনলো আপনাদের। ভালোই হল—আমিও সেই সঙ্গে একটু মজা মারবো। কাজের ঠেলায় এতো বোর হয়ে আছি—কি বলবো ভাই। দেখি একটু পারভারসান দেখে মনটাকে চাঙ্গা করে নেওয়া যায় কিনা। তবে আমি এতো দেখেছি না—আমায় ব্লু কোন এফেক্ট করে না।'

মুখার্জীর কথা বলার ধরনটা খুব স্পষ্ট আর সরাসরি। উঠে গিয়ে ফ্রিজ থেকে দুটো মদের বোতল বার করে আনতে গিয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল। 'দাঁড়ান, আমার একটা সুন্দরী বউ আছে, ওর সঙ্গে আলাপটা আগে করিয়ে দিই।' বলে 'রীণা, রীণা' করে বার দুয়েক ডাকতেই ভেতর থেকে সাড়া দিয়ে ভদ্রমহিলা এলেন ওদের সামনে। মুখার্জী বলল, 'এই আমার বউ—দেখছেন তো কত সুন্দরী। আর সেই জন্যেই তো আপনাদের সামনে বেশিক্ষণ রাখব না। তাছাড়া আপনারা শালা যা মাল—যে উদ্দেশ্যে বসে আছেন এখানে—কোন ভদ্রলোক কি বৌকে আর পরিচয় করিয়ে দিতে পারে!'

অন্য যে কোন লোক এসব কথা বললে সুদর্শন চটে যেতো কিন্তু মুখার্জীর বলার ঢঙটা এতো খোলামেলা আর মজার যে কিছুমাত্র খারাপ লাগে না। সকলের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেওয়ার পর বলল, 'এবার রীণা তুমি ভেতরের ঘরে গিয়ে বুবাইকে ঘুম পাড়াও। আমরা একটু বাৎসায়ন চর্চা করি।' রীণা হেসে নমস্কার জানিয়ে ভেতরে চলে গেল।

অম্বর দেওয়ালে প্রোজেক্সন সেট করে দিল। মুখার্জী সকলের হাতে হাতে গ্লাস তুলে দিয়ে বলল, 'চুপচাপ কাণ্ডকারখানা দেখে যাবেন ভাই—কোন মন্তব্য করবেন না।' কিন্তু প্রোজেক্সন শুরু হয়ে যাওয়ার পর দেখা গেল মুখার্জীই সবচেয়ে বেশি কথা বলছে।

দেখার ঠিক আগে এবং দেখার প্রথম কয়েক মুহূর্ত সুদর্শনের বেশ উত্তেজনা ছিল। কিন্তু একে একে সবকটা দেখে ফেলার ফলে সুদর্শনের কেমন গা ঘিনঘিন করতে লাগল। বিশ্রী লাগতে শুরু করল। আচমকা শুভার মুখ ভেসে উঠতে থাকল মনের মধ্যে। এই বিশ্রী ভাবটা কাটানোর জন্যে সে শুভার মুখটাকেই আশ্রয় করে থাকল অনেকক্ষণ।

॥ ষোল ॥

শুভা অনেকদিন অম্বীক্ষার মহড়ায় আসেনি।

প্রথম প্রথম ছিল সামান্য অভিমান, ক্রমে সেটা ক্ষোভে দাঁড়াচ্ছে। যত ভাবছে, ততই ক্ষোভটা আরো পাকিয়ে উঠছে শুভার মধ্যে। সবাই সমান। আশ্চর্য! অর্ণবদাও!

'সবার আগে তোমার শরীর সারানো দরকার—তারপর অম্বীক্ষা তো আছেই।' অর্ণবদার এইসব কথা শুনে শুভার প্রথমটায় মনে হয়েছিল তার শরীরটার জন্যে গ্রুপের উদ্বেগের অন্ত নেই। সে জন্যেই অফিস ক্লাবে যাওয়াও বন্ধ হল। কিন্তু সবকিছু এভাবে চুকিয়ে দিয়ে শুভা বাঁচবে কিভাবে—সে কথাটা তো অর্ণবদা ভাল করে ভেবে দেখেননি! দেখলে আর অতগুলো পার্টিকে ফিরিয়ে দিতেন না।

নিজের সংসারের ছবিটা শুভা কোনদিনও তুলে ধরেনি অর্ণবদার সামনে। ভুলে তনয়াদিকেও বলেনি কিছু। অম্বীক্ষার ছেলেমেয়েদের অবশ্য একটা গুণ খুবই আছে। কারো সাংসারিক জীবন নিয়ে মাথাব্যথা নেই কারো। তবে উজ্জ্বল খানিকটা আঁচ করতে পারে তার অভাব-অনটনের। ডাক্তার পালিতকে যা কিছু বলে দেওয়ার তাও বলেছে উজ্জ্বলই। যার জন্যে এখনো পর্যন্ত যা খরচ হয়েছে তা সামান্যই বলা যায়। নিয়মিত যাতায়াত করতে হচ্ছে শুভাকে। এর মধ্যে শুধু একদিন মাত্র উজ্জ্বল ফোন করেছিল মীনাক্ষি জৈনের কাছে। জানিয়ে দিয়েছিল ক্লাবে যাওয়ার জন্যে। শুভা যায়-নি। আশা করেছিল—আবার ফোন করবে উজ্জ্বল। উজ্জ্বল ফোন করেনি। করবেই বা কেন? সামনের শোতে শুভার রোল নেই। স্বার্থ ছাড়া মানুষের সঙ্গে কি মানুষের সম্পর্ক থাকে? শুভার শরীরের জন্যে দুর্ভাবনাটাবনা বাজে কথা। লোক-দেখানো ওজর। আসলে

এখন আর তাকে ভাল লাগছে না। তার প্রয়োজন মিটে গেছে। সুতরাং শুভার সেন্টিমেন্ট দেখার আর দরকার কি? তা না হলে উজ্জ্বলের অফিসের নাটকে ওরকম হয়! তাকে বাদ দেওয়ার কারণ না হয় মেনে নেওয়া যায়, কিন্তু তার জায়গায় ওরা বীথিকে নিল কি করে? অর্ণবদা, উজ্জ্বল—সবাই জানে বীথির সঙ্গে তার সম্পর্কটা কি ধরনের। ভাবতে গেলেই শুভার রাগ বেড়ে যায়। একবার মনে হয় —নাহ্—আর দরকার নেই ডাক্তার পালিতের চিকিৎসার। এর মধ্যে ওদের একটু সাহায্য নেওয়া হয়ে যাচ্ছে। কোন দিন কোন কিছুই যখন নেয়নি—এটুকুই বা নেবে কেন? কিছু নেবে না। ওদের দয়া, সহানুভূতির ছিটেফোঁটাও দরকার নেই তার।

ছোট আয়নাটার সামনে গিয়ে শুভা নিজের মুখ দেখে। চোখের পাতা ভিজে আসতে চায়। চেহারার কি হাল হচ্ছে দিনকে দিন! আর রাখা যাবে না!

কি হবে রেখে? না রাখাই ভাল। যত তাড়াতাড়ি শেষ হয়ে যাওয়া যায় ততই শান্তি। নিভা বড় হয়ে আসছে, নিজেরটা নিজে বেশ বুঝতে শিখেছে। ওকে নিয়ে আর চিন্তা করার নেই বেশিদিন। বাকিরা থাকলেই কি আর গেলেই কি। শুভা নিজে শেষ হয়ে গেলে তো সব যন্ত্রণার শেষ। কোন দরকার নেই ওষুধপত্তর খাওয়ার। ডাক্তার পালিত যতই হাসি-হাসি মুখে কথা বলুন না কেন শুভা বোঝে—খুব সহজে সারার রোগ নয় তার। শরীরটা তো তার নিজের। সে নিজে তো বুঝতে পারছে—ক্রমশ ভেতরে ভেতরে কেমন ভেঙে যাচ্ছে সে!

যাক। ভেঙে যাক। ভেঙে চুরমার হয়ে যাক। অনেক সয়েছে ও। আর দরকার নেই। কারো কাছ থেকে কোনদিন সে কিছু আশা করেনি—আজই বা করবে কেন? শুভার কাছে দুনিয়ার পুরুষেরা দু ভাগের—এক ভাগ যাদের কাছে তার শরীরটার দামই একমাত্র। আর এক ভাগ—যাদের কাছে তার শরীরটা লোভের বস্তু নয়।

'অর্ণবদা, উজ্জ্বলরা দ্বিতীয় দলের। কিন্তু তাদেরও তো সরাসরি স্বার্থ আছে—

কাজের স্বার্থ। বীথিকে নেওয়ার কি মানে হয়?

আর সুদর্শন? ওকে কোন দলে ফেলা যায়?

কোন দলেই নয় বোধহয়। ও একেবারে দলছাড়া। এই জীবনে কম পুরুষ তো দেখল না শুভা। সুদর্শনকে চিনতে তার ভুল হয়নি। সন্দেহ নেই মেয়ে নিয়ে খেলা করতে ভালবাসে যে সব ফিল্ম-হীরো-মার্কা ছেলে—সুদর্শন তাদেরই একজন। কিন্তু তার কাছে সুদর্শন আসে একটু অন্যরকম ভাবে—তাও শুভা বুঝতে পারে সুদর্শনের চোখের দিকে তাকিয়ে।

কেন? অন্যরকম কেন?

শুভা সত্যি সত্যি প্রেমে পড়ে গেল না তো? ভেবে নিজের মধ্যেই হেসে উঠতে ইচ্ছে করে তার। সেও প্রেমিকা হয়ে গেল? লভ্ করছে? হাসিতে চোখে জল এসে যায় যে! প্রেমের অভিনয় করতে করতে পাকা ঝানু হয়ে গেল শুভা। অভিনয় ছাড়া প্রেম ব্যাপার-টাকেই তো সে ধরতে পারে না।

আচ্ছা এসব ভেবে নিজের কাছে নিজেকে লুকোনো হচ্ছে না তো! নিজেকে মানুষ ঠিক ঠিক কতটুকু চেনে! সব সময়ই তো বদলে যাচ্ছে সবাই। তাহলে? তার নিজের মনটার তলাতেই কখন কি যে হয়ে যাচ্ছে তার ঠিক ঠিক খবর রাখতে পারছে কি সে?

পুরুষ দেখে দেখে ক্লান্তি এসে গেছে—তারপর আবার নতুন করে কোন পুরুষের কাছ থেকে কিছু আশা করার মানে হয়? আচ্ছা, সুদর্শনের কাছে সে কি আশা করে?

নিজেকে প্রশ্ন করে শুভা ঠিক উত্তরটা পায় না। বরং নিজের ভেতরটাকে আরো বেশি গোলমেলে মনে হয়। সুদর্শন যেন আর পাঁচজনের মতো না হয়। লোভী কাঙাল না হয়—এর চেয়ে বেশি আর কি আশা করে শুভা? সত্যিই তো আজকাল দু'দণ্ড মনে খুলে

কথা বলার মতো লোকও সুদর্শন ছাড়া আর কে আছে তার? যার জন্যে এতো পরিশ্রম, প্রতিদিন মুখে রক্ত তুলে খাটা—সেই নিভাও যে দিনের পর দিন বেশি করে পর হয়ে যাচ্ছে। তা হোক। বাড়ির একটা মেয়ে অন্তত সুখের মুখ দেখুক। তা হলেই এতো খাটনি সার্থক।

পরপর দুদিন ফোন করে পাওয়া যায়নি সুদর্শনকে। আজ সকালে পাওয়া গেল। গতকাল মীনাক্ষিকে জানিয়ে দিয়েছিল সুদর্শন—শুভাকে বলতে সকালে ফোন করার জন্যে।

'তুমি দেখছি ধরাছোঁয়ার বাইরে চলে যাচ্ছো!' শুভা অল্প অভিমানের গলায় বলে, 'কলকাতায় নতুন বন্ধু পেয়ে গেছ বুঝি?'

'না না, ভুল বুঝো না। একটা মস্ত কাজ হয়ে গেছে আমার। মিনির পারমিট বার করিয়েছি। আজ বিকেলে আমি ফ্রি। চলো সিনেমায় যাই। অনেকদিন সিনেমা দেখা হয়নি।'

'সিনেমা না—থিয়েটার দেখবো। বিকেলে আমার অ্যাপয়েন্টমেণ্ট আছে ডাক্তার পালিতের সঙ্গে। ওখান থেকে চলে যাবো একাডেমিতে। তুমি কাউণ্টারের সামনে দাঁড়িয়ে থেকো। সাড়ে ছটার সময়।'

'ঠিক আছে। এসো কিন্তু। আমাকে দাঁড় করিয়ে রেখে—'

'না না, দেরি হবে না। এরকম একটা ভাল খবর দিলে তোমার!'

'তুমি আছ কেমন? রিহার্সালে তো একেবারেই যাচ্ছ না।'

'এখন তো আর রিহার্সালে আমার প্রয়োজন নেই। তুমি গেছিলে নাকি অর্ণবদার বাড়ি?'

'না। অন্বীক্ষার একটি ছেলের সঙ্গে দেখা হয়েছিল, জানলাম। পরশু তো স্টেজ আছে ওদের। তুমি যাচ্ছ না?'

'সবাই স্বার্থপর!' কঠোর গলায় বলে ওঠে শুভা।

'খুব রেগে আছ—না?'

'আমার রাগে কারো যায় আসে না।' শুভার গলায় অভিযোগ বাজে।

হঠাৎ ফোনের মধ্যে বয়স্ক একজনের গলার স্বর শোনা যায়, 'আরে খুকুমণি' রাগারাগি সাক্ষাতে কোরো এখন লাইনটা ছাড়ো তো সোনা।'

'য়্যু রাস্‌কেল—ডোণ্ট আটার ননসেন্স।' সুদর্শন ধমকে ওঠে।

ফোনের তৃতীয় পক্ষও মন্দ কথা বলতে ছাড়ে না। সুদর্শন শুভাকে বলে, 'ঠিক আছে, সন্ধ্যেবেলায় থাকছি। অভদ্রটাকে ছেড়ে দাও লাইন।' বলে রিসিভার নামিয়ে রাখে।

সন্ধ্যেবেলায় দেখা হল কথামত।

একাডেমির সামনে বেশ খানিকটা ভিড়। এতো লোক নাটক দেখতে আসে?

গেটের কাছে টিকিট কাউন্টারের পাশে রাখা বড় পোস্টারটা সুদর্শন দেখে নেয়। রবীন্দ্রনাথের রক্তকরবী। একটিও আসন আর খালি নেই।

সুদর্শন এসে গেটটার কাছে দাঁড়াতে না দাঁড়াতেই শুভা এসে পড়ল।

বাসন্তী রঙের শাড়ির কালো চওড়া পাড়। কালো ব্লাউজ। সুন্দর দুটো ভুরুর মাঝখানে কালো টিপ মাথার এলো খোঁপার সঙ্গে ভারি চমৎকার মানিয়েছে। বেশ খুশি মুখে এগিয়ে এল শুভা।

'অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে আছ? আমি তো ডক্টর পালিতের ওখান থেকে বেরিয়ে আর গাড়ি পাই না কিছুতেই।'

'না—বেশিক্ষণ আসিনি। জাস্ট এসে দাঁড়িয়েছি আর তুমি এলে। কিন্তু টিকিটের কি হবে! হাউস তো ফুল! চলো—বরং কোন সিনেমা হাউসে ঢুকে পাড়।'

আসলে সেটা হলেই খুশি হয় সুদর্শন। নাটকে এমনিতেই তার ইন্টারেস্ট কম—তার ওপরে রবীন্দ্রনাথ। ঘণ্টা দুয়েক মাথা ধরার যোগাড় আর কি।

'টিকিটের চিন্তা তোমায় করতে হবে না।' বহুরূপীর অনেকেই আমার চেনা। ফোনে বলে দিয়েছিলাম। নাটকের লোক তো— ওটুকু সুবিধা আছে।'

আছে যে তা বোঝা গেল পরমুহূর্তেই। ভেতরে এসে এক মাঝবয়সী ভদ্রলোকের কাছ থেকে দুটো টিকিট নিয়ে এলো শুভা। হলের ভেতরে ঢোকার আগে চত্বরে দাঁড়িয়ে চা খেল দুজনে।

'ভেতরটা বেশ সুন্দর।' সুদর্শন চারপাশ তাকিয়ে বলে। বেশ কয়েকটি সুন্দরী মেয়ে এসেছে নাটক দেখতে। সুদর্শন একবার তাকায় মাত্র। কিন্তু তার ভেতরকার স্বভাবপুরুষটি জাগে না।

'তুমি আজ প্রথম এলে?'

'হ্যাঁ। সামনে দিয়ে গেছি অনেকবার—ভেতরে ঢুকিনি কোনদিন। এরকম বাগান থাকলে বেশ ভাল লাগে। অ্যাটমোসফিয়ারটা ভাল হয়।'

'এমন ভাল অ্যাটমোসফিয়ারের জায়গা কলকাতায় আরো আছে। খুঁজে নিতে হয় এই যা। বেশির ভাগ লোকই তো আসল কলকাতার খবর রাখে না।'

'সেরেছে। তোমারও দেখছি কলকাতারোগ ধরেছে! ধরারই কথা। অর্ণবদার ট্রেনিং তো!'

মুহূর্তে হাসি মিলিয়ে যায় শুভার মুখ থেকে। প্রতিবাদের গলায় বলে, 'অর্ণবদার ট্রেনিং তো নাটকে। সব ব্যাপারেই কি অর্ণবদার ট্রেনিং নাকি? আমার কি নিজের দেখার চোখ নেই? নিজে ভাববার মগজ নেই? তুমি ভাবো কি?'

'তবু—যাদের সঙ্গে বেশি মেশা যায়—তাদের প্রভাব পড়ে তো।'

'আমি তো বহু বাজে লোকের সঙ্গে মিশি, তাহলে তাদের প্রভাব থেকেও তো আমার বাদ থাকার কথা নয়।'

সুদর্শন হেসে বলে, 'তুমি যে সব বাজে লোকদের সঙ্গে মেশ তাদের কাউকে কাউকে তো চিনি আমি।'

'তাদের একজনকেও চেননা তুমি।'

'তোমাকে চিনি—এই অনেক।'

'আমাকেও চেন না।' শুভার স্বরে অভিমান না রাগ ঠিক বুঝতে পারে না সুদর্শন।

'চিনিয়ে দাও। আমি তো চিনতেই চাইছি।' সুদর্শন আগের মতই লঘু স্বরে বলে যায়।

'যতদিন না চিনবে—ততদিনই ভাল লাগবে। চিনলে—'

'তা যদি বলো—সে তো আমরা কেউ কাউকে চিনি না।'

'এই ভাল।' শুভা আগের মতোই নামানো গলায় বলে; 'চেনা বেশি হলেই মুশকিল—তখন ভাল মানুষকেও বোধহয় আর ভাললাগে না।'

'আর খারাপ মানুষকে? আমার ভবিষ্যৎটা একটু আঁচ করে নিই।'

শুভা প্রথমে চুপ করে থাকল। চোখের পাতা নামানো। কিন্তু সুদর্শনের বলার ধরণ শুনে আর গম্ভীর হয়ে থাকতে পারল না। চোখ তুলল। সুদর্শন সকৌতুকে তাকিয়ে আছে।

'বললে না—আমার ভবিষ্যৎটা?' আরো লঘু করে বলে সুদর্শন।

'অন্ধকার।' শুভা এবার হাল্কা হয়ে আসে।

চায়ের কাপ-প্লেট রেখে দিয়ে সুদর্শন দাম মিটিয়ে দেয়।

তারপর হলের দিকে এগোতে এগোতে বলে, 'অন্ধকারে মাথা ধরে যদি, তুঘণ্টা কিছুইতো ঢুকবে না মগজে।'

শুভা সুদর্শনের মুখের দিকে তাকায়।

সুদর্শন আবার বলে, 'বুঝতে না পারলে বুঝিয়ে দেবে তো? টেগোর মিনস্ সামথিং হাই। আমাদের ধরা ছোঁয়ার বাইরে।' এরপর সুদর্শন একটা পুরোনো রসিকতা করে, 'বলতে গেলে এই ভদ্রলোকের জন্মেই লেখাপড়াটা ছাড়তে হলো আমায়।'

'খুব পুরোনো রসিকতা। বস্তা পচা। যেখানে সেখানে জোক কোরো না। সবাই বুঝে নেবে কলকাতায় তুমি বেশিদিন আসোনি।'

কথাটা শুনে সুদর্শন আহত হল।

এ ধরনের খোঁচা খুব খারাপ লাগে। একে রবীন্দ্রনাথের নাটক। সারাক্ষণ কিছু না বুঝে বসে থাকতে হবে। নাটক দেখার পরও এমন চলবে নাকি? এই হল কলকাতার—

'এই, রাগ করলে নাকি? আমার কিন্তু একটু-আধটু খোঁচা দেওয়া বাতিক আছে। দারুণ মজা লাগে। অবশ্য খুব কাছের লোক না হলে করি না। তুমি আবার সিরিয়াসলি নিও না যেন।' আসনে বসে শুভা বলল।

এই জন্যেই শুভাকে এতো ভাল লাগে তার। শরীর দিয়ে শরীর গাঁথলেই মেয়ে আপন হয়ে ওঠে না—এটা সুদর্শন বোঝে। আপন হয়ে ওঠার জন্যে অন্য কি একটা যেন দরকার হয়। অন্য একটা গুণ যা সুদর্শন ব্যাখ্যা করতে পারবে না—শুধু বলতে পারে সেই গুণটা শুভার মধ্যে পুরোমাত্রায় আছে।

এই মুহূর্তে খুব নিচু গলায়, প্রায় কানের কাছে মুখ এনে শুভা ওই কথাগুলো বলার পর—সুদর্শনের ভেতরকার সাময়িক বিরক্তি একেবারে মুছে যায়। খুশিতে সে শুভার হাতটা নিজের হাতের মধ্যে টেনে নেয়।

নাটকের মাঝখানে যেমন, তেমনি নাটক শেষ হওয়ার পর হল থেকে বেরিয়ে কোন কথা বলে না সুদর্শন। চওড়া পেভমেন্ট ধরে এগোতে থাকে পাশাপাশি। ক্যাথিড্রাল চার্চের পাঁচিলের ধারের গাছগুলো সব ফুলে ফুলে সাদা হয়ে আছে। এখান দিয়ে হাঁটলে বেশ গন্ধ পাওয়া যায়। এত ভাল লাগছে গন্ধটা—একটু দাঁড়িয়ে যেতে ইচ্ছে করছে। চার্চ পেরিয়ে বিড়লা প্ল্যানেটারিয়ামের কাছে এসে প্রথম কথা বলে শুভা, 'কি হল? কথা নেই যে। কেমন লাগল কিছুই বললে না যে!'

'একেবারেই বুঝিনি তা নয়। বুঝেছি কিছুটা। তবে তাতেই

বোঝা গেছে নাটকটা সত্যিই ভাল। আড়াল থেকে সারাক্ষণ যে রাজা কথা বলছিল—শুনলে গায়ে কাঁটা দিয়ে ওঠে। এই ধরনের প্রোডাক্সন আমি আর কখনো দেখিনি।'

'আরো দেখবে। কলকাতায় এসে নাটক না দেখাটা সত্যিই বোকামি। ভুল বলছি?'

'এ নাটকটা দেখার পর মানতে হবে।'

খানিকক্ষণ বাদে সুদর্শন বলে, 'চলো তোমাকে পৌঁছে দিই।'

'পৌঁছোনোর কি দরকার। তবে হাঁটতে হাঁটতে এগোতে পারো খানিকটা। হাঁটতে ভাল লাগছে। আজকাল তো বাড়ি থেকে বের হচ্ছি না খুব একটা। তোমার মিনি বের হলে মাঝে মাঝে হুমদাম্ ঘুরবো।' বলে মৃদু শব্দ তুলে হাসে শুভা।

'টিকিট না কেটেই?'

'একটা ফালতু যাত্রীকে না হয় দিলেই একটু জায়গা।' ফালতু কথাটা হঠাৎ তীক্ষ্ণ করে ছুঁড়ে দেয় শুভা।

সুদর্শন চাপা যন্ত্রণাটা বুঝতে পারে। কিন্তু চেষ্টা করেও অনেক সময় সে অন্যদের মত গুছিয়ে কথা বলতে পারে না বলে চুপ করে থাকতে হয় তাকে। এই সব সময়গুলোতে খুব অস্বস্তি লাগে তার।

শুভার এই হঠাৎ হঠাৎ পরিবর্তনগুলো আগে লক্ষ্য করেনি সুদর্শন। এ কি নাটক করার প্রভাব? সুদর্শন বরাবর শিখে এসেছে পছন্দসই মেয়েদের কাছ থেকে কত সস্তায় কত বেশি ছিনিয়ে নেওয়া যায় তার কৌশল। কিছু না চাইলেও কাউকে কিছু দিতে হয় কিভাবে—তা তো জানা নেই।

'এভাবে বলো না শুভা। আমি তোমায় ফালতু ভাবতে পারি?'

'আমি ফালতু ছাড়া আর কি? আমার কি আছে বল? এতকাল অর্ণবদা উজ্জ্বলরা সহানুভূতি দেখিয়েছে বলে নাটক করতে পেরেছি—এখন তাতেও বাধ সাধলে আমার দেহ, আমার বরাত।'

সুদর্শন বুঝতে পারে শুভার ভেতরের একটা উত্তেজনা বাড়ছে

ক্রমশঃ। প্রথম দিন দেখে মনে হয়নি—মেয়েটা এতো আবেগে টান টান হয়ে যায়।

'তা যদি বলো—আমি তো তাহলে তোমার থেকেও ফালতু।'

'এই কদিন কলকাতায় থেকে নিশ্চয়ই বুঝেছো—এখানে সাক্‌সেস-ফুল হতে গেলে—দুটো জিনিসের অন্ততঃ একটা বেশ খানিকটা থাকা দরকার। রূপ এবং রূপেয়া। তোমার দুটোই আছে।'

'প্রথম প্রথম ও ব্যাপারে আমিও খুব কনফিডেণ্ট ছিলাম।'

'এখন?'

'এখন মনে হয় আমার মধ্যে খুব গণ্ডগোল আছে। অম্বরদের মতো আমি ঠিক একবগ্‌গা হতে পারছি না। ওরা আসে কলকাতা জিত্‌তে দারুণ স্পীড্‌ নিয়ে। আর সেই স্পীডটাকেই মেনটেন করে বরাবর।'

'তোমারই বা স্পীডের অভাব কোথায়? কলকাতায় বসে বছরের পর বছর ধন্না দিয়ে লোকে যা পারছে না—এই ক'মাসেই তুমি তা করে নিয়েছো। মিনি বার হচ্ছে। তোমায় আর রোখে কে?' শেষের কথাটায় যেন হাসি মিশে এলো।

'সে তুমি যাই বলো। আমি কিন্তু খুব বোর ফিল করছি দিনের পর দিন। ভেবেছিলাম—কলকাতায় এলেই ম্যাজিকের মত সব হয়ে যাবে।'

'হচ্ছে না?'

'হচ্ছে। কিন্তু আমি ঠিক স্যাটিস্‌ফায়েড্‌ নই।'

'ওটা ভেবে লাভ নেই। এবার হোটেল ছেড়ে একটা ঘর ছাখো। বিয়ে করে নাও। ঘরে একটা বউ থাকলে সব অন্যরকম মনে হবে।'

'পাগল হয়েছ? বিয়ে মানেই সব ঠাণ্ডা। এক মাস পরেই আরো বোর হবো। শিলিগুড়িতে বন্ধুগুলোকে দেখলুম তো।'

'সবাই বোর হয়?'

'সব্বাই। হানড্রেড্‌ পারসেণ্ট।'

'অর্ণবদা ?'

সুদর্শন উত্তর দিতে পারে না। চিন্তা করে। খানিকক্ষণ পরে বলে 'আগে তো ঘর হোক। দেখি কাল, সিন্ধুর সঙ্গে দেখা হবে,—ওকে বলবো একবার।

'কে সিন্ধু ?'

'করুণাসিন্ধু ব্যানার্জী। তুমি চেনো না কি ?' সুদর্শন লক্ষ্য করে শুভার মুখের ভাব আচমকা বদলে যায় যেন।

'তুমি ওকে চেনো কি ভাবে ? কি রকম দেখতে বলতো ?'

'পার্ক স্ট্রীটে আলাপ।' বলে সুদর্শন বর্ণনা দেয় সিন্ধুর।

'কি কাজ করে ও ?'

'বলে তো হোটেলে কাজ করে। অম্বর বলেছিল ছেলেটার মধ্যে নাকি কিরকম একটা রহস্য আছে। আমি জানি না—মানে অম্বরও ভালভাবে জানে না। তবে আমার কিন্তু ছেলেটাকে ভাল লাগে তোমার পরিচয় কিভাবে ? নাটক নিয়ে ?'

'নাটক নয়। ফিল্মের ব্যাপারে যোগাযোগ হয়েছিল। আমি শেষ পর্যন্ত নিইনি রোলটা। খুব আন্‌ইম্পর্টেন্ট রোল ছিল '

'ওর ফিল্ম লাইনে যোগাযোগ কি ভাবে ?'

'চেনা-জানা আছে। সেই ফিল্মটা ছিল ওর এক বন্ধুর। তা তোমার সঙ্গে আলাপ হয়েছে—অথচ ফিল্মের কথা বলেনি ?'

'একেবারে বলেনি তা নয়—তবে ও যে স্টুডিও লাইনে যাতায়াত করে তা বলেনি। কাল জিজ্ঞেস করবো—রাতে দেখা হবে।'

'আমার সঙ্গে আবার দেখা হবে কবে ? এবার থেকে তো তোমার দেখা পাওয়াই ভার হয়ে উঠবে।'

'কে বললো ? কালই দেখা হতে পারে তোমার সঙ্গে—কাল সকাল দুপুর বিকেল কোন কাজ নেই।'

'কাল দুপুরের দিকে বেরলে কেমন হয় ?'

'দারুণ হয়। কিন্তু সন্ধ্যেবেলায় ফিরতে হবে। সিন্ধুকে কথা

দেওয়া আছে।'

সিন্ধুর কথা উঠতেই আবার শুভার মুখের রেখা অন্যরকম হয়ে যায়। বলে, 'অবশ্য আমারও শরীর কিরকম থাকবে বলতে পারছি না। এটুকু হেঁটেই কিরকম টায়ার্ড ফিল করছি।' হাঁটা থামিয়ে পেছন দিকে তাকায় শুভা। দূরে একটি মিনিবাস দেখে বলে, 'আমি ওই বাসটাতে উঠে যাই।' বলে পথে নেমে যায়।

সুদর্শন বুঝতে পারে আবার কি একটা হয়ে গেল শুভার মধ্যে। এতো দ্রুত সরে যায় শুভা। বুঝতে না বুঝতেই। 'যদি শরীর ভাল থাকে—আমায় একটা ফোন করো তাহলে?'

শুভা মাথা কাত করে একবার। সুদর্শনকে আর দেখে না তখন। মিনি এগিয়ে এলে—সুদর্শনই হাত দেখিয়ে থামায়।

শুভা উঠে যায়।

সিঁড়িতে পা দিয়ে চকিতে একবার ঘাড় ফেরায়। ছাখে সুদর্শনকে। হাসি মুখ। কেমন দুঃখ-জড়ানো হাসি। কেন যেন এই হাসিটাই সবচেয়ে বেশী টানে সুদর্শনকে। কত সুন্দরী মেয়েকে খুব ঘনিষ্ঠতার মধ্যে হাসতে দেখেছে সে। কিন্তু কারো সংগেই শুভার এই হাসি মেলে না। মেলে না বলেই বোধহয় এতো টানে তাকে। মিনিবাসটা এগিয়ে যাওয়ার পর সুদর্শন ফেরার পথ ধরে। হঠাৎ নাটকের অন্ধকারের রাজার গলা মনে পড়ে। রাণীর নামটা সুদর্শনা—তার নামের স্ত্রী-রূপ। আচ্ছা, শুভা সুদর্শনের আসল রূপটা দেখলে আঁতকে উঠবে না?

॥ সতেরো ॥

রাতে হোটেলে ফেরার পর সুদর্শন শুনল অর্ণব মিত্র ফোন করেছিল তাকে। আসছে কাল সকালে বাড়িতে যেতে বলেছে শিলিগুড়ি থেকে কে নাকি একজন এসেছিল।

একটু চিন্তিত হল সুদর্শন! শিলিগুড়ি থেকে লোক এসেছে মানে কি? কিছু একটা ঘটে যায়নি তো! বুকটা ছাঁৎ করে ওঠে একবার কিন্তু অর্ণবদাকে কি সে টেলিফোন নাম্বার দিয়েছিল! হ্যাঁ, হ্যাঁ— একদিন হোটেলের ঠিকানা আর ফোন নম্বর দিয়ে এসেছিল! সে বেশ কয়েকদিন আগে। অর্ণবদার কাছে দাদার চিঠি আসার পর।

কার কি হতে পারে? দাদা? বৌদি? ভাইপো দুটো? পর প অনেকগুলো মুখ আগে পরে করে, কখনো বা একটার ওপর আ একটা এসে অনেকক্ষণ ঘুম না আসা পর্যন্ত উদ্বিগ্ন রাখল তাকে। ধ্যা ছাই—মরুক গে—যা হয় হোক—আমার কি! সুদর্শন আলে নিভিয়ে পাশ ফিরল। সব সম্পর্ক তো চুকিয়ে দিয়ে এসেছে সে কার কি হলো না হলো তাতে তার কি এসে যায়। দাদা আবার চি লিখে দুঃখ করেছে অর্ণবদার কাছে? দুর্ব্বল মানুষ যারা তাদের দুঃ ছাড়া করার আছেটা কি? সুখ করতে গেলে ক্ষমতা দরকার। সবা সুখ করতে পারে না। তার জন্যে মুরোদ চাই। দাদার তা নেই তাই বন্ধুর কাছে দুঃখ প্রকাশ করেছে। অর্ণবদার মুখে সেদিন কথা শুনেই বেশ চটে গেছিল সুদর্শন। নেহাৎ দাদার অনেকদিনের ব এবং তাঁর স্ত্রীর সামনে বসেছিল বলে সুদর্শন মুখ সামলে নিয়েছিল না হলে স্বয়ং দাদার মুখের ওপর বলতেও তো ছাড়েনি সুদর্শন। কে বলবে না? নিজে কি করেছে এতোটা বয়স পর্যন্ত। সম্পত্তি কোথা আগে বাড়বে না কমে গেল। এ যুগে বোকারা ছাড়া আর কে

সততা, দয়া, কৃতজ্ঞতা—এসব শব্দগুলোর মানে জানে না। কিন্তু সত্যিই তো—কে বা এলো শিলিগুড়ি থেকে? সত্যিই যদি কারো কিছু ঘটে গিয়ে থাকে। কিরকম যেন ভয় পেয়ে গেল সুদর্শন। দাদার মুখ মনে পড়ল আবার! নিজে কিছু করতে পারলে না আর আমার চরিত্র গেল বলে কিনা হা-হুতাশ। তুমি যে এতকাল ধরে চরিত্র ধুয়ে পুঁছে রাখলে—তাতে কি লাভ হল? এদের কিছুতেই বোঝানো যাবে না। যুগটা ওদের যুগ থেকে অনেক আলাদা। অবিশ্যি অর্ণবদার কথাটা স্বতন্ত্র।

চরিত্রকে ধোয়া তুলসীপাতাটি করে রাখলে মাস্টারি করা ছাড়া আর কি কাজে লাগে? তাই বলেছিলুম—'দাদা এবার মিউনিসি-প্যালিটির ভোটে তুমি দাঁড়িয়ে পড়। তুমি দাঁড়ালে আমাদের অনেক সুবিধে আছে—বোঝ না?'

'না। ওতে আমি নেই।' খুব স্পষ্ট জবাব দিয়েছিল দাদা।

'এখানে সচ্চরিত্র মানুষ বলতে সবাই আগে তোমার কথা বলে।'

'আর তার ভাইটি সম্পর্কে কি বলে?' সঙ্গে সঙ্গে বলেছিল দাদা।

ওই এক রোগ দাদার। মুখের ওপর খুব স্পষ্ট করে বলতে পারে। অথচ মানুষটা কত দুর্বল।

সুদর্শন আবার পাশ ফিরে শোয়। সবকিছু ভুলে শুভার মুখটা মনে করতে চায়। শুভা মিনিতে উঠে যাচ্ছে। ঘাড় ফিরে তাকাল। হাসি মুখ। দুঃখ জড়ানো।

একটা নীল সমুদ্র।

পুবের আকাশটার মাথায়, মেঘের গায়ে গায়ে ভোরের আলো। দিগন্ত থেকে নৌকো বেয়ে জেলেরা আসছে মাছ ধরে, ডাঙার দিকে। বীচের ওপর স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে আছে শুভা। সমুদ্রের বাতাসে শুভার সাদা ফেনার মত শাড়ির আঁচল ফুলে ফুলে উঠছে। আলো বাড়ছে, তবু শুভার মুখের প্রতিটি রেখা যেন খুব ভাল করে দেখতে পাচ্ছে না

সুদর্শন। আবছা হয়ে যেন আরো আকর্ষণীয় হয়ে উঠছে।

বীচের বালির দিকে হঠাৎ চোখ পড়তেই সুদর্শন চমকে ওঠে। ঝাউবনের ওপর থেকে বালির ঢাল বেয়ে একটা ঘন সবুজ রঙের সাপ নেমে আসছে শুভার পায়ের কাছে।

সুদর্শন চিৎকার করে ওঠে, শুভা সাপ—সাপ। তোমার পায়ের কাছে। শুভার কোন খেয়াল নেই। সূর্যোদয় দেখার জন্যে শুভা আকুল। সুদর্শনের চিৎকার তার কানে পৌঁছচ্ছে না সম্ভবত।

ভোরবেলা ঘুম ভেঙে যাওয়ার পর শুয়ে শুয়ে মনে করতে চায়, রাতের স্বপ্নটার—এর চেয়ে আর কিছু বেশি মনে করতে পারল না সে। স্বপ্নের মধ্যে হঠাৎ সমুদ্র এলো কেন? ছোটবেলায় কোন এক সময় সুদর্শন যে সমুদ্র দেখেছিল সে কথা তো ভুলেই গেছে সে। প্রায় বিশ বছর আগের কথা খুব আবছা আবছা মনে আছে। মা, বাবা আর দাদা ছিল সঙ্গে।

খুব ভোরবেলা হোটেল থেকে বেরিয়েছিল তারা। দীঘার কাফেটারিয়ার কাছটায় বাঁক ঘুরে যেতেই বাবা একজনকে দেখিয়েছিলেন। বীচের ওপর দাঁড়িয়ে আছেন। ধুতি আর সাদা সার্ট পরা—লম্বাচওড়া মানুষ।

বাবা বলেছিলেন, 'সুদা, ওই মানুষটিকে দেখছিস। উনি হলেন ডাক্তার বিধানচন্দ্র রায়। খুব বড় ডাক্তার। আমাদের মুখ্যমন্ত্রী।'

ডাক্তার রায় পেছনে দুটি হাত রেখে নিঃশব্দে সমুদ্রের দিকে তাকিয়েছিলেন। মা অনেকক্ষণ পর সুদর্শনকে বলেছিলেন, 'কিরে সুদা, বড় হলে তুই তো ডাক্তার—'

সঙ্গে সঙ্গে দাদা বলেছিল, 'সুদা ডাক্তার হবে মা? দেখে নিও—বড় হলে ও যদি ডাকাত না হয় তো কি বলেছি।' ছোটবেলা থেকেই দাদা ওই রকম কথা বলত।

জলের দিকে আমরা অনেকটা এগিয়ে একেবারে নির্জন জায়গায়

মা দাঁড়িয়ে পড়েছিল। স্বপ্নের মধ্যে শুভাও দাঁড়িয়েছিল ঠিক ওইভাবে কিন্তু মার কাছে সবুজ সাপ তো আসেনি। স্বপ্নের মধ্যে শুভার মুখ খুব পরিষ্কার দেখা না গেলেও—বেশ আনন্দ পাচ্ছিল সুদর্শন। এ সুখ নারীসঙ্গে পাওয়া যায় না। দেহখেলার মজায় সে সুখ চাইলেই পাওয়া যায়—এ আনন্দটা তেমন সুলভ সস্তা নয়। বুকের মধ্যে বড় করে বাতাস টানার মতো আনন্দটাকে আরো বেশি করে পেতে চাইছিল। অথচ পাচ্ছিল না।

শুভার মুখটা স্পষ্ট করে না দেখা গেলেও বোঝা যাচ্ছিল মুখটা দুঃখের। মার মুখটাও তো এই রকম দুঃখের ছিল। সুদর্শন মায়ের মুখের সব পেয়েছে—শুধু দুঃখটা পায়নি। মা তাকে সব দিয়ে গেছে, দুঃখটা নিয়ে গেছে একা একা। বড় ছেলে চেহারা পেয়েছে বাপের আদলের। ছোটর মত মার ডাকসাইটে রূপ উজাড় করে পায়নি। মার কি কোথাও দুঃখ ছিল? সুদর্শন তো কিছুই জানে না। ছোটবেলায় ভুলে একদিনও তা জানতে চাইনি। চাওয়ার কোন রকম সুযোগও মা তাকে দেয়নি। মা তাকে শুধু সুখ দিয়ে যেতে চেয়েছে। সুখ পেয়েও এসেছে সুদর্শন বরাবর। অল্পবয়সে মা মারা গেল, বেশ খানিকটা বড় হতে বাবা। কিন্তু কোন কিছুতেই তেমন বড় দুঃখ পায়নি সুদর্শন। তবে আজ হঠাৎ ওদের কথা মনে করে তার মন খারাপ করছে কেন? দাদার কিছু হলো না তো?

সেন্টিমেন্ট! এ কি হল তার। সেও কি শেষ পর্যন্ত আর পাঁচটা দুর্বলচিত্ত লোকের মত সেন্টিমেন্টাল হয়ে উঠছে? সুদর্শন নিজেকে ব্যঙ্গ করে।

বিছানায় শুয়ে শুয়ে ভাবতে ভাবতে আবার ঘুম এসে যায়। ঘুম ভাঙে হোটেল-বয়টার ডাকে।

'সাব আপকা টেলিগ্রাম।'

টেলিগ্রাম!

চমকে ওঠে সুদর্শন। দ্রুত বাইরে এসে টেলিগ্রাম নেয় সই করে।

খুলতে গিয়ে ভয় পায়। নিজের ঘরে ফিরে আসে ছোটার মত করে। কাল রাতে অর্ণবদা ফোন করে জানিয়েছে—লোক এসেছে শিলিগুড়ি থেকে। রাতে ঘুমের মধ্যে সুদর্শন স্বপ্ন দেখল দীঘার সমুদ্র—কতকাল আগে মা বাবা আর দাদার সঙ্গে গেছিল। সকাল হতে না হতেই টেলিগ্রাম।

টেলিগ্রাম পড়ে অবাক হয়ে যায় সুদর্শন।

শিলিগুড়ি থেকে দাদাবৌদি তাকে শুভেচ্ছা জানিয়েছে। আজ তার জন্মদিন।

জন্মদিন! আমার! ও, হ্যাঁ। তাইতো, এটা তো, শ্রাবণ মাস! আজ তাহলে—সুদর্শন একেবারে ভুলে গেছিল। সুদর্শনের ভেতরটা কেন যেন ওলটপালট হয়ে যায়। জন্মদিন! তার জন্মদিনটা তাহলে কেউ কেউ মনে রাখে!

শুভার টেলিফোন এলো তার অল্প কিছুক্ষণ পরই। সুদর্শন নিজের থেকেই বলল টেলিগ্রামের কথা। শিলিগুড়ি থেকে লোক এসেছিল অর্ণবদার কাছে সে কথাও জানাল। শুভা দুপুরে আসছে সুদর্শনের কাছে।

একবার অর্ণবদার বাড়ি থেকে ঘুরে আসা দরকার। কেমন যেন আচ্ছন্নের মতো হয়ে পোশাক বদলে নিল সে। আশ্চর্য! তারও একটা জন্মদিন আছে! আছে একটা জন্মসূত্র! এতো সহজ স্বাভাবিক ঘটনায় মনটা এমন করে ওঠে কেন?

অর্ণবদার বাড়ি গিয়ে দেখল সুদর্শনেরই বয়সী চারটে ছেলে অর্ণবদার সঙ্গে গল্প করছে। তাদের মধ্যে একজনের পরনে পায়জামা পাঞ্জাবি, একজন প্যান্টের ওপর চাপিয়েছে গুরুপাঞ্জাবি অন্য দুজনের একজনের গোলগলা হলুদ গেঞ্জি আর ট্রাউজার, চতুর্থজন সার্ট ট্রাউজার পরেছে। পোশাক নানান ধাঁচের হলে কি হবে, সকলের আলোচনা বইছে একই খাদে। সবাই সিরিয়াস। শক্ত শক্ত কথা বলে যাচ্ছে অর্ণবদার সঙ্গে।

আচ্ছা, কলকাতায় এই ধরনের ছেলেপিলে কত আছে? কত ছেলে নাটক করে? ছোট ছোট কাগজ ছাপিয়ে বুঁদ হয়ে থাকে কতজন? সংখ্যায় যে এরা এতটা বেশি হতে পারে—তা সুদর্শনের ধারণাতেও ছিল না। একই সময়ে একই শহরে আছে কিন্তু কত আলাদা এই অম্বর, অর্জুন, দিলীপ ভট্টচাজ, করুণাসিন্ধু কিংবা সুদর্শন সান্যালের থেকে এরা সব কি আর একটু বড় হলে এক-একটা অর্ণব মিত্র হয়ে উঠবে?

ছেলেগুলো এসেছিল অর্ণব মিত্রকে একটা সভায় নিয়ে যাওয়ার প্রস্তাব নিয়ে। অজয় চৌধুরীর স্মরণ-সভা। অর্ণব যেতে রাজি হয়েছে। মূলতঃ অজয় চৌধুরীর প্রতিভা নিয়েই কথা বলছিল সকলে। কত যে খোঁজখবর রাখে এই ছেলেগুলো। আচ্ছা এরা কি আর কিছুই করে না! নিশ্চয়ই করে! মেয়ের নেশা, সিগারেট, মদ তো আছেই—তার চেয়েও অনেক বেশি কিছু আছে যা সুদর্শনেরও নেই—সে খবরও সুদর্শনের অজানা নয়। এই তো সেদিন—গ্লোবের পাশ দিয়ে—কি যেন নামটা রাস্তার—এক গ্যাঙ কবিকে দেখল সুদর্শন। তার মধ্যে কে এক ভক্তি ব্যানার্জি—কলকাতার এক ডাকসাইটে কবিও ছিল নাকি। সুদর্শন আঁচ করতে পারে—আঁতেলদের মধ্যেই নানান ভাগ আছে। অর্ণবদারা অন্যরকম, এদের মতো নয়। এরা বোধহয় খানিকটা এনজয় করতে শিখেছে। অর্ণবদারা আদর্শদের খোঁয়াড়ে আটক পড়ে আছে।

ছেলেগুলো চলে যাওয়ার পর অর্ণব মাথা তুলে তনয়াকে ডাকল। তনয়া ভেতর থেকে সাড়া দিয়ে ঘরে এলো। সুদর্শনের দিকে তাকিয়ে বলল, 'অভিনন্দন—অভিনন্দন যুবরাজ—আজ তোমার জন্মদিন!'

অর্ণব বলল, 'একটি লোকের মারফত দাদা তোমায় প্যান্ট-ক্লোথ পাঠিয়ে দিয়েছে।'

'আমি নিয়ে আসছি।' বলে তনয়া ভেতরে চলে যায়।

'আজ নাটক আছে না আপনাদের?' সুদর্শন প্রশ্ন করে।

অর্ণব খানিকটা যেন গম্ভীর গলায় বলে, 'আছে। তবে খুব একটা ভাল হবে বলে মনে হচ্ছে না।'

'সেকি? যদি বুঝতেই পারেন ভাল হবে না—তাহলে নামাচ্ছেন কেন?'

'উপায় নেই। নাটক নামাতেই হচ্ছে!'

'খারাপ হবে ভাবছেন কেন? শুভা নেই বলে?'

'সেটা তো একটা বড় কারণ বটেই। আরো আছে।'

'ভাল রিহার্সাল হয়নি?'

'গ্রুপের মধ্যে এতকাল যে জিনিষটা হতে পারেনি—এখন তাই হচ্ছে। ভেতরে ভেতরে নিজেদের মধ্যে গণ্ডগোল পাকিয়ে বসেছে ছেলেরা।'

'উজ্জ্বল আর শক্তি তো? আমি যতদূর জানি উজ্জ্বলের কোন দোষ নেই।'

'তুমি যেমন চট করে উজ্জ্বলের পক্ষ নিতে পারো—আমি তো তেমন করে পারি না। পারলেও তা গ্রুপের পক্ষে মঙ্গলের হবে না। অথচ এই মাত্র কটা দিনেই পরিস্থিতি এমন জায়গায় এসে দাঁড়িয়েছে—পক্ষ না নিয়ে উপায় নেই।'

ইতো মধ্যে তনয়া এসে গেছিল প্যান্ট লেংথটা হাতে নিয়ে। অর্ণবের কথার শেষাংশ শুনে বলে উঠল, 'এর নাম নাটক বুঝলে একেই বলে গ্রুপ থিয়েটার। খাটনি, সময়, মগজ—সবকিছু দাও—তবুও নিস্তার নেই—ঘরের শান্তিটুকুও শেষ পর্যন্ত জলাঞ্জলি দিতে হবে।'

তনয়ার বলার ধরন দেখে সুদর্শন বুঝতে পারে—তরল ভাবে নয়, বেশ সিরিয়াসলি কথাগুলো বলছে তনয়াদি। তার মানে অর্ণবদার পারিবারিক জীবনে তার ছায়া পড়েছে।

'দিতে কোন আপত্তি নেই। বরং তা দিতে পারলেই তো সুখ

অন্তত একটু আশ্বাস নিয়ে তো বাঁচা যায়—দেওয়ার মতো এখনো কিছুটা আছে আমার।' বলে কিছুটা সময় থেমে থাকে অর্ণব। তারপর বলে, 'আচ্ছা, শুভার খবর কি বল তো—কিছুতেই আর দেখা হচ্ছে না মেয়েটার সঙ্গে।'

'ভাল না। ক্রমশঃ তো দেখছি দুর্বল হয়ে পড়ছে।'

তনয়া জিজ্ঞাসা করে, 'তোমার সঙ্গে দেখা হয় নিয়মিত?'

'নিয়মিত না হলেও হয়।'

'বেচারা! মেয়েটার লাইফটা এতো স্যাড!' নামানো গলায় তনয়া কথাটা বলে।

সুদর্শন একবার তাকিয়ে নেয় তনয়ার মুখের দিকে। তার মানে তনয়াদি কি জানে শুভার ফ্যামিলি ট্রাবল্‌স্‌ এর কথা।

'এই নাও— কাপড়টা বেশ ভাল।' বলে হাত বাড়িয়ে কাপড়ের প্যাকেটটা তনয়া এগিয়ে দিল। তারপর আবার 'আমি আসছি বলে' ভেতরে চলে গেল।

'শুভা তো খুব বিপদে পড়েছে—' সুদর্শন নতুন কথা ভাঙল।

'কি বিপদ?'

'এই টাকাপয়সার ব্যাপারে। আপনি তো ওর অফিস ক্লাবও বন্ধ করতে বলেছেন। বাড়িতে বসে থেকে তো আর সংসার চালাতে পারছে না।'

'এতদিন কষ্ট করেছে—আর কটাদিন কষ্ট করতে বলো তারপর দেখবে সব ঠিক হয়ে যাবে।' অর্ণব বেশ আশ্বাস নিয়ে বলে।

এক প্লেট মিষ্টি আর জলের গ্লাস নিয়ে তনয়া ঘরে এল এবার। সুদর্শনের হাতে দিয়ে বলল, 'চট করে খেয়ে নাও।'

'একি কাণ্ড। এতো মিষ্টি খাবে কে?'

'আর বুড়োমো করো না তো।'

'জন্মদিনটা ছেলেমানুষিরই তো। বুড়ো বয়সে আবার জন্মদিন কি?'

'তোমার মা থাকলে কি বুড়োমানুষি মানতেন?'

'তা মানতেন না। প্রতিবারে জানান দিয়ে ছাড়তেন—আজ আমার জন্মদিন। দাদা-বৌদিও চলেছে সেই পথে।'

'আজ সন্ধ্যেবেলা আসবে নাকি আমাদের নাটক দেখতে?'

'আজ আসতে পারবো না অর্ণবদা। অম্বরের সঙ্গে বেরতে হচ্ছে।'

'তোমার তো ব্যবস্থা পাকা শুনলাম। এবার সত্যি সত্যি তুমি কলকাতা জয় করতে নামছো।' অর্ণব হেসে বলে।

'দেখুন আগে—কে কাকে জয় করে।'

'দেখছো—কেমন প্রম্পট্ অ্যানসার দিচ্ছে!' তনয়া শব্দ না করে হাসল।

সুদর্শন হোটেলে ফিরে দেখল তার জন্যে দিলীপ ভট্চাজ অপেক্ষা করছে। শুভার আসার কথা। শুভাকে না দেখে দিলীপকে দেখে মোটেই খুশি হল না সুদর্শন।

'গুরু, সাতসকালে কোথায় ডিউটি মারতে গেছিলে?'

'গেছিলাম এক আত্মীয়ের কাছে। তা তুমি হঠাৎ!'

'হঠাৎ নয়, সেদিনের সেই ব্যাপারটার আজ ফাইন্যাল হয়েছে।'

'তোমার ভাইয়ের ব্যাপারটা তো—সে তো আমি বলেই দিয়েছি। এর মধ্যে একদিন আসতে বলে দাও আমার এখানে।'

'ধ্যাৎ—সে কেস নয়। সে তো আসবে আমার ভাই।'

'তবে—?'

'ব্বাঃ। বেমালুম ভুলে মেরে দিয়েছ? অম্বর আর অর্জুনকে প্রমিস করলে সেদিন—স্যুইট এইটইন্—'

সুদর্শনের মুখ গম্ভীর হয়ে গেল নিমেষে। পরমুহূর্তেই হাসি এনে বলল, 'আজ নয় ভাই—আজ—'

'নয় বললে তো হবে না ম্যান। আমি সব অ্যারেঞ্জ করে এসেছি। হোল নাইট পোগ্রাম। স্রেফ মজা। ফান। দশটার পর থেকে তো!

তোমার যা কাজ আছে তা মিটিয়ে নাও। দেন কাম্। ও. কে!'

সুদর্শন হ্যাঁ না কিছুই বলতে পারে না—চুপ করে থাকে।

বাইরে বৃষ্টি নামল। বর্ষার মেঘ। যখন তখন ঝরছে। দিলীপ বলতে থাকে, 'ওরা তোমায় যে কাজ করে দিয়েছে তার তুলনায় এ অফার তো কিছুই নয়।'

সুদর্শন মনে মনে কষে গালাগালি দেয় দিলীপকে। 'শালা আমার একেবারে ছোটবেলার বন্ধু আমার জন্যে কাজ করিয়ে দিয়েছে—তাতে তোর কি। অর্জুন সিং বেদিকে যা দেবার আমি দেব। তুমি শালা মাঝখান থেকে জুটতে চাইছো কেন? তোমার ভাইকে তো ফিট্ করছি আমার মিনিতে—আবার কি। এখন ফোটো তো চাঁদ।'—'কথাগুলো সুদর্শন মনের তলায় গজরায়। মুখে হাসতে হাসতে বলে, 'রাইট। আই স্যুড বি গ্রেটফুল টু দেম।'

'তাহলে— ওই কথাই রইল—আজ দশটায় তোমায় আমরা পিক আপ করে নেবো পার্ক-এর নিচে থেকে। ও, কে?'

দরজায় শব্দ হল।

দিলীপ বলল, চা 'একটু বল। বৃষ্টিটা জমে গেল দেখছি।'

দরজাটা আলগা করে ভেজানো ছিল। শব্দটা কেমন একটু অন্য রকম হওয়াতে সুদর্শন নিজে উঠে গেল। খুলে দেখল শুভা।

'যা ভেবেছি। এসো, ভেতরে এসো।' শুভা ঘরে এলো।

সুদর্শন খুব অসহায় হয়ে তাকাল একবার দিলীপের দিক। দিলীপটা কি ভয়ঙ্কর কামুক—ওর চোখ দেখলেই বোঝা যায়। শুভার দিকে এমন করে তাকাচ্ছে যেন এক্ষুণি ওর শরীরের মাংস ওজন করবে। সুদর্শন মনে মনে প্রচণ্ড চটে যায়।

শুভা ঘরের মধ্যে গিয়ে বসলে সুদর্শন ঘরের বাইরে এসে করিডোর থেকে ডাকল, 'দিলীপ, এক মিনিট বাইরে।'

অনিচ্ছা সত্ত্বেও দিলীপ ভট্চাজ বাইরে আসে। বাইরে এসেই চাপা গলায় গালাগালি করে সুদর্শনকে—'শালা, আমায় এখন

ফোটাতে চাইছো—না?

'মানে—বুঝতে তো পারছ ম্যান—হঠাৎ আমার গার্ল-ফ্রেণ্ড এসে গেল?'

দিলীপ হাসি চাপার মত বিচ্ছিরি একটা আওয়াজ করল। এখন ওর চোখজোড়ার দিকে তাকাতেও খারাপ লাগছে। দাঁত বার করে হাসছে।

'হঠাৎ? এসে গেল? গার্ল-ফ্রেণ্ড?' বলে খুব ন্যাকা ন্যাকা গলা করে বলল, 'ছাতা থাকলেও—শাড়ির নিচের দিকটা ভিজে গেছে।'

'আচ্ছা, আমি তাহলে থাকবো—দশটায়—পার্ক-এর নিচে।' দিলীপকে তাড়ানোর জন্যে আর কোন উপায় খুঁজে পায় না সুদর্শন।

দিলীপ আগের মতই বিচ্ছিরি শব্দ করে হেসে বলে, 'একজনকে বৃষ্টি থেকে টেনে ঘরে তুলছ আর একজনকে ঘর থেকে তাড়াচ্ছ বৃষ্টিতে। কি আর করা যাবে—আমার তো আর—বলে জঘন্য একটা ইঙ্গিত করে। সুদর্শন দাঁতে দাঁত চেপে হাসে।

'চলো—নিচে গিয়ে এক কাপ চা খেয়ে নিই।' সুদর্শন অনিচ্ছা-সত্ত্বেও ভদ্রতা দেখাতে চায়।

দিলীপ বলে, 'থাক গুরু। তোমার এখন ছিলায় টান পড়েছে। যাও, ঘরে যাও। বিছানার চাদরটা তুলে নিও। সাদা কিনা।'

সুদর্শনের ইচ্ছে করল টেনে একটা লাথি ঝাড়ে ওর পাছায়। অনেক কষ্টে তা দমন করে হাসির ধরতাই রেখে গেল।

দিলীপ নেমে যেতে যেতে বলে গেল, 'শালা—যা চেপে বৃষ্টি নেমেছে সব ভাসিয়ে দেবে।'

·

সুদর্শন ঘরে ফিরে আসতে শুভা একগোছা গোলাপফুল এগিয়ে দিয়ে বলে, 'এগুলো কোথায় রাখা যায় বল তো? একটা গ্লাস হ:ব—আমি জল দিয়ে রেখে দেব।'

'লাভলি। গোলাপগুলো তো বেশ বড়। পেলে কোথায়?'

সুদর্শন কাঁচের গ্লাসে জল ভরতে ভরতে বলল।

'আসার পথে মার্কেটটায় পেলাম। তুমি কি বেরিয়েছিলে সকালে?' শুভা সুদর্শনের পোশাক লক্ষ্য করে বলে।

'হ্যাঁ—অর্ণবদার ওখানে গেছিলাম। দাদা লোক দিয়ে একটা প্যাণ্টের কাপড় পাঠিয়ে দিয়েছে।'

'আমার কথা কিছু জিজ্ঞাসা করল না? করেনি না? এই বানিয়ে বলবে না কিন্তু!'

'কেন করবে না? গ্রুপের গণ্ডগোলের কথা বলছিলেন। বললেন তুমি না থাকায় খুব অসুবিধে হচ্ছে। আজ তো শো আছে। আমায় যেতে বললেন। আমি অম্বরের দোহাই পাড়লাম।'

'আমার যাওয়ার কথা বলেনি?' বলে শুভা তীক্ষ্ণভাবে তাকিয়ে থাকে সুদর্শনের মুখের দিকে। মুখের দিকে ভাল করে তাকালে শুভার অসুস্থতা বোঝা যায়।

সুদর্শন প্রথমে বলার মত কথা খুঁজে পায় না। একটু পরে বলে, 'অর্ণবদা জানেন তুমি তো এখন কম্‌প্লিট রেস্টে।'

'জানি। আমার সব জানা হয়ে গেছে। স্বার্থ মিটে গেলে সব মিটে যায়।'

'ভুল বুঝো না। আর যার সম্পর্কে বলো মেনে নেবো—অর্ণবদা তনয়া বৌদি—এরা একেবারে অন্যরকম। তোমার জন্যে কেউ যদি কিছু করে থাকে তো ওরাই করেছে। ডাক্তার পালিতকে তো—'

'আমি আর যাচ্ছি না ডাক্তার পালিতের কাছে। ওদের কোন-রকমের সাহায্যে আমার দরকার নেই।' শুভা রুক্ষ গলায় বলে ওঠে।

সুদর্শন তাকিয়ে থাকে। শুভাও।

বাইরে বৃষ্টি পড়ে যায় একটানা। কাঁচের গেলাসের জলে লাল গোলাপ ভরে থাকে। ছোট ঘর। মাঝারি জানালার বাইরে দক্ষিণ কলকাতা। দক্ষিণ কলকাতার পুরোনো অংশ। সর্দারজীদের বড় মতন গ্যারেজ। মবিল পড়ে পড়ে চত্বরটা কালো। তেলজল ভেসে

যাচ্ছে। পুরোনো কার্নিশের নিচে সারি সারি গোলাপায়রা বর্ষা পোয়াচ্ছে।

শুভা খাটের ওপর বসেছিল। সুদর্শন এসে পাশে বসল।

'তুমি আজকাল যখন তখন রেগে উঠছ। একটুতেই দেখছি রাগের উত্তেজনা চড়ে যাচ্ছে তোমার।'

শুভা তাকিয়ে থাকে। চোখের পাতা স্থির। ওর মুখের মধ্যে চোখ দুটোই সেরা। শুধু তাকিয়ে থেকেই এতো কথা বলা যায় ওই চোখে ভাবা যায় না। মনে মনে কি এমন আকাশ-পাতাল চিন্তা করছে শুভা?

'অর্ণবদা কিছু বললেন না, আজকের নাটক কেমন হবে? নতুন মেয়েটি কেমন করছে? আচ্ছা, বীথি কি অন্বীক্ষায় জয়েন করছে?'

শুভার প্রশ্ন শুনে সুদর্শন ওর চিন্তাটা ধরতে পারে।

'বীথির কথা তো আমি কিছু শুনলাম না। তুমি শুনেছো নাকি?'

'শুনেছি। শক্তির সঙ্গে দেখা হয়েছিল আমার। ও আরো অনেক কথা বলল।'

'তোমাদের ওই শক্তিই গ্রুপটাকে ভাঙবে। যাই বলো, তোমাদের এই আঁতেল ক্লাস বড় বেশি সেলফ্-সেণ্টার। স্বার্থে ঘা পড়লে মারাত্মক হয়ে ওঠে।'

'শক্তি অন্বীক্ষার ফাউণ্ডার মেম্বার। ও কেন চাইবে গ্রুপটা ভেঙে যাক। ভেঙ্গে গেলে শক্তির দুঃখটা কি কম হবে?'

'অত সব বুঝি না আমি। কিন্তু একটা জিনিস পরিষ্কার বুঝতে পারছি অর্ণবদা ভেতরে ভেতরে বেশ খানিকটা দমে গেছেন।'

'বাদ দাও, বাদ দাও ওসব কথা। অনেক ভাবা হয়েছে। আর ভাববো না। কেন ভাববো? আমাদের কথা কেউ ভাবে? সব কিছুর অলটারনেটিভ আছে। শুভার জায়গায় অনায়াসে বীথি আসতে পারে'। কোন কিছুতেই কারো কিছু যায় আসে না।

সুদর্শন লক্ষ্য করছিল উত্তেজনায় আবার শুভার চোখ মুখের ভাব

অন্যরকম হয়ে আসছে। বাইরের আকাশে মেঘ আরো গাঢ় হয়ে এলো। জানলার দিকে পিঠ করে বসায় শুভার মুখ এখন আরো অন্ধকার।

আকাশ ডাকছে। ছোটবেলায় মা বলেছিল সুদর্শন জন্মেছিল যেদিন—সেদিন নাকি তুমুল বৃষ্টি হয়েছিল—আকাশ ডাকছিল অনবরত। এই মুহূর্তে তার মনে পড়ল, সমুদ্র, মায়ের মুখ আর সবুজ একটা সাপ! বালির ঢাল বেয়ে সাপটা নেমে আসছে। নামছে। বিছানার চাদর টানটান। আজই পাল্টে দিয়ে গেছে চাকরটা। দিলীপ ভট্চাজের বিচ্ছিরি হাসিটা মনে পড়তেই সুদর্শন অনুভব করল ঘরে আলো জ্বালা দরকার।

'ওই ছেলেটি আমার ঠিক বন্ধু নয়। এমনি আলাপ। মিনির ব্যাপারে ওর ভাইকে কাজে লাগবে।'—দিলীপের কুৎসিত রকমের তাকিয়ে থাকাটা মনে পড়তেই সুদর্শন বলে নিল।

'ঠিক বন্ধু আবার কিরকম? ঠিক বন্ধু বলে সত্যিই কিছু থাকে নাকি?'

'থাকে না?' সুদর্শন নামানো স্বরে বলে। তার ভাবনার মধ্যে দিয়ে সবুজ সাপটা হনহন করে নামতে চায়। সে একবার চোখের পাতা মুদে মার মুখটা মনে করতে চায়।

'তোমার নেই?' প্রায় অস্ফুট শোনায় সুদর্শনের গলা।

আকাশ চিড় খায় দূরে। আলো লাফিয়ে যায় চকিতে। জানলার নিচে গ্যারেজটার টিনের শেডে বৃষ্টির ঝাঁপ শব্দ তুলে যায় একটানা।

'কোনদিন তো ছিল না। ওসব নাটকের চরিত্রে থাকে।'

'শুভা, আজকে তুমি রাগ বাদ দাও। আজ সকাল থেকে দিনটা খুব ভাল লাগছে।'

'চলে যাবো?'

'কেন? আমার ভাল লাগাটা সহ্য হচ্ছে না? এখন তোমায় যেতে দিলে তো?'

'জানো তো আমি ভীষণ মুডি। বলে শুভা উঠে দাঁড়ায়। সুদর্শন শুভার হাত ধরে। শুভা ফিরে দাঁড়ালে ওর মুখ খানিকটা স্পষ্ট দেখা যায়। 'জানছি' বলে সুদর্শন কাছে আনে শুভাকে। শুভার ভিজে চোখের নিচে ঠোঁট রাখতে রাখতে সে বারবার অনুভব করে আজ তার জন্মদিন। সত্যিই আজ তার জন্মদিন।

॥ আঠারো ॥

শুভাকে বাসে তুলে দিয়ে কাঁটায় কাঁটায় ঠিক আটটার সময় পার্ক-এর নিচে পৌঁছল সুদর্শন। আজ কেন যেন কিছুতেই তার পার্ক স্ট্রীট আসতে ইচ্ছে করছিল না। আগের থেকে কথা দেওয়া আছে সিন্ধুকে। তার ওপর দশটার সময় ওই একই জায়গায় দিলীপ ভট্টাচার্জিরা! সিন্ধুর সঙ্গে দেখা করার আগ্রহ আছে তার। কিন্তু ওদের সঙ্গে! ভাবতেই বিরক্তি আসছে খুব।

শুভার শরীর ভাল ছিল না। তবু কিরকম উৎসাহ নিয়ে ঘোরাফেরা করেছে তার সঙ্গে! বৃষ্টি থামার পর পথে বেরিয়েছিল তারা। চাংওয়াতে খেয়েছে দুপুরে। সিনেমায় গেছে তারপর। তারও পরে খানিকটা সময় কাটিয়েছে গঙ্গার ধারে বসে। সুদর্শন বুঝতে পারছিল শুভার শরীর দিচ্ছে না—তবু জোর করে শুভা থাকতে চাইছে। হাসছে গল্প করছে। কি চমৎকার স্মৃতিশক্তি শুভার। পথ চলতে চলতে, কিংবা পাশাপাশি বসে কত নাটকের কত সুন্দর সুন্দর সংলাপ বলে যেতে পারে। একটুও আটকায় না। যত শোনে ততই অবাক মানে সুদর্শন। এই মেয়ের মধ্যে বড় হওয়ার ক্ষমতা আছে। সুযোগ পেলে অনেক উঁচুতে উঠবে মেয়েটা। অর্ণবদা ঠিক চিনেছেন! শুভা যতই অভিমান করুক না কেন, শুভা সম্পর্কে অর্ণবদার ধারণা কতখানি ওপরে—সুদর্শন জানে।

আর সে নিজে? সুদর্শন সান্ন্যাল—প্রিন্স। স্কুল ফাইনাল পি ডিভিসন—বোম্বাই হীরোমার্কা দর্শনধারী। তার কি ক্ষমতা আছে? প্রেবয়? মালহোত্রার চোখে পড়ার ক্ষমতা? মিসেস শিভালকরের সোহাগ। কুকুরের চেয়ে একটু বেশি সোহাগ পাবার অধিকার। সুদর্শনের মনে পড়ে যায়—রাতে মত্ত হয়ে যে নারী তাকে বিছানায়

সোহাগ করেছে—ভোর রাতে সেই নারীই তাকে খাট থেকে নামিয়ে দিয়েছে। তখন মিসেস শিভালকরের চোখমুখ একেবারে অন্য রকম। চাকরবাকরকে যেভাবে শাসন করে সেভাবেই সুদর্শনকে বলেছে তার ঘর থেকে বেরিয়ে গিয়ে পাশের ঘরে শুতে। মাথা নীচু করে বেরিয়ে এসেছিল সুদর্শন। জানতো সন্ধ্যেবেলা ফিরে গেলে আবার নেশার মত অস্বাভাবিকতা নিয়ে তাকে সোহাগ করবে মিসেস শিভালকর। মালহোত্রাও টাকা মিটিয়ে দিয়ে আবার আসার কথা বলেছিল। সুদর্শন দ্বিতীয়বার আর মাথা নামিয়ে চলে আসতে চায়নি। কলকাতায় সে মজা লুটতে এসেছে। কিন্তু ওই কাজটাকে সে কি বলবে মজা? মাঝবয়সী এক যৌনবাতিকগ্রস্ত মহিলার ইচ্ছায় ওঠ্-বোস্ করাকে মজা বলবে কি করে! স্রেফ চাকরগিরি।

আজ শুভার পাশে নিজেকে তার খুব সামান্য, তুচ্ছ, ফালতু বলে মনে হচ্ছিল। মনে হচ্ছিল এরপর শুভা আরো বড় হবে আর সে আরো নিচে নামবে। দাদাকে চিঠি লিখতে হবে—এর মধ্যেই আচমকা মনে হল একবার।

'জানো, দাদার খুব ইচ্ছে ছিল আমি আরো একটু পড়াশোনা করি।' গঙ্গার ওপর সন্ধ্যানামা দেখতে দেখতে শুভাকে বলেছিল সে।

'একেই বলে ভাগ্য! দ্যাখ, আমি পড়াশোনা করার এতো চেষ্টা করছি, হচ্ছে না। অর্ণবদার কাছে যাওয়ার সেটাও একটা কারণ। চাইলেই সাহায্য পাবো। কিন্তু আমার কপালে নেই। তবে নিভার হচ্ছে—এও আমার অনেক।' একটু থেমে শুভা আবার বলেছিল, 'কিন্তু তোমার না হওয়ার কারণ কি? তোমার হাতে তো অনেক সময়। তুমি নিজে তো আর মিনি চালাচ্ছো না?'

'দরকার হলে চালাবো। আর সঙ্গে তো লেগে থাকতে হবে—না হলে কোন লাভ নেই।'

'তাহলেও—তোমার এখন থেমে যাওয়ার বয়স নয়।'

'ধুৎ! আমার আর ওসব হবে না। ও আমার লাইন নয়।' সুদর্শন

প্রসঙ্গটা মিটিয়ে দিতে চেয়েছিল। শুভা দেয়নি। শেষ পর্যন্ত হেসে বলেছিল শুভা, 'বেশ, এসো না—দুজনে একসঙ্গে লড়ে দেখি একবারটি। তা না হলে—সত্যি এতো বোর হয়ে যাচ্ছি—কি বলবো তোমায়।'

'এই প্রোপোজালটা মন্দ নয়। ভেবে দেখা যেতে পারে। অর্ণবদার সঙ্গে কথা বলে দেখতে হবে।'

'না।' মুহূর্তে কঠিন হয়ে গেল শুভা।' আমি আর কারো কাছে সাহায্য নেবো না।'

সুদর্শন অবাক হয়ে যায়। এ কি ধরনের ছেলেমানুষি শুভার। কদিন আগে যে মেয়ে অর্ণবদা বলতে হাত কপালে ঠেকানোর যোগাড ছিল আজ সে মেয়েই অর্ণবদার কাছে পড়াটুকু জানার সাহায্যও নিতে চায় না। মেয়েদের অভিমান এতো তীব্র হয়।

এখন, পার্ক হোটেলের নিচে দাঁড়ানোর কয়েক মিনিটের মধ্যেই সিন্ধু এসে গেল।

'অনেকক্ষণ নাকি ? আমি তো ভাই চার মিনিটের বেশি লেট করিনি।'

'না—না আমিও একেবারে এসেছি কাঁটায় কাঁটায় আট। চলো. কোথাও বসা যাক।'

'তুমি যে আমার ডেরা দেখবে বলেছিলে ?'

'হ্যাঁ, বলেছিলাম তো। কিন্তু তার সঙ্গে আরো একটা কথা বলেছিলাম। আমার জন্যে ছোটখাটো একটা ঘর দেখে দাও। নেহাত বাইরের থেকে অনেক কম রেটে হচ্ছে তাই বন্ধুর হোটেলের ঘর জুড়ো করে আছি। তাও তো দেখতে দেখতে অনেক মাস হয়ে গেল। খানিকটা লস্ তো হচ্ছেই তাদের। এরপর আর থাকা ঠিক হবে না। আমার ঘরের কথা ভুলে গেছো তো ?'

'কিচ্ছু ভুলিনি। খুব মনে আছে আমার। আসছে কাল একটা

পাকা খবর পাওয়ার কথা আছে। চলো, আজ তো আমার থাকার জায়গাটা দেখাই। দেখে খুব হতাশ হবে।'

'চলো।' সিন্ধু আর সুদর্শন এগোয়।

সিন্ধুর ডেরায় যাওয়ার আগে ছোট্ট আর একটা কাজ সেরে নেয় সুদর্শন। তিন কপি ফটো করতে দিয়েছিল স্টুডিওতে—আজ সেটা ডেলিভারি নেওয়ার কথা। পাসপোর্ট সাইজের ফটো। বেশ তুলেছে। ফটো দেখে সিন্ধু বলে, 'তোমার তিন কপিই কি দরকার, আমি যদি একটা রাখি।'

'রাখতে পারো এক কপি। কিন্তু আমার ফটো নিয়ে কি হবে তোমার ?'

'আমার বন্ধুবান্ধব অনেকেই ফিল্ম প্রোডাকসনের সঙ্গে কানেক্‌টেড্। আমারও যাতায়াত আছে স্টুডিওতে।'

সুদর্শনের মনে পড়ল শুভার কথাগুলো। ভাবল, একবার জিজ্ঞাসা করবে নাকি—করল না। হেসে বলল, 'তুমি তাহলে আমায় ফিল্মস্টার করতে চাইছো। ফাইন্। দেখা যাক্ এ ফরমায় কদ্দূর হয়।' বলে এক কপি ফটো সে সিন্ধুকে রাখতে দেয়।

পার্ক স্ট্রীট থেকে খুব বেশি দূরে নয় সিন্ধুর ঘর। গলির মধ্যে গলি। শুধু ভারতবর্ষের নয়, দুনিয়ার নানা দেশের লোক বসবাস করে এসব অঞ্চলে। পরিবেশটা পার্ক স্ট্রীট থেকে আলাদা।

সিন্ধু ভেবে দেখল, পার্ক স্ট্রীটে গেলেই তার সবকিছু কেমন ওলটপালট হয়ে যায়। চিরকাল ওখানকার জীবনেরই স্বপ্ন সে দেখে এসেছে। মনে হয়েছে ওখানেই আছে তার স্বপ্নলোকের চাবি। এতোকাল তো সেটাই খুঁজেছে সে। সেটা পাওয়ার জন্যেও তো দাদার সঙ্গে ঝগড়া করে সে এখানে এসেছে।

একটা মানুষের মধ্যে অনেকগুলো মানুষ কি ঢুকে থাকে ? নাকি রক্তের মধ্যে একবার যে নেশা ঢুকে যায়—তা আর কখনো ছাড়া যায় না ? সুদর্শন কদিনই বা চিনছে এই মহল্লা ? নাকি অনেক

আগের থেকেই এটার মধ্যে আসার জন্যে সে নিজেকে তৈরী করে এসেছে? তাই কি আসতে না আসতেই খুব সহজেই সে এই জীবনটার মধ্যে ঢুকে যেতে পেরেছে? মানুষ বুঝিবা একটা নির্দিষ্ট জীবনে ঢোকবার ছাড়পত্র হাতে নিয়েই জন্মায়। যেন আগের থেকেই সবকিছু তৈরী থাকে, শুধু পৌঁছবার অপেক্ষা। যেমন ভালবাসার মানুষকে একনজর দেখলেই বোঝা যায় জন্মজন্মান্তরের চেনা—তেমনি এই জীবন বেছে নেওয়াও। তা না হলে আসতে না আসতেই পার্ক স্ট্রীট তাকে এমন আকর্ষণ করল কেন?

এই আকর্ষণের পাল্টা কি শুভা?

মধ্যকলকাতাতেও এতো গলি আছে? শেষ আর হয় না যেন। এক বাড়ির উঠোন পার হয়ে অন্য বাড়ির কলতলার ধার ঘেঁষে একটা প্রকাণ্ড বাড়ির দোতলায় এক চিলতে একটা ঘর। বহুকালের পুরোনো বাড়ি। ঘরে আলো-বাতাস আসে না। কোনক্রমে একটা তক্তপোশ এঁটে গেছে। তালা খুলে, ঘরে ঢুকে সিন্ধু সুদর্শনকে বলল, 'এই আমার ঘর।'

সিন্ধু আলো জ্বালাল।

সুদর্শন বলল, 'একার পক্ষে খারাপ নয় কিন্তু।'

আজ সিন্ধুকে অনেক কথা বলতে ইচ্ছে করছে সুদর্শনের। বিশেষ করে শুভার সঙ্গে এতোটা সময় কাটানোর কথাটা কাউকে বলতে না পারলে যেন স্বস্তি হচ্ছে না তার।

ঘরের এক কোণার দিকে নজর পড়তেই বলে ওঠে সে, 'বাঃ'! এখানে তো বেশ চা তৈরী করার ব্যবস্থা আছে দেখছি।'

'দু' কাপ তৈরী করে ফেলি।' সিন্ধু বলতে বলতেই চা তৈরী করতে লেগে যায়।

'তবে এই রকম কাজিঘর ম্যান, ড্রিঙ্ক করার পক্ষে আইডিয়াল।' বলে হাসে সুদর্শন।

'সরি, বস্, স্টকে কিছু নেই। অন্য একদিন এনে খাওয়াবো।'

সুদর্শন তাকিয়ে দেখে ঘরটার অনেক উঁচুতে এক টুক্‌রো একটা জানলা আছে। একটা টুলের ওপর দাঁড়িয়ে সিন্ধু সেই জানলার বন্ধ পাল্লা খুলতে খুলতে বলল, 'যখন আমার এক পয়সাও ইনকাম ছিল না—প্রায় না খেয়ে দিন কাটছিল—বাড়ির লোকেরাও দিন কাটাচ্ছিল প্রায় না খেয়েই—তখন হঠাৎ এই ঘরটা পেয়ে গেছিলাম।'

'কি রকম হলো? খাওয়ার টাকা জুটছিল না—অথচ ঘরের টাকা জুটলো কিভাবে?'

'জুটছিল না বলেই তো এখানে এলাম। মেসের টাকা জোটাতে পারছিলাম না। এখানে অল্প ভাড়া, তা ছাড়া কি খেলাম না খেলাম কেউ দেখতে আসছে না একটা প্রাইভেসি আছে।'

'কাজ পেয়েছো কতদিন?'

'কোন্ কাজ?'

'এখন যেখানে করছো? হোটেলে?'

'খুব বেশিদিন নয়?'

'স্টুডিওতে যাতায়াত করছো কতদিন?' এই সময় সুদর্শনের মনে হল একবার জিজ্ঞাসা করি—কোন্ হোটেলে চাকরী তার--কিন্তু করল না।

'সে অনেক। খুব বেশী তো মাইনা।'

'শুভাকে চেনো?' এই প্রশ্নটা করতে গিয়েও করল না সুদর্শন। তার বদলে খুব অন্তরঙ্গ স্বরে বলল, 'শ্লা, তোমার মধ্যে কি একটা ফিসি ব্যাপার আছে। তোমার অর্ধেক কথা তো ধরতেই পারি না। কিরকম হড়কে হড়কে যায়—রবীন্দ্রনাথের নাটকের ডায়ালগের মত। ধরি ধরি করেও শেষ পর্যন্ত আর বুঝে উঠতে পারি না'

সুদর্শনের মুখে রবীন্দ্রনাথের নাটকের উল্লেখ শুনে সিন্ধু খানিকটা অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকে। সিন্ধুর বিস্ময় লক্ষ্য করে সুদর্শন বলে,

'অবাক হওয়ার কিছু নেই—আমার এক বান্ধবীর সঙ্গে গিয়েছিলাম 'রক্তকরবী' দেখতে।'

'তোমার আবার এমন বান্ধবী জুটলো কবে থেকে?'

'বলছি বলছি। বলবো বলেই তো এলাম।'

সিন্ধু স্টোভে আগুন জ্বালতে জ্বালতে বলে, 'দাঁড়াও—আগে চাটা তৈরী করে নিই—তারপর মৌজ করে শোনা যাবে।'

কালি-পড়া এপাশ-ওপাশ তোবড়ানো একটা কেটলিতে দু' কাপ জল চাপিয়ে দেয়।

'একটু বোসো, আমি আসছি এক্ষুনি।' বলে সিন্ধু বেরিয়ে যায়।

সুদর্শন জুতো খোলে। খাটের ওপর পা তুলে বসে। বেশ লাগে ঘরটা। একা থাকার পক্ষে বেশ। সত্যিই যদি আর একবার পড়াশোনা করতে হয়—আশ্চর্য! শুভার কথাটা মাথায় বেশ এসে গেছে তো! কি হলো তার?

মাথার দিকে ছোট একটা শেলফ, তাতে ইংরেজি বাংলা নানা বই। দেওয়াল রঙ করা হয়নি বহুকাল। এক জায়গায় দেওয়ালের ওপর খবরের কাগজ এঁটে হ্যাঙার টাঙানো। তাতে একটা সার্ট ঝুলছে।

বিছানায় পায়ের দিকে চোখ ফেরাতেই—সুদর্শন দেখল, চামড়ার কভার দেওয়া সেই কালো ফ্ল্যাপটা পড়ে আছে। এটা সব সময় সিন্ধুর সঙ্গে দেখা যায়। সুদর্শন হাত বাড়িয়ে ফ্লাপটা তুলে নেয়।

হাতে নিয়ে ফ্ল্যাপটা খুলতেই তার হাতটা কেঁপে ওঠে যেন!

এ কী!

কি দেখছে সুদর্শন! নিজের চোখকেও যে বিশ্বাস হয় না!

ফ্ল্যাপের মধ্যে রাখা আছে অনেক ফটোগ্রাফ। নগ্ন, অর্ধনগ্ন, নানা ভঙ্গিমায় তরুণীদের ফটো? এসব কি ফিল্মে নামার পাসপোর্ট। নাকি হোটেল ব্যবসার এক্সট্রা ইনকাম!

দেখতে দেখতে একটা ফটোতে এসে সুদর্শনের সমস্ত স্পন্দন

থেমে যেতে চায় যেন। শুভার ফটো। ঠিক নগ্ন নয়—কিন্তু যেভাবে তাকিয়ে আছে,—বিশ্বাস হচ্ছে না—শুভা এভাবে তাকাতে পারে।

এ ফটো কি শুভা ফিল্মে নামার জন্যে দিয়েছে সিন্ধুকে! কি বিশ্রী লাগছে শুভার ওই হাসিটা!

হাসছে।

সুদর্শনের কপালের শির কেউ যেন ছিঁড়ে ফেলতে চাইছে। মুহূর্তে গণ্ডগোল হয়ে যাচ্ছে সব ভাবনাচিন্তা। সুদর্শন স্থির চোখে ফটোটার দিকে তাকিয়ে থাকে। সিন্ধুর ঘরে ফেরার শব্দ শোনা যায়। তবু সুদর্শনের চোখ সরে না।

সুদর্শনের দিকে একটা ঠোঙা এগিয়ে দিতে গিয়ে থমকে দাঁড়ায় সিন্ধু। থেমে থাকে।

তারপর ঠোঙাটা রেখে ভারি নিঃশ্বাস ফেলে বলে, 'দেখলি সবকটা?'—সিন্ধুর কণ্ঠস্বর অন্যরকম লাগে। সুদর্শনের মনে হয় মালহোত্রার সঙ্গে সিন্ধুর কোন তফাত নেই। ফিসি ক্যারেক্টারস।

'সারাক্ষণ এটা তোমার সঙ্গে থাকে কেন?'

'ওটা নিয়েই তো আমার ব্যবসা।' সিন্ধুর গলা একটুও কাঁপে না।

'কি করিস এগুলো নিয়ে? এতো ফটো যোগাড় করলি কি করে? এরা কি সব ফিল্মে নামতে চায়?' সুদর্শন আরো কি সব বলতে চায়, বলতে পারে না। কথা আটকে যায়।

'খুব উত্তেজিত হয়ে পড়লি মনে হচ্ছে!' এখন সিন্ধুর কণ্ঠস্বর আরো বেশি নিস্পৃহ মনে হয়। এবার চায়ের কাপে চিনি মেশায় সে।

'এখন আমার মনে পড়ছে—একদিন আমি এটা দেখতে চেয়েছিলাম।'

'এই যে চা। আর এই গরম চপ এনেছি।'

'কে দিল—এতো ফটো?' সুদর্শনের গলা উত্তেজনায় কাঁপে। সিন্ধু চায়ের কাপে একটা চুমুক দেয়, তারপর মুখ তুলে বলে, 'যাদের ফটো তারাই দিয়েছে।' শান্তস্বরে উত্তর দিয়ে সে, আবার

চায়ে চুমুক দিতে শুরু করে। সুদর্শন কোন কথা বলতে পারে না। সিন্ধু প্যাকেট থেকে সিগারেট বার করে একটা এগিয়ে দেয় সুদর্শনের দিকে।

নিজের সিগারেটে আগুন জ্বালানোর পর, ধোঁয়া ছেড়ে, সিন্ধু বলতে শুরু করে, সবাইকে তো ভাই আর বন্ধু বলে মনে হয় না, কাউকে কাউকে হয়। আর সত্যি কথা বলতে কি সকলের বন্ধু হওয়ার মত মনও থাকে না। য়্যু ডিজার্ভ দ্যাট কোয়ালিটি। ভাবিস না আমড়াগাছি করছি। তোকে যা মনে হয় তাই বললাম।' সুদর্শন আগের মতোই নিঃশব্দ থাকে। খানিকটা চা গলায় ঢেলে আবার বলে, 'প্রিন্স, প্রথমদিন আলাপ হবার পর আমি বলেছিলাম আমি হোটেলে চাকরি করি। কথাটা সত্যি নয়। আমি কোথাও চাকরি করি না। কোথাও চাকরি পাইনি। রোজগারের ব্যবস্থা একটা আমার আছে। তাই দিয়ে কৃষ্ণনগরে আমার মা ভাই বোন খেয়ে পরে বেঁচে আছে যা হোক করে। এখানে আমি আছি। হ্যাঁ, যা বলছিলাম—আমার রোজগারের ব্যবস্থা—পরিষ্কার বাংলায় কাজটাকে বলা হয় দালালি—মেয়ের দালালি। নামী দামী সব হোটেলের সঙ্গে যোগাযোগ আছে আমার। ওই ফটোগুলো নিয়ে, দেশী-বিদেশী নানা মানুষের কাছে যেতে হয় আমায়। ফটো দেখাতে হয়—তারপর চাহিদামত সাপ্লাই করতে হয়। তিন বছরের ওপর হয়ে গেল এই লাইনে। প্রিন্স, দোহাই ভাই, তুমি আমায় বিবেক-টিবেকের কথা আর জিজ্ঞেস কোরো না। ওসব কিছু আর নেই আমার।'

সিন্ধু আজ টাই পরেনি। হাফ হাতা সার্টটা সে খুলে ফেলে। সার্টটা খুলে ফেলতে ভেতরের নোংরা ছেঁড়া গেঞ্জির ফাঁক দিয়ে তার শীর্ণ বুকের খাঁচার পাঁজর দেখা যায়। তার কথা তখনো শেষ হয়নি, সে বলে চলে, 'আমি যখন এ কাজে এলাম—তার অনেক আগেই আমার বিবেক টিবেক লাটে উঠে গেছে। বিবেক বিবেচনা মানতে

গেলে আমার ফ্যামিলির সর্বনাশ হয়ে যেতো। তখন আমার বোনের ফটো ঘুরতো হয়তো আমারই মতো অন্য একজনের হাতে।

কথাটা শুনে অবাক হয়ো না প্রিন্স, এতে অবাক হওয়ার কিছু নেই। এই যে সব ফটোগুলো দেখছো—এর মধ্যে অনেক মেয়ের ছবি আছে যারা কলেজে পড়ছে। প্রথম প্রথম আমারও বিশ্রী লেগেছে। বাজে গলিতে পানওয়ালা রিক্সাওয়ালারা যে কাজ করে এতো তারই রকমফের। একটু ধোপদুরস্ত হয়ে বাঁকিয়ে ইংরেজি বললে একটু অন্যরকম মনে হয় এই যা। তবে এখন আর কিছু সঙ্কোচ নেই। ভেবে দেখেছি—যাদের কিছুই থাকে না, তারাই শুধু বিবেক নিয়ে থাকে।'

সিন্ধুর কথার পর, চা শেষ হয় দুটো পেয়ালায়! দুজনের হাতের আঙুলে সিগারেট পুড়ে যেতে থাকে। অনেকক্ষণ দুজনের মধ্যে কোন কথা হয় না। পাশাপাশি দুটো শূন্য পেয়ালায় সিগারেটের ছাই জমে যায়। নিঃশব্দে বোধহয় কথা খুঁজে যায় দুজনে। হঠাৎ আচমকা এক সময় শুভার ফটোটা দেখিয়ে সুদর্শন বলে, 'আমি এর সঙ্গে বসতে চাই।' সুদর্শনের কপালের দু পাশের শিরা দপদপ করে জ্বলতে থাকে।

সিন্ধু স্থির চোখে তাকায় তার দিকে, বলে, 'আমি কিন্তু প্রথম থেকেই তোকে বন্ধু হিসেবে দেখেছি, শিকার হিসেবে নয়।'

'জানি।' বলে সুদর্শন আবার চুপ করে যায়। মালহোত্রার মুখটা মনে আসে আবার।

সিন্ধু হেসে বলে, 'কিন্তু এতো ফটো থাকতে ওটাই সবচেয়ে ভাল লাগল কেন? ওর চেয়ে সবদিক থেকেই তো অনেক ভালো জিনিস আছে। ওটা তোর চেনা নাকি? দেখেছিস?'

'স্টেজে দেখেছি।'

'হ্যাঁ—ভাল অভিনয় করে। কিন্তু ওকে পাওয়া একটু কঠিন ভাই। চট্ করে রাজি হবে না। মানে ওকে নিয়ে আমি কখনো

বিজনেস করতে পারিনি। একবার এক মালদার প্রডিউসার এক রাত চেয়েছিল ওকে—কিছুতেই রাজী করাতে পারলাম না—ফিল্মটাতেও নামল না শেষ পর্যন্ত। একটু বেয়াড়া ধরনের। তুই অন্য যে কোন মেয়ে চা।'

সুদর্শনের মধ্যে বদমাইশি চিনচিন করে ওঠে। সে বলে, 'টাকার জন্যে চিন্তা করিস না। এনি অ্যামাউন্ট। ওকে রাজী করিয়ে আমায় একটা রিঙ করে দিস।'

সিন্ধু সুদর্শনের হাবভাব ঠিক ধরতে পারে না। শুধু বলে, 'তুই আজকাল খুব নাটক দেখছিস মনে হচ্ছে।'

আবার নতুন করে সিগারেট ধরানোর জন্যে ফস্ করে দেশলাইয়ের কাঠিতে আগুন জ্বালিয়ে সুদর্শন বলে, হ্যাঁ. চারপাশে এতো নাটক হচ্ছে—দেখবো না? না দেখলে অনেক কিছু মিস করতে হয়।'

সিন্ধু বুঝতে পারে সুদর্শন কথার পিঠে কথাটা বলা ছাড়াও অন্য আরো কিছু বোঝাতে চাইছে। সুদর্শনের উত্তেজনা তার চোখে মুখে স্পষ্ট।

সিন্ধু শান্ত গলায় বলে, 'চপটা খেয়ে নে। ঠাণ্ডা হয়ে গেল।' অনেকক্ষণ পর বলে, 'তোর মিনি তো বেরোচ্ছে শীগ্রি। বেশ কাজে মেতে যাবি। আমার শালা পাথরচাপা কপাল ভাই, একটা ছোট-খাটো কাজও জোটাতে পারছি না।'

'আমার নিজের শক্তিতে হতো না ভাই—অম্বর আর অর্জুন বেদি ছিল বলে হয়ে গেল। কিরকম জাঁকিয়ে বসেছে শহরে। কত কানেকসান্স্—ভাবা যায় না।'

'আমায় একটা কিছু করে দিতে বল্না।' সিগারেটের শেষ ছাই ফেলে সিন্ধু বলে, 'কতকাল আর বেশ্যাদের দালালি করবো ভাই।'

'তবে যে একটু আগে খুব লেকচার ঝাড়লি—বিবেক-টিবেক তোর কিছু নেই?'

'এখনো—তাই বলছি—সত্যি ওসব কবে ফেলে দিয়েছি। আমি

বলছি টাকার কথা ভেবে—সিকিউরিটির কথা ভেবে। মর‍্যালিটিটা কোন ব্যাপারই নয় আমার কাছে।'

সুদর্শন সিন্ধুর মুখের দিকে তাকায়। মুখে যতই বলুক সিন্ধু ভেতরে ওর জ্বালা আছে—তা বোঝা যায়।

কেমন অস্ফুট স্বরে বলে সিন্ধু, ভাইবোন সব বড় হচ্ছে তো—এরপর তার নিজের প্রফেসন চেপে রাখা যাবে না ওদের কাছে।'

অম্বরদের সঙ্গে দেখা হতে দশটা পেরিয়ে গেল।

দিলীপ ভট্‌চাজ ঠিক ফিট অম্বর আর অর্জুন বেদিকে সঙ্গে নিয়ে।

সুদর্শন কয়েক মিনিট দেরি করে যাওয়ার জন্যে কায়দা করে নানান কথা শোনালো দিলীপ। ওটাকে দেখার সঙ্গে সঙ্গে মনে মনে খানিকটা রাগ চড়ে গেল সুদর্শনের।

সুইট এইট্টিনএর অ্যাপার্টমেন্টে যাওয়া হয়েছিল মাঝরাতে। তার আগে পর্যন্ত রাতদিন বারে বারে মদ গিলেছিল চারজনে আকণ্ঠ। সুদর্শন একবার মৃদু অনুরোধ করেছিল অম্বরকে, 'ইয়ার, আজকের দিনটা বাদ দে। শরীর ভাল নেই মাইরী।'

অম্বর মকমক করে হেসে বলেছিল, 'কি করে থাকবে গুরু। সারা দুপুর হোটেলঘরে মেয়েছেলে এঁটে থাকলে—শরীরের দোষ কি ?'

সুদর্শন আর কিছুতেই ওদের কাছে বলতে পারল না—আজ তার জন্মদিন। বলতে পারল না আজকের দিনটা তার কাছে কত ভালভাবে শুরু হয়েছিল। মনে হল ওদের কাছে বললে দিনটার পবিত্রতা নষ্ট হয়ে যাবে।

দিলীপ যে অ্যাপার্টমেন্টে নিয়ে গেল তাদেরকে—সেটা বেশ সাজানো গোছানো। বোঝা গেল এখানে দিলীপ ভট্‌চাজের বেশ যাতায়াত আছে।

খুব বিশ্রী লাগছিল সুদর্শনের। আঠারো বছরের রাজস্থানী মেয়ে চম্পাকলিকে নিয়ে দিলীপ যেভাবে মশকরা অরম্ভ করল—সুদর্শনের

সহ্য হচ্ছিল না। কি রকম যেন গা ঘিনঘিন করছিল। অনেকক্ষণ এক ঘরে চারজনের সঙ্গে থেকে বিশ্রি রকমের ইয়ার্কি মারার পর চম্পাকলি একজন একজন করে পাশের ঘরে নিয়ে গেল। সুদর্শন গেল না। কেন যেন বমি-বমি পাচ্ছিল তার। কাঠের পার্টিশন দেওয়া ছোট ছোট ঘর। চারিপাশ থেকে বিচিত্র যৌন শব্দ শোনা যাচ্ছে। কত বেশ্যা আছে এই শহরে?

চম্পাকলির ঘর থেকে ফিরতে ফিরতে রাত ভোর।

অর্জুন বেদি আর অম্বর চলে গেল একদিকে। অন্য একটা ট্যাক্সি নিতে সুদর্শন আর দিলীপ হাঁটছিল। হঠাৎ একটা কথায় রীতিমত হাতাহাতি হয়ে গেল দুজনের মধ্যে। দিলীপ বলেছিল, গুরু—একদিন ওই ছুঁড়িটাকে আমায় ছাড়ো। বদলে আমিও তোমায় ভাল মাল ছাড়বো।' এতেই লেগে গেল। দিলীপের মুখ ফেটে গেল। কপাল কেটে গেল সুদর্শনের! কপালের রক্ত মুছতে মুছতে সুদর্শন ভাবল—এই না হলে জন্মদিন!

॥ উনিশ ॥

অজয় চৌধুরীর শোকসভায় ভিড় হয়েছিল বেশ।

. শোকসভায় যেতে আদৌ ভাল লাগে না অর্ণবের। বড় করে ছবি বাঁধিয়ে মালাচন্দন আর ধুপের গন্ধে যে মানুষটার জয়গান গাওয়া হল—দু মাস আগেও কি কষ্টের জীবন গেছে তার—সে তো অর্ণব খুব ভালভাবেই জানে।

শোকসভা জমে ওঠায় সম্ভবতঃ আরো একটা কারণ আছে। অজয় চৌধুরী সম্পর্কে আলোচনা করতে যেমন অর্ণব মিত্রের মত কয়েকজন নাটকের লোককে আনা হয়েছিল, তেমনি এসেছিল ফিল্মের কয়েকজন। চরম জনপ্রিয় না হলেও ফিল্মি দুনিয়ায় বেশ পরিচিত তারা। তাদের গ্ল্যামারের একটা টান তো আছেই।

আলোচনা করতে উঠে অর্ণব খুব একটা সময় নেয়নি। অজয় চৌধুরীর শেষ যে কয়েকটি পরিকল্পনার কথা জানত সে, আমাদের শিল্পসংস্কৃতি নিয়ে অজয়দা যে সমস্ত কথা আলোচনা করেছেন তার সঙ্গে, সে কথাগুলোই বলল। উজ্জ্বলও এসেছিল। উজ্জ্বলের সঙ্গে এসেছিল অন্বীক্ষায় আসা নতুন একটি ছেলে—পার্থ। শোকসভা শেষ হয়ে যাওয়ার পর, হাঁটতে হাঁটতে তিনজন এসে বসল কলেজ স্ট্রীট কফি হাউসে।

অর্ণবের মনে পড়ল, অজয়দার সংগে সে কতবার এসে বসেছে এই কফি হাউসে। এতো উদ্দীপনা, শেষ বয়সেও এতো প্রবল আবেগ—নতুন কিছু করবার জন্যে এমন প্রবল উৎসাহ কোন কিছুই তো ধরে রাখতে পারল না মানুষটাকে। কেমন আচমকা মিটে গেলেন একেবারে।

গতকাল নাটক ছিল অন্বীক্ষার। মোটামুটি উতরে গেছে।

অর্ণবের নিজের ভাল লাগেনি। উজ্জ্বলও বেশ খানিকটা দমে গেছে। মহড়া বেশি হয়নি এবার। একদিকে যেমন শুভা নেই, অন্যদিকে তেমনি উজ্জ্বল আর শক্তির মধ্যে গোলযোগটা বেড়েছে আরো।

'শুভার খোঁজ নিয়েছিলে?' অর্ণব জানতে চায়।

'চিঠি দিয়েছি। বলেছি গ্রুপের মিটিং-এর কথা। এখনো উত্তর পাইনি।' পার্থ এই সময় উঠে গেল একবারটি।

'আর দুদিন ছাখো। উত্তর না এলে নিজেই চলে যাও একদিন।'

'শুভার বাড়িতে?'

এছাড়া আর উপায় কি? অবশ্য আর একটা কাজ করলে পারো —সুদর্শনকে খবর দিতে পারো।' খানিকক্ষণ চুপচাপ।

অল্প পরে পার্থ এসে বসল আবার।

উজ্জ্বল বলল, 'আমার ওপর শুভা সম্ভবতঃ খুব চটে আছে।'

'কেন? তোমার সঙ্গে কি হলো শুভার?'

'আমার অফিস ক্লাবের নাটকে বীথিকে নেওয়াতে। জানেন তো শুভার সঙ্গে বীথির সম্পর্কটা কেমন দা-কুমড়োর। হয়তো সেই অভিমানেই আসছে না গ্রুপে।'

'না না, এমনিতেই দিনের পর দিন শরীরের অবস্থা যা হচ্ছে শুভার—ডাক্তার পালিত ওকে বেশি চলাফেরা করতেও নিষেধ করেছেন।'

'এর মধ্যে আপনার কথা হয়েছে ডাক্তার পালিতের সঙ্গে?'

'হ্যাঁ। একদিন ফোন করেছিলাম। শুভা যাচ্ছে নিয়মিত—তবে এরপর তো ট্রিটমেণ্টের জন্যে দরকার হবে অনেক টাকা।'

'শুভা যে একেবারে চলাফেরা করছে না—এমন খবর কোথায় পেলেন?

'কেন? তুমি দেখছো নাকি ওকে?'

এতক্ষণে পার্থ কথা বলে, 'উজ্জ্বল দেখেনি। আমি দেখলাম গত-কাল দুপুরে। ওই যে প্রিন্স বলেন যাকে, লম্বা ফর্সা সেই ছেলেটি—

তার সঙ্গে।'

'এছাড়া অশোক দেখেছে ওদের দুজনকে বিকেলের দিকে এস্‌প্লানেডে।'

'গতকাল সুদর্শনের জন্মদিন ছিল।' অর্ণব বলল।

উজ্জ্বল আর পার্থ পরস্পরের মুখ চাওয়াচাওয়ি করল।

অর্ণব তাকিয়ে তাকিয়ে দেখছিল কফি হাউস কত পাল্টে গেছে এমনিতে সামগ্রিক চেহারার কোন বদল হয়নি। চেয়ার টেবিল, কাউন্টার। উর্দিপরা ওয়েটারদের মধ্যেও পুরনো লোক অনেক নতুন হল চারিপাশে বসে আছে যারা। অর্ণব এর মধ্যে একজনকেও চেনে না। আশ্চর্য! এক যুগ আগে সন্ধ্যের পর অ্যালবার্ট হলে এলে চেনা মুখ থাকতো প্রায় প্রতিটি টেবিলে। সময় কেমন দ্রুত বদলে যাচ্ছে।

পার্থ মুখে শব্দ করে বেয়ারাকে ডাকল। কফি দিয়ে যেতে বলল তিন কাপ। নতুন মুখের একটি ছোকরা তিন গ্লাস জল রেখে গেল টেবিলে।

কাঁধে কাপড়ের ব্যাগ নেওয়া একটি ছেলে এসে দাঁড়াল অর্ণবদের টেবিলের সামনে। অর্ণবকে বলল, 'অর্ণবদা, আপনি আজ এ পাড়ায়? আজকাল কি আসেন এদিকে?'

'আরে, প্রশান্ত যে, অনেকদিন পর দেখা হল তোমার সঙ্গে তারপর সব ভাল তো?'

'ভাল আর কোথায়? আপনারা দেখছেন না?'

অর্ণব হেসে বলে, 'প্রশান্ত রক্ষিতকে দেখলে—আমি তার কি উপকারে লাগতে পারি বল।'

'বাবা—আপনারা পারেন না তা কি হয়।'

'আমি তো ভাই সাহিত্যের তরী বাইছি না। বাংলা সাহিত্যে অনেক মহা মহা কর্ণধার আছেন যাঁরা বাংলা সাহিত্যের কি হবে না হবে ঠিক করে দেয়—আমি তাদের মধ্যে পড়ি না।'

'না না, অর্ণবদা, আমার একটা চান্সের ব্যবস্থা করে দিন।

'কিসের চান্স? ফিল্মের?'

'না না, কবিতা লেখার। বড় কাগজে। কত তো জানাশোনা আছে আপনার। আমি বুঝলেন ঠিক মই বাগাতে পারছি না।'

অর্ণব হেসে ফেলল। বলল, 'আমার তো মই হওয়ার কোন চান্স নেই ভাই। আমার এলাকা তো নাটকের—জানোই।'

'একদিন আপনার বাড়ি যাবো।' দূরে বোধহয় কাউকে দেখতে পেল প্রশান্ত।

'হ্যাঁ হ্যাঁ, তোমায় তো বলেইছি। গতকাল তোমাদের সুদর্শন—যুবরাজ এসেছিল।'

'ও তো এখন কলকাতাতেই আছে। কি করছে? ওকে নাটকে নামাচ্ছেন না কেন? অমন ফিগার চট্ করে পাবেন না।'

অর্ণব হাসল।

'এলাম। বলে অমায়িক হাসি দেখিয়ে চলে গেল প্রশান্ত রক্ষিত। অর্ণব দেখল দূরের টেবিলে হাল আমলের এক কবি বসে আছে। প্রশান্ত তার সামনে গিয়ে বসল উজ্জ্বল আর পার্থ ঈষৎ কৌতূহলী হয়ে তাকাল অর্ণবের দিকে। অর্ণব বলল, 'আমাদের যুবরাজের ক্লাসমেট। কবি হওয়ার জন্যে এসেছে কলকাতায়। মই খুঁজছে এখন।'

পার্থ বলল, 'আমার কলেজেও একটি বন্ধু ছিল। সুবিমল বেরা—নাম শুনেছেন বোধহয়—খুব লিখতো এক সময়—গত বছর সুইসাইড করেছে। সুবিমলের কিন্তু সত্যিই দপদপে আবেগ ছিল। এরকম কত ছেলে ঘুরছে।'

অর্ণব চিন্তা করল, সুদর্শনরা কলকাতা জয় করতে চায় যে মন নিয়ে—এরা তার থেকে আলাদা। মোহিনী এ নগরীকে সুদর্শনরা ভোগ করতে চায় আর এরা আসে তার কৃপা পেতে। ক'জন পায়? কত শতাংশ।

'জানেন তো—এদের বেশির ভাগই প্রভাবশালী কবিটবিদে লাংবোট হ'য়ে থাকতে চায়। আর সেই দাদাশ্রেণীর কবিরা যা করে এদের নিয়ে। একটা পদ্য ছাপাবে বলে এদের সিগারেট, চা ধ্বং করে, এটা ওটা সেটা করিয়ে নেয়। পা টিপিয়ে নিতেও শুনেছি

পার্থর কথাটা শোনার পর অর্ণব আচমকা বলে, 'পার্থ, তুমি আজ কাল আর কবিতা লিখছ না কেন? ছেড়ে দিলে।'

'নাটক ধরলুম যে! দুটো এক সঙ্গে চালাতে পারবো না কম্পিটিশন সব জায়গাতেই আছে। যেখানে মনে হচ্ছে স্কোপ বেশি সেখানেই তো থাকা ভাল। কবিতাটবিতায় চট্ করে কিছু হওয় মুশকিল—টেরিফিক ব্যাকিং হলে তবু হয়।

অর্ণব বুঝতে পারল আজ অজয় চৌধুরীর শোকসভার একা কথাও পার্থ ঠিকমত শোনেনি। বা শুনলেও কথাগুলোকে মোটে আমল দেয়নি। আশ্চর্য! এই মনোভাব নিয়ে এরা কেন যা আজীবন নাটকের জন্যে লড়াই করা মানুষটার শোকসভায় আলোচনায় অর্ণব এই সংকটটার কথাই তো তুলে ধরেছিল। তিরিশ চল্লিশের দশকে যারা নাটক করতে এসেছে তারা কক্ষনো আজকে ছেলেদের মতো সাকসেসের মেডইজি খোঁজেনি। তাদের লক্ষ ছি —লড়াই দিয়েছে তাই অনেক। তারমধ্যে হয়তো অনেকেই ভু করেছে—রাজনীতির নেতাদের খপ্পরে পড়ে শিল্পের বারোটা বাজিে শ্লোগান দিয়েছে কিংবা পোস্টার ড্রামা গোছের কিছু করে নি গেছে। বোকামি সন্দেহ নেই। কিন্তু আজকের বেশির ভাগ ছেলে চালাকির চেয়ে তা কি খারাপ? কোথায় গেল সেই আত্মনিবেদন?

পার্থও ভাবছে নাটকেই সবচেয়ে বেশি চালাকি করতে পারে সে। ভাবার পেছনে যুক্তি আছে নিশ্চয়ই। সত্যিই হয়তো ওর চে অনেক কম মেধার ছেলে অনেক খারাপ পদ্য লিখে রাতারাতি ও ডিঙিয়ে গেছে। এমন ও অজস্র দেখছে। তাই ওকেও খুঁজে হচ্ছে মই।

'নাটকে কি তোর টেরিফিক ব্যাকিং আছে?' উজ্জ্বল হেসে বলল।

কফি নামিয়ে দিয়ে গেল ওয়েটর। কফি নিতে নিতে পার্থ বলল, 'তা না থাকলেও—ওই যে বললাম অনেক ইজি লাগে।'

'আসলে বল—কবিতা লেখার তুলনায় এখন তুমি নাটকে অভিনয় করতে বেশি আনন্দ পাচ্ছ—যেমন প্রশান্ত রক্ষিত নাটকে অভিনয় করার তুলনায় কবিতা লেখায় আনন্দ পায় বেশি।'

পার্থ কিছু বলল না। একটা অর্থহীন হাসি হাসল। যেমন করেই হোক না কেন, প্রশান্ত রক্ষিতের সঙ্গে তার তুলনাটা মোটেই ভাল লাগেনি।

এরপর কফি হাউস থেকে বেরিয়ে এসপ্লানেড-এ আসার পর পার্থ চলে গেল ফিল্ম সোসাইটির অফিসে। সামনে চেক ছবির উৎসব আছে। কয়েকটা বাড়তি টিকিট ম্যানেজ করতে হবে। আকাশে মেঘ নেই। পরিষ্কার। বর্ষার আকাশ এমনটা হয় না বড একটা।

সন্ধ্যে উৎরে গিয়ে সময় অনেকটা এগিয়েছে—তবু ট্রামবাসে সামান্য হালকা ভাবটা আসেনি এখনো। আজ দুটো বড় টিমের খেলা ছিল। তার জের মেটেনি এখনো।

মিনিবাসের জন্যে মেট্রোর উল্টো দিকের স্ট্যাণ্ডটার দিকে এগোতে এগোতে অর্ণব বলল, 'তুমি নৈশ ফুটবল দেখেছ নাকি উজ্জ্বল?'

'না। দেখিনি এখনো। দেখব এবার।'

'আমিও একদিন যাবো। রাতের দেখাটা বেশ ইণ্টারেস্টিং হবে কি বলো?'

'আপনার যাওয়া তো মুখেই। কত যে যাবেন জানি আমি। কখন যাবেন?'

'ঠিক সময় করে নেবো। কলকাতায় ইণ্টারেস্টিং কিছু একটা হচ্ছে আর আমি একবার উঁকি মেরেও দেখে আসছি না—এরকমটা হয়নি উজ্জ্বল।'

মিনিতে উঠে কয়েকমিনিট বসে থাকতে হল। ছাড়তে দেরি করল বাসটা। বাসের জানলার কাছে বসে দেখা গেল উঁচু একটা বাড়ির মাথায় চাঁদ ভাসছে। বেশ গোল চাঁদ। কাছাকাছি পূর্ণিমা আছে।

'রিহার্সল-এর কি ব্যবস্থা করলে উজ্জ্বল ?'

'আপাততঃ যেখানে যেমন ডেট্ পাওয়া যায়—সেইভাবে এড্জাস্ট করে নিতে হবে। আমায় আর একটা ঘরের কথা বলেছে একজন—আসছে কাল খবর পাবো।'

'আমাদের রিহার্সল রুমটা এত ভাল ছিল. কথায় বলে না বিপদ যখন আসে—চারিপাশ থেকে একসঙ্গে আসে।'

বাস ভরে যাওয়ার পর গাড়ি ছুটতে শুরু করল।

বৃষ্টি ধোয়া আকাশে চাঁদ উঠলে তার একটা আলাদা সৌন্দর্য থাকে। ময়দানে বড় বড় সার্চ্চ লাইট ফেলে পাতাল রেলের কাজ হচ্ছে বলে—সামনের দিকটায় চাঁদের আলো ভেঙে গেছে। দূরে—মাঝখানে—ফাঁকায় ফাঁকায়—কিংবা কয়েকটি গাছের জটলায়—জ্যোৎস্না নিবিড়। বেশ লাগে দেখতে।

অন্ধকারো চোখে হয়তো এই চাঁদের মায়া—তেমন ভাল নাও লাগতে পারে। অর্ণবের ভাল লাগছে। ভাল লাগে বরাবর। আসলে, এর মধ্যে জড়িয়ে আছে যে তার অনেককালের স্মৃতি। এই বিশাল সবুজ উদার মাঠটা—অর্ণবের কিশোরকাল থেকে আজ পর্যন্ত কতো যে স্মৃতির পট—ভাবলে শেষ হতে চায় না।

'অর্ণবদা' উজ্জ্বলের গলা এবার ঈষদ্ ভারি লাগে, 'শক্তির ব্যাপারটা নিয়ে কি করি বলুন তো। আমার মনে হয় আপনি ওকে ডেকে আলাদা করে বলেন যদি তাহলে একটা সমাধান হ'তে পারে। না হলে তো এভাবে ঠাণ্ডা লড়াই নিয়ে থাকা যাবে না।'

'কথাটা আমিও ভেবেছি। কিন্তু আমি জানি, এতে লাভ নেই কোন। উল্টে রাগ করে বসি। ভাবি চারিপাশে সবাই আমার শত্রুতা

করছে। আর এই ভাবনাটা মনে একবার গেঁথে বসলে তা তাড়ানো শক্ত।

উজ্জ্বল চুপ করে যায়।

কলকাতায় বা বাংলার মফঃস্বলে যারা গ্রুপ থিয়েটার করে তারা গ্রুপ থিয়েটারগুলো কিভাবে জন্মায় আবার কোন্ গোলযোগ থেকে ভেঙে খান খান হয়ে যায়। ভেঙে যাওয়ার কারণগুলো সম্পর্কে খুব ওয়াকিবহাল থাকা সত্ত্বেও ছোটবড় মাঝারি সবরকমের গ্রুপই সেই এক ভুল করে ভেঙে যায়।

শক্তি হয়তো শেষ পর্যন্ত আর অন্বীক্ষায় থাকবে না। কেন না তিক্ততা বাড়তে বাড়তে এখন এমন অবস্থায় এসে পড়েছে যে হয় উজ্জ্বল থাকবে না হয়তো শক্তি থাকবে দুজনে অন্বীক্ষাতে একসঙ্গে থাকবে না কিছুতেই। শক্তি কথাটা কোনদিন অর্ণবদার সামনে বলেনি। এটাই শক্তির চরিত্র বৈশিষ্ট্য। তার মান অভিমান, রাগ বা বা দুঃখের কোন কথা কখনো সে অর্ণবদাকে সামনাসামনি বলে না। উজ্জ্বল জানে ইদানীং শক্তি বলে বেড়াচ্ছে—উজ্জ্বলের জন্যেই এতকাল অন্বীক্ষায় থেকেও শক্তির কিছু হয় নি। কিছুই শিখতে পারেনি—এই গ্রুপটায় এতকাল থেকে। আবার কাউকে কাউকে, এ কথাও বলছে —নিজে সে নতুন একটা টিম করতে চায়। নাটক সম্পর্কে এখন তার যথেষ্ট দখল হয়েছে—এখন সে অনায়াসে গ্রুপ করতে পারে।

উজ্জ্বল ভাবে। শক্তির কথা দুটো কেমন পরস্পর বিরোধী শক্তি ছেলেটাই আগা পাছতলা কনট্রাডিশনে ভরা।

ডানদিকে শ্রাবণের ময়দান রেখে দক্ষিণে ছুটে যাচ্ছে বাস। বর্ষা আসলে মাঠে লোক বসা বন্ধ হয়ে যায়—না হ'লে এ সময় হাওয়া-বিলাসী থেকে শুরু করে বিচিত্র ধান্দার লোক এদিকে ওদিকে দেখা যেত যেখানে সেখানে।

আচমকা অর্ণবকে প্রশ্ন করে উজ্জ্বল, 'আচ্ছা, অর্ণবদা—অজয়দার গ্রুপে আপনি ছিলেন কতদিন ?

'বছর পাঁচেক। তখন তো অজয়দার অন্য গ্রুপ ছিল। খেটেখুটে অনেক ছেলেমেয়ে তৈরী করেছিলেন অজয়দা। বেশির ভাগ ফিল্মে ঢুকে গেল। বাকি যারা রইল তাদের বেশির ভাগেরই ঝগড়া ঝাটি হয়ে গেল অজয়দার সঙ্গে।

'আপনার সঙ্গে তো তেমন কোন ঝগড়া হয়নি।'

'না। আমার সমস্যাটা ছিল অন্য। অজয়দার প্রতি আমার শ্রদ্ধা কোনদিনও একতিলও কমেনি। কিন্তু অজয়দার পুরোপুরি রাজনৈতিক দলের কুক্ষিগত হয়ে যাওয়ার ব্যাপারটা আমি মেনে নিইনি। আমি বিশ্বাস করি না, রাজনৈতিক দাদারা 'একজন শিল্পীর চেয়ে বেশি শিল্প বোঝেন। আমার কাছে কমিটমেণ্ট আর অন্ধদাসত্ব এক নয়।'

উজ্জ্বল আরো কি যেন একটা বলবে ভাবল, বলল না। বিড়লা প্ল্যানেটারিয়ামের পাশ দিয়ে বাস ছুটে যাচ্ছে।

উজ্জ্বল ঘড়ি মিলিয়ে নিল। উজ্জ্বলের মনে হল—অজয় চৌধুরী কি তাহলে কমিটমেণ্ট আর স্লেভারির ফারাক বোঝেনি?

অনেকক্ষণ চুপচাপ থাকার পর অর্ণব বলল, 'শুভার চিকিৎসার কথা কিছু ভাবলে? মানে খরচাপাতির কথা বলছি।'

উজ্জ্বল অর্ণবের মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে।

অর্ণব বলে, আমরা তো ওকে বিশ্রাম নিতে বললাম। অফিস ক্লাবের অভিনয় বন্ধ করতে বললাম। এতে ওর সংসারে পর্যন্ত টান পড়ছে—চিকিৎসার খরচ যোগানোর তো কোন প্রশ্নই ওঠে না।'

'হ্যাঁ—ও তো আপনার কথা মতই চলছে—অভিনয় করছে না একেবারে। কিন্তু এভাবে ও কতদিন চালাতে পারবে?'

'বেশিদিন পারবে না। সুতরাং আমাদের কিছু একটা করতে হবে।'

'আমরা কি করতে পারি অর্ণবদা?'

'কিছু করতে পারলে আমরাই পারবো। ভাবো তো শুভা অস্বীকার জন্যে কিভাবে পরিশ্রম করেছে দিনের পর দিন।'

'জানি। কিন্তু আমাদের ফাণ্ডের অবস্থা তো আপনি খুব ভাল ভাবে জানেন। যা আছে তা দিয়ে শুভার একটি মাসও চলবে না। তা ছাড়া—

'তাছাড়া—'

'তাছাড়া—এভাবে ক্লাব ফাণ্ড থেকে সংসার চালানোর টাকা দিতে চাইলে শুভা নেবে কি ?'

'নেবে না। কিন্তু চিকিৎসার জন্যে ডাক্তার পালিতকে তো আমরা টাকা তুলে দিতে পারি। অসুখ ওর একটা নয়। গলার অবস্থা মারাত্মক রকমের খারাপ—অপারেশন করতে হবে। তার সঙ্গে আরো উপসর্গ আছে।'

উজ্জ্বলকে খুব চিন্তিত মনে হয়।

অবস্থা আরো খারাপ দুদিক দিয়ে হ'তে পারে। নাটক পুরো বন্ধ ক'রে অনাহারে থেকে কিংবা আবার কাজে নেমে, চেঁচিয়ে খাটা-খাটনি করে শেষ হয়ে গিয়ে।'

'আপনি কিছু ভেবেছেন ?'

'আচ্ছা উজ্জ্বল আমরা যদি অন্বীক্ষার থেকে বেশ কিছু শো করে এখন টাকা তোলার ব্যবস্থা করি—এবং পুরো টাকাটা শুভার জন্যে খরচ করি কেমন হয়।'

'খুব ভাল আইডিয়া। কিন্তু ব্যাপারটা শুভাকে জানানো হবে না কিছুতেই। ও বড় বেশি অভিমানী। কখন কি করে বসে ঠিক নেই। দেখলেন না সামান্য বীথির ব্যাপারটা নিয়ে কেমন রেগে আছে। আমাদের ত্রিসীমা মাড়ায় না আর।'

'যাই হোক, তাহ'লে তাড়াতাড়ি একটা মিটিং ডাক গ্রুপে। সবাইকে খুলে বল ব্যাপারটা—তারপর দ্যাখো কারো কোন আপত্তি আছে নাকি ? আমার মনে হয় না এ ব্যাপারে কারো কোন আপত্তি থাকবে।'

'আমারও তাই মনে হয়। ঠিক আছে ডাকছি মিটিং।'

গতকাল অর্ণব তো বলেছিল সুদর্শনকে নাটক দেখতে আসার জন্যে। শুভাকেও খবর পাঠানো হয়েছিল না? হয়নি? না হ'লেও শুভা কি নিজের থেকে চলে আসতে পারত না?

তনয়া বলছিল সেদিন—সুদর্শন আর শুভার ঘনিষ্ঠতার কথা। অর্ণব যেন ঠিক বুঝে উঠতে পারছে না। সুদর্শন কি ঠিক প্রেমে পড়ার মত ছেলে? দুদিন ঘোরাঘুরি, সিনেমা রেস্টুরেণ্ট করা, চুটিয়ে মজা করা—এর বাইরে বেশি কিছু চিন্তা করে কি ও। শুভার অসুস্থতার খবর ওতো জানে। শুভার সংগে ঘন ঘন দেখা হচ্ছে যখন—আরো পরিষ্কার বুঝতে পারছে নিশ্চয়ই। তা'হলে?

এই ক'য়েকমাসের মধ্যে ছেলেটা কি খানিকটা অন্য রকমের হ'য়ে গেল? নাকি অর্ণব একটু বেশি ভেবে নিচ্ছে? কথাবার্তার ধরণ খানিকটা পাল্টাতেই পারে—সেটাই স্বাভাবিক। কিন্তু শুধু বোধহয় বাইরের থেকেই নয়, ভেতরে ভেতরে খানিকটা বদলে গেছে যুবরাজ। অর্ণব যদি খুব ভুল ক'রে না থাকে, তাহলে এই পরিবর্তনের ওপর অনেকখানি ভরসা করছে সে। এটা লক্ষ্য করেই শুভাকে অফিস-ক্লাবের মহড়া থেকে সাময়িকভাবে সরিয়েছে। আগের মত একেবারে একা থাকত যদি তাহলে হয়তো অন্যরকম কিছু হ'য়ে যেতে পারতো। অর্ণব তো এই জগৎটা চেনে। চারিপাশে অভাবের মাঝখানে থেকে শুভার মত মেয়ে যে কোন মুহূর্তে তলিয়ে যেতে পারে। বিশেষ করে তলায় নামার রাস্তাটা যখন পা বাড়ালেই পাওয়া যায়। অর্ণব অবশ্য এখনো নিশ্চিত নয়—সুদর্শন এখন ঠিক কোন্ পথে পা বাড়াচ্ছে।

॥ কুড়ি ॥

সুদর্শন ঘরে ফিরবে বলে পা বাড়িয়ে ছিল।

সকাল হয়ে গেছে তখন। ভোররাতে দিলীপের সংগে আচমকা মারপিট হ'য়ে যাওয়ার পরও বিশ্রী গালাগালি করতে করতে দিলীপ একটা ট্যাক্সি নিয়ে চলে গেছে। কপাল বেয়ে রক্ত পড়ছিল সুদর্শনের। রুমাল দিয়ে চেপে ধরেছিল অনেকক্ষণ। আশেপাশে কোথাও কোন মেডিকেল স্টোর খোলা পাওয়া গেল না। হোটেলে ফিরে যাওয়া ছাড়া আর কোন উপায় দেখল না সে। কিন্তু এই অবস্থায় কি ফেরা যায় হোটেলে।

ট্যাক্সিতে উঠে সুদর্শন স্থির করল এখন হোটেলে ফিরবে না। সিন্ধুর কাছে যাবে। সকালে নিশ্চয় পাওয়া যাবে ওকে। ওর ঘরটা বেশ আলাদা। প্রাচীন বিশাল বাড়ি। বিভিন্ন ভাষা-ভাষী বিচিত্র সব মানুষজন। এর এক কোণে কে এল কে গেল খোঁজ খবর রাখে না কেউ।

দরজা খুলে সুদর্শনকে দেখে সিন্ধু অবাক।

'কি হয়েছে তোর? কপালে রক্ত কেন?' ঘুমভাঙা চোখে সুদর্শনের মুখের দিকে তাকিয়ে আঁৎকে ওঠে সিন্ধু। 'আয়, ঘরে আয়, বোস।'

সুদর্শন ঘরে এসে খাটে বসে। সিন্ধু টেবিল ফ্যানটা একটু ঘুরিয়ে দেয়। ঘরের দরজা বন্ধ করতে করতে বলে, 'সর্বনাশ। এখনো রক্ত গড়াচ্ছে যে। দাঁড়া ডেটল আছে নাকি দেখি।' নিচু হয়ে বসে খাটের তলায় খোঁজাখুঁজি করে একটা শিশি বার হয় ডেটলের। প্রায় খালি।

'এক মিনিট।' বলে দ্রুত বেরিয়ে যায় ঘর থেকে। মিনিট

দুয়েক পরে এক হাতে ডেটলের শিশি আর অন্য হাতে খানিকটা তুলো নিয়ে আসে। সুদর্শনের হাতের রুমালটা দিয়ে আগে ভাল করে রক্ত মুছে নেয় কপাল থেকে। তারপর তুলোয় করে ডেটল নিয়ে চেপে ধরে সুদর্শনের কপালের ওপর।

সুদর্শনের জামা ছিঁড়ে গেছে। রক্ত লেগেছে বুকের কাছটায়। ডান হাতটার কাছেও ছড়ে গেছে খানিকটা।

'কোথা থেকে আসছিস? কোথায় ছিলি সারারাত? কোথাও বসেছিলি নাকি?' সিন্ধু উৎকণ্ঠিত হ'য়ে জিজ্ঞাসা করে। সুদর্শন আস্তে আস্তে বলল, 'অম্বরের বন্ধু দিলীপ ভটচাজ টেনে নিয়ে গেছিল এক ঘরে। আমি শ্লা বোর হ'য়ে চুপচাপ বসেছিলাম। ফেরার পথে দিলীপটা এমন আলফাল বকতে আরম্ভ করল—লেগে গেল। আমিও ঝেড়েছি মোক্ষম মুখ দিয়ে রক্ত গড়াচ্ছিল।'

'কি আলফাল বলেছিল দিলীপ?' সিন্ধু আসল ব্যাপারটা জানতে চায়।

'সে অনেক কথা। ফালতু ছেলে একটা। সকাল-সন্ধ্যে শ্লা পুরুতগিরি করে আর রাতে মাল খেয়ে পড়ে থাকে প্রস্ কোয়ার্টার্সে।'

সিন্ধু বুঝতে পারে সুদর্শন তাকে মারপিটের আসল কারণটা জানাতে চাইছে না। সিন্ধুও আর পীড়াপীড়ি করে না। সুদর্শনের কপালের দিকে তাকিয়ে বলে—রক্তটা থামছে না তো। চল ডাক্তারখানায় যাই। স্টিচ্ করতে হবে মনে হচ্ছে।

যে সমস্ত জায়গায় ছড়ে গেছিল সেখানে ভাল করে ডেটল লাগিয়ে দেয় সিন্ধু। সুদর্শনের গায়ের ছেঁড়া রক্তলাগা সার্টটা খুলে নিয়ে—নিজের একটা সার্ট পরিয়ে দেয়। তারপর সুদর্শনকে নিয়ে—বেরিয়ে যায় বেশ দ্রুত।

সকাল খানিকটা এগিয়েছে তখন। দোকানপত্তর খুলে গেছে অনেক। কাছাকাছি একটা ক্লিনিকএ এসে কপালে একটা স্টিচ্ করতে হয়। সুদর্শন ব্যাগ খুলে টাকা দিতে গেছিল, তার আগেই

টাকা মিটিয়ে দিয়েছে সিন্ধু। যত ছাখে ততই ভারি অবাক লাগে সিন্ধুকে সুদর্শনের। যারা মেয়েমানুষের দালালি করে পেট চালায় —তাদের সংগে কিছুতেই তো এক করা যায় না সিন্ধুকে—অথচ সিন্ধু তো তাই। সুদর্শনের পুরোনো ধারণার অনেক কিছুই মেলে না।

সিন্ধুর ঘরে ফিরে আসার পর—সুদর্শনকে বসিয়ে রেখে সিন্ধু আবার বেরিয়ে যায় কিছুক্ষণের জন্যে। ফিরে আসে সঙ্গে দুধ পাউরুটি—আরো কিসব টুকিটাকি নিয়ে।

'এই এ সব কি করছিস! তুই তো আমায় লজ্জায় ফেলে দিলি দেখছি।' সুদর্শন একটু সঙ্কোচ করে।

ছাখো গুরু আমার সঙ্গে অত ভদ্রতাটদ্রতা করো না—জানো তো আমি কি জাতের লোক। যা দিচ্ছি—খেয়ে নাও।'

সুদর্শন আর কিছু বলে না। এমনিতে চোখটাও কেমন টেনে আসছে। কিরকম ঝিমুনি লাগছে। হাত বাড়িয়ে সে দুধ-পাউরুটি নিয়ে নেয়। সিন্ধুকে একটা ফোন নাম্বার দিয়ে বলে—ওটা আমার হোটেলের নাম্বার। তুই একটু ফোন করে ম্যানেজারকে বলে দে— আমি দিন দুয়েক বাইরে থাকছি আমায় ওখানে কেউ খোঁজ করতে এলে যেন তাই বলে দেওয়া হয়। সিন্ধু বলবে জানায়। সুদর্শন খাওয়া শেষ করে সার্টটা খুলে রাখে।

'তুই দরজা দিয়ে ঘুমো—আমি ঘণ্টা দুতিন পর ফিরবো।'

'এখন—কোথায় চললি তুই?'

'কোথাও ঠিক যাচ্ছি না। এদিক ওদিক ধান্দায় আর কি— চাকরির ধান্দায়। সেই পুরোনো আপ্তবাক্য যতক্ষণ শ্বাস ততক্ষণ আশ। দেখি—কবে বেড়ালের ভাগ্যে শিকে ছেঁড়ে।' সিন্ধু যাওয়ার আগে বলে যায়, 'তুই নিশ্চিন্তে ঘুমো—এখানে ডিসটার্ব করার কেউ নেই।'

সুদর্শন উঠে গিয়ে কপাট বন্ধ করে—আবার খাটে এসে শোয়। কপালের যন্ত্রণাটা অনুভব করে।

সিন্ধুর ফিরে আসতে আসতে দুপুর হ'য়ে যায়। সুদর্শন তখন অসাড়ে ঘুমিয়ে। বেশ খানিকক্ষণ ডাকাডাকির পর ঘুম ভাঙে ওর। উঠে দরজা খুলে দেয়। বাইরে তখন টিপটিপ করে বৃষ্টি পড়ছে।

ঘরে ঢুকেই ওপরের দিকে তাকায় সিন্ধু। উঁচুতে জানালাটা খোলা। সেই খোলা জানলা দিয়ে জলের ঝাপটা এসে—দেওয়ালের হ্যাঙারে টাঙানো সার্টপ্যান্ট ভিজে গেছে। 'ওই জানলাটা বন্ধ করে যেতে ভুলে গেছি। এটাই এই ঘরের সবচেয়ে বড় ডিফেক্ট। বৃষ্টির ঝাপটাটা এ মুখো হ'লেই মুশকিল। কতবার যে মাঝরাতে উঠে আমায় জানলা বন্ধ করতে হয়েছে--তার ইয়ত্তা নেই।'

বলতে বলতে টুলের ওপর উঠে সিন্ধু জানলার পাল্লা বন্ধ করে দেয়। পাল্লা বন্ধ করার সঙ্গে সঙ্গেই ঘরটা আরো আবছা হয়ে ওঠে। সিন্ধু আলো জ্বেলে দেয়। সুদর্শন নিভিয়ে দিতে বলে। আলো তার চোখে লাগছে।

'ঘুমটা ভালই দিয়েছিস তাহলে?' সার্ট খুলতে খুলতে বলে সিন্ধু।

'সলিড হয়েছে ঘুমটা। খুব ফ্রেস্ লাগছে এখন।'

'কপালে ব্যথাটা আছে?'

'আছে কিছুটা।'

'খাওয়াদাওয়া সেরে আর একটা ঘুম দে—দেখবি দারুণ লাগবে।' বলে গামছা তোয়ালে টেনে নিয়ে সিন্ধু স্নান করতে গেল।

ঘরের সামনে দিয়ে লম্বা টানা বারান্দা। রেলিং-এর বহু শিকই ভেঙে গেছে। বারান্দার শেষে একটা স্যাঁৎসেতে কল ঘর। দোতলায় আট-নটি পরিবার ওই একটি বাথরুমই ব্যবহার করে। দিনের বেলাতে কোনদিনও আলো ঢোকে না বাথরুমে। কোন বাল্ব নেই। বছরের পর বছর মানুষ—এতগুলো মানুষ এইভাবেই আছে।

সিন্ধু বরাবরই একটু আয়াস করে স্নান করে। এই বাড়ির এটাই মস্ত সুবিধে জল পাওয়া যায় পর্যাপ্ত।

স্নান সেরে এসে—পোষাক বদল করে আবার বেরতে যায় সিন্ধু। সুদর্শনকে অপেক্ষা করতে বলে। জানায় সে কিছুক্ষণের মধ্যেই আবার ব্যবস্থা করে আসছে। সুদর্শনও বিছানা থেকে উঠে পড়ে। বলে, চল—আমিও যাই তোর সঙ্গে, বসে বসে এরপর তো বোর হব ভাই। সুদর্শন একরকম জোর করেই বেরিয়ে পড়ে সিন্ধুর সঙ্গে। খায় সামান্যই। তারপর একটা সিগারেট ধরিয়ে ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে লক্ষ্য করে যায় সিন্ধুকে।

'ফোন করেছিলি আমার হোটেলে ?

'হ্যাঁ। বলে দিয়েছি। কে যেন একটি মেয়ে ফোন করেছিল তোকে। কাল আবার করবে বলেছে।'

'ফোন করেই যাক—আমাকে আর পাবে না।'

'কে রে ? তোর সেই বান্ধবী—যে তোকে 'রক্তকবরী' দেখিয়েছিল। আজ পর্যন্ত আমি তো তার নামই শুনলাম না !'

'নাম দিয়ে আর কি হবে? বলো—ছেলেদের সঙ্গে মেয়েদের সম্পর্কতো একটাই।'

সিন্ধু সুদর্শনের মুখটা দেখে নেয়। হাসছে।

'তোর ক্যাপ্টেনের খবর কি ? মারকুইস্ স্ট্রীট গেছিলি এর মধ্যে ?' সিন্ধু খেতে খেতে প্রশ্ন করে।

'মারকুইস্ স্ট্রীটে কেন ?'

'ওখানেই তো মালহোত্রার এ্যাপার্টমেন্ট। স্মাগলিং-এর হেড অফিস। কেন ? এর মধ্যে কোন কাজে ফেলেনি তোকে ?'

'আমাকে স্মাগলিং-এ ? না তো। আমি ওর কথামত মাত্র এক-রাতই কাজ করেছি। পয়সা নিয়ে নিয়েছি, একেবারে হাতে হাতে। পরদিন যাওয়ার কথা ছিল যাইনি।

'হাতছাড়া হয়ে গেছিস তাহলে। ও ব্যাটাতো প্রথম প্রথম মদ মেয়েছেলে দিয়ে লোভ দেখায় – তারপর আস্তে আস্তে নিজের কাজে লাগিয়ে দেয়। একবার ঢুকে পড়লে—আর বার হতে পারবিস্ না।'

চকিতে মনে পড়ে মালহোত্রার মুখ। মিসেস শিভালকরের মুখ। সেই সঙ্গে কুকুরটাকে এত স্পষ্ট করে মনে পড়ছে কেন? কুকুরটা রেগে গিয়ে কি রকম আওয়াজ করছিল।

'আমার ওই ব্যাপারটা মনে আছে তো?' সুদর্শন খুব আগ্রহ নিয়ে বলে।

'কোন ব্যাপারটা?'

'ওই যে ফটো দেখালাম তোর স্টক থেকে। আমার চাই। টাকার জন্যে পিছোস না।'

'এখনো যোগাযোগ করিনি। দেখি কি করতে পারি!'

'দেখি টেখি নয়—আমার চাই—ব্যস্‌। যত তাড়াতাড়ি পারিস ব্যবস্থা কর।' সুদর্শন বেশ জোর দিয়ে বলে।

সিন্ধু একটু অবাক হয় বোধহয়। আজ ভোরে ফিরেছে বেশ্যা বাড়ি থেকে মারদাঙ্গা করে। কপালের যন্ত্রণা এখনো পুরোমাত্রায়—এরি মধ্যে আবার মেয়েছেলের জন্যে মুখিয়ে উঠছে! এরকম ছেলে আর দেখেনি সিন্ধু।

আবার ঘরে ফিরে এসে সিন্ধু বলল, 'তুই খাটে শো—আমি এই বেঞ্চটাতে দিব্যি ঘুমোতে পারবো।'

তক্তপোষটার মাথার দিক দিয়ে পাতা আছে বেঞ্চটা। অনেক জিনিষপত্তর ছিল বেঞ্চটার ওপরে। সিন্ধু সেগুলোকে নামাল। তারপর খালি গায়ে—পায়জামা পরে—টানটান হয়ে শুয়ে পড়ল বেঞ্চটাতে।

'না—ম্যান—তোমার এখানে থাকা চলবে না। ভাবলুম দুদিন থাকবো এখানে—কিন্তু এভাবে তুমি শুয়ে থাকবে বেঞ্চের ওপর আর আমি—'

'আবার আরম্ভ করলি তো—শ্লা তোমার যদি কপাল না সেলাই হতো—ওখানে পাত্তা দিতুম ভেবেছো—ঘণ্টা দিতুম। আর কোন কথা না ঘুমিয়ে যা।'

অল্প পরে সিন্ধু সিগারেট ধরায়।

সুদর্শন পাশ ফিরে বলে, 'আমি এখনো ঘুমোইনি—আমায় ছাড় একটা।'

সিগারেট নিয়ে একরাশ ধোঁয়া ছেড়ে বলে সুদর্শন, 'আমার ঘরের কিছু করতে পারলি না। হোটেলে আর আমি থাকছি না।'

'বেশ তো—আমার এখানে থেকে যা না কটা দিন—তারপর ঘর :পয়ে গেলে চলে যাবি।'

সেদিন আর মোটেই বাইরে বেরোয় না সুদর্শন। সন্ধ্যের মুখে সিন্ধু চলে যায়। আলো জ্বালিয়ে একা ঘরে বসে থাকে সে। দু-একটা বইপত্তর আছে সিন্ধুর ঘরে। এক আধবার সেগুলো নাড়াচাড়া করে আবার জায়গামত রেখে দেয় সেগুলো।

মন খুব বিক্ষিপ্ত হয়ে থাকে। আজ সন্ধ্যেবেলাতেও শুভার সঙ্গে তার দেখা হওয়ার কথা ছিল। সুদর্শন শুভার অসুস্থতার কথা ভেবে আসতে বারণ করেছিল। শুভার আসতে চাওয়ার পক্ষে যুক্তি হল— না আসতে পারলে সে আরো অসুস্থ হয়ে পড়বে। 'তুমি বুঝতে পারবে না—যতক্ষণ তোমার সঙ্গে গল্প করি—কত খুশি থাকি আমি—বাকি সময় দম আটকানো মনে হয়।'

শুভা এসে ফিরে গেছে নিশ্চয়।

সুদর্শনকে না পেয়ে, কিম্বা ম্যানেজারের কাছে যদি খবর পায় স দুদিন আসবে না—তাহলে কি ভেবেছে শুভা! রেগে গেছে ঠিক!

রাগুক! সুদর্শন তাই চায়! আর কথাটা ভাবতেই কেমন যেন এক ধরণের মজা পায় সে।

আজ ফিরে গেছে। পরশু ফিরে যাবে কিংবা ফোন করে পাবে না। দিনের পর দিন যাবে সুদর্শনের সঙ্গে দেখা হবে না। না দেখা :পয়ে কি ভাববে শুভা? রাগবে না কষ্ট পাবে? তারপর? তারপর সত্যিই যদি দেখা হয় সিন্ধুর ব্যবস্থা মত?

ভেতরে কেমন নাড়া খেয়ে যায় সুদর্শন! সত্যি যদি শুভা শেষ

পর্যন্ত রাজি হয়। হতেই পারে! সুদর্শন সান্যালের তো কোন অভাব ছিল না—তবু গেছিল মিসেস শিভালকরের ফ্ল্যাটে। কুকুরের মতো আদর করেছিল মিসেস শিভালকর আবার বার করে দিয়েছিল রাস্তায় কুকুরের মতো। তাহলে? তাহলে শুভার রাজী হয়ে যাওয়াটা সুদর্শনের কাছে এতো মারাত্মক মনে হওয়ার কারণ কি?

ধ্যাৎ! কি সব পাগলের মত ভাবছে সুদর্শন।

আদর্শফাদর্শ—নীতিবোধ এসব বস্তা-পচা বুলিগুলো এখনো মাথার মধ্যে আসে কেন? এসব তো দাদা অর্ণবদাদের জিনিষ। ওরা এসব আঁকড়ে থাকবে। সুদর্শনরা না অনেক এডভান্স। তাদের কি আর ওই মাপে চলে। তাদের কাছে লাইফটা এনজয় করার জিনিষ। সতীত্বের ধ্বজা ধরে বসে থাকার নয়। কিছু আসে যায় না। একটা পুরুষের জীবনে কটা মেয়ে এলো কিম্বা একটা মেয়ের জীবনে এলো কটা পুরুষ। এতোকাল সবকিছু যেমন সহজ ভাবে নিয়ে এসেছো তেমনি সহজভাবেই নাও সবকিছু।

কিন্তু কি আশ্চর্য! গাদা গাদা যুক্তি তৈরী করেও সে যে কিছুতেই শুভা রাজি হয়ে যাচ্ছে—এটা সহজভাবে মেনে নিতে পারছে না। এ রকম হচ্ছে কেন?

দরজায় শব্দ হল।

একি? এর মধ্যেই ফিরে এলো সিন্ধু? সে তাড়াতাড়ি দরজা খুলল। সিন্ধু নয়—একজন অতিবৃদ্ধ অবাঙালী ভদ্রলোক। কাকে চাই? ইংরাজীতে প্রশ্ন করল সুদর্শন।

বৃদ্ধ সিন্ধুর নাম বলল।

সুদর্শন জানিয়ে দিল সিন্ধু নেই।

হ্যাঁ—এই সময়টাতে তো কোনদিনই থাকে না। আজ ঘরে আলো জ্বলছে দেখে ভাবলাম—আজ আব বেরয়নি। সকালবেলা সিন্ধু একটা ডেটলের শিশি নিয়ে এসেছিল আমার ঘর থেকে।'

'ও, হ্যাঁ—আমারই কপাল ফেটে গেছে কিনা—তাই।' এই যে

শিশিটা।' সুদর্শন সেটা ফেরৎ দিয়ে দেয়।

'কি করে কাটল—পড়ে গিয়েছিলে ?'

'হ্যাঁ—মানে—ওই আর কি ?' সুদর্শন বুঝতে পারল না সিন্ধু তার কপাল কেটে যাওয়া সম্পর্কে অন্য কোন গল্প বলেছে কিনা।

'ভগবান বাঁচিয়ে দিয়েছে তোমায়। তাই অল্পের ওপর দিয়ে গেল। তিনি না বাঁচালে তুনিয়ায় আর কে বাঁচাতে পারে বলো ?'

কোন উত্তর না দিয়ে সুদর্শন শুধু হেসে সম্মতি জানায়। 'আমি তো মরে যেতাম—মরে গিয়েই ছিলাম বলতে গেলে, ভগবানের করুণায় বেঁচে গেলাম।' একটু থেমে বৃদ্ধ আবার বলে, 'আমার এখানে কেউ আপনজন নেই—একা থাকি তো। অসুস্থ হয়ে পড়েছিলাম। মা টেরেসার এক সেবিকা এসে আমায় নিয়ে গেল ওদের হাসপাতালে। সেরে গিয়ে আবার ফেরৎ এলাম এখানে। বৃদ্ধ চলে গেল।

বৃদ্ধ চলে গেলে সুদর্শনের নিতাই খুড়োর কথা বেশি করে মনে পড়ল। তার বড় মেয়েটা কি আশ্চর্য শান্ত। আর ছোটটা ? সেই চঞ্চল সুন্দরী এতদিনে কেটে পড়েনি কি কারো সঙ্গে ? বৃদ্ধ বয়সটাই বড় কষ্টের।

সুদর্শন তাকিয়ে দেখল—ডেটলের শিশি হাতে নিয়ে খুব ধীরে ধীরে বুড়ো এগিয়ে যাচ্ছে নিজের ঘরের দিকে। বড় নিঃস্ব। বড় একা লাগে—ওই বয়সের ভার।

তুদিন পরে হোটেলে গিয়ে সব টাকা মিটিয়ে দিল সুদর্শন। নিজের সামান্য যা জিনিষপত্তর ছিল—তা নিয়ে এলো সিন্ধুর ডেরায়। ভোর কোন খবর নিল না। অর্ণবদার সঙ্গে দেখা করল না। শুধু অম্বরের কাছে গেল একবারটি। অম্বর বলল, 'হঠাৎ কি হ'ল তোমার বাস্তু। কিছু বোঝা যাচ্ছে না। তুমি তো বাবা দিলে দাগা পাওয়ার ছেলে নয়।'

সুদর্শন অম্বরকে কিছু বোঝাতে চায় না। আসলে কাউকেই

কিছু বোঝানোর দরকার নেই তার। 'তুই থাকছিস কোথায়?'

'সিন্ধুর ওখানে। একদিন ওকে তোর কাছে নিয়ে আসবো—তুই বাঙ্গালোর থেকে ফিরে আয়।'

'হ্বাট্ চ্যাপ্। কেন বাবা?'

'ছেলেটার মনটা খুব ভাল। পড়াশোনাও করেছে বেশ। তুই তো ভাই অনেকের অনেক কিছু করেছিস—ওর একটা কিছু করে দে খুব দরকার ওর।'

'আমি ওকে কি করে দেবোরে—ওই তো অনেকের অনেক কিছু করে দেয়। শালা বড় বড় হোটেলে মাগী সাপ্লাই দেয়—অনেক টাকা ওতে।'

'অনেক টাকা হ'লেও—অন্ত ছোট খাটো কোন ভাল কাজ পেলে ও আর এ কাজ করবে না। তুই দেখিস কিন্তু।'

সুদর্শনের কথায় অম্বর খুব একটা সাড়া দেয় নি, শুধু মুখে বলেছে, ঠিক আছে—দেখবো।'

অর্জুন সিং বেদির সঙ্গে ফোনে কথা হয় দু-একটা। এখন কেন যেন কারোর সঙ্গই ঠিক ভাল লাগে না সুদর্শনের। জন্মদিনের উপহারের উত্তরে দাদাকে একটা চিঠি পাঠিয়ে দিয়েছে। এক একবার মনে হয়—দিন কয়েক ঘুরে এলে হতো শিলিগুড়ি। তারপরই মনে হয়—এখন যাবে কি! কলকাতার পথে আগে তার মিনিবাসটা চলুক কিছুদিন তারপর না হয় ভাবা যাবে—বাড়ি ঘুরে আসার কথা। কিন্তু সবার আগে দেখা হওয়া চাই শুভার সঙ্গে। সিন্ধু আজও খবরটা দিতে পারল না যে!

সিন্ধুর ঘরে সে একা থাকে যখন মাঝে মাঝে সেই বৃদ্ধ এসে গল্প করে যায়। ভগবানের দয়ার কথা শোনায়। মা টেরেসার সেবার গল্প বলে। মায়ের গল্প শুনতে শুনতে সুদর্শনের আরো একবার মনে হয়—কিনা আজব শহর একখানা। পাশাপাশি কত উল্টো-পাল্টা মানুষ দিন কাটাচ্ছে। সত্যিই শহরটার সে কিছুই চেনেনি?

পরের সপ্তাহে সিন্ধু খবর আনে—শুভা বসতে রাজি হ'য়েছে। টাকার অঙ্কটা বেশ বেশি। তবু রাজি হয়েছে শেষ পর্যন্ত।

এটা যেন কিছুতেই ভাবতে পারছে না সুদর্শন। ভাবতে মন চাইছে না। রাজি হয়ে গেল। তার মানে? এক ধরণের অসুস্থতা বোধ করে সে। জন্মদিনে সন্ধ্যার মুখে কি কথা বলেছিল শুভা তাকে। শুধু অভিনয়।

'আমি একদিন আপনার সঙ্গে চার্চে যাবো।' সিন্ধুর বাড়ির বৃদ্ধটিকে জানায় সে।

'খুব ভাল কথা। খুব ভাল কথা। চলো না যে কোনদিন খুশি। আমি তো প্রায়ই যাচ্ছি। চলো। কাছেই তো।'

সন্ধ্যেটা চমৎকার কেটে যায় চার্চে! প্রার্থনা শোনে, এতো অল্প বয়স্ক ছেলে মেয়েও যে চার্চে আসে নিয়মিত সুদর্শনের জানা ছিল না।

শুভার সঙ্গে বসার সন্ধ্যে ঠিক হয়েছে আর চারদিন পরে। সিন্ধু তাকে বাড়ির নম্বর নিশানা, ফ্ল্যাট নম্বর, ফ্লোর সমস্ত, কিছু দিয়ে দিয়েছে। যেতে কোন অসুবিধে হবে না তার।

'দেখিস ভুল করে অন্য ফ্ল্যাটে ঢুকে পড়িস না। বাড়ির ওই ফ্লোরের গোটাটাই সন্ধ্যের থেকে এই কাজে জোড়া থাকে কিনা।'

যীশুর মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে সুদর্শন। প্রার্থনা শোনে। তবু মনের ভেতরে গীর্জার গান যেন পৌঁছয় না কিছুতেই।

কপালে সেলাইএর দাগ শুকিয়ে এসেছে অনেকটা। যন্ত্রণাটা আর নেই। তবু হঠাৎ হঠাৎ কেন যেন যন্ত্রণার মতো চিনচিন করে ও জায়গাটা। ম্লান হেসে ভাবে সুদর্শন, পার্কস্ট্রীট রাজতিলক পরিয়ে দিয়েছে তার কপালে।

॥ একুশ ॥

আকাশ থেকে মেঘ আর সরতে চায় না। তিনদিন ধরে বৃষ্টি চলেছে একটানা। খবরের কাগজের পাতায় জলবন্দী পথের ফটোগ্রাফ। সিন্ধুর ঘরের উঁচুর জানলাটা আর খোলাই হচ্ছে না। গোটা বাড়িটাই স্যাৎসেতে। দোতালায় এই রকম অবস্থা—একতলায় তাহ'লে কি!

এই ঘন বৃষ্টির মধ্যেই আজ সকালে সিন্ধু কৃষ্ণনগরে গেল। ভাই টেলিগ্রাম পাঠিয়েছে—মার শরীর খুব খারাপ। টেলিগ্রাম পেয়েই ছুটে গেছে সিন্ধু। দোতালার বৃদ্ধটিও আসেনি—কাল থেকে জ্বর হয়েছে তার। সুদর্শন সারাদিন একা একা কাটিয়েছে।

মনে মনে তৈরী করেছে নিজেকে। কোন রকম আবেগ, উত্তেজনা, রাগ বা ক্ষোভ দেখাবে না। শান্ত হ'য়ে কথা বলবে শুভার সঙ্গে। যেন ও রকম জায়গায় ওই রকম পরিস্থিতিতে—ওই রকম ঘরে শুভাকে পাওয়া একান্তই সহজ স্বাভাবিক ব্যাপার। সুদর্শন বুঝতে পারে তবে অস্বস্তিকে আড়াল করা কঠিন হচ্ছে। ভেতরে ভেতরে কিরকম যেন ভেঙে আসছে সে।

দুপুরের দিকে ব্যাঙ্কে যেতে হয়েছিল চেকবুকটা নিয়ে। টাকা তুলতে তুলতে একবার ভাবল—যাই কাছেই তো অর্ণবদার কলেজ—দেখা দিয়ে আসি একবারটি। কিন্তু টাকা নিয়ে ব্যাঙ্ক থেকে বেরোনোর পর মত বদল করে সে। না, যাবে না।

আসলে, ভেতরটা তার এতো অস্থির হয়ে আছে—সে কারো সঙ্গেই এখন স্বাভাবিকভাবে কথাবার্তা বলতে পারবে না। এ রকম হচ্ছে কেন? সে নিজেও তো ওই জগতের লোক। নেহাৎ অর্ণবদা তার দাদার বন্ধু, আগের থেকে পরিচয় ছিল—তাই কলকাতায় এসে

ওই ধরণের লোকদের সঙ্গে কিছু মেলামেশা হয়েছে তার। না হ'লে সে তো এই দুনিয়াটাতেই পাক খেতে চেয়েছিল। মেয়েদের দেহ নিয়ে তীব্র গতিতে খেলার উত্তেজনাই সে পেতে চেয়েছে বরাবর। তার কাছে কলকাতা তো সেই খেলার মাঠ। তবে এতটা উদ্বেগ অস্থিরতা কেন? যুবরাজের এ দুর্বলতা মানায় না।

ঠিক সময় মত, সিন্ধুর দেওয়া ঠিকানায় যখন হাজির হ'ল সুদর্শন, এক বয়স্ক মহিলা, এমনিতে তাকে বেশ ভদ্রমহিলা বলেই মনে হয়, সুদর্শনকে পৌঁছে দিল শুভার ঘরে।

পর্দা সরিয়ে ঘরে ঢুকল সুদর্শন।

শুভা বসে ছিল ঘরের মধ্যে।

শুভা চোখ তুলে তাকাল তার দিকে। স্থির চাউনি। আশ্চর্য! শুভার চোখে মুখে কোন চমকে ওঠার চিহ্ন নেই। আচমকা সুদর্শনকে দেখে বিচলিত হয়ে পড়ার ভাব নেই। দেখার সঙ্গে সঙ্গে নিজেকে সামলে নিয়েছে যেন। পাথরের চোখ নিয়ে তাকিয়ে আছে তার চোখের দিকে। চৌকাঠ পেরিয়ে ঘরের মধ্যে ঢুকেই দাঁড়িয়ে গেছে সে। ঘরে আলো নরম করে ছড়িয়ে থাকলেও মুখচোখ পরিষ্কার দেখা যায়। সুদর্শন কোন কথা বলতে পারল না।

'এসো, ওখানে দাঁড়িয়ে রইলে কেন ভেতরে এসে বোসো।'

এতো স্বাভাবিক আর সংযত গলায় ডাকল শুভা যে সুদর্শন তার ভেতরের ক্ষোভ এবং উত্তেজনাকে বাইরে আনতে পারল না! মুখের রেখা তার কঠিন হ'য়ে রইল কিন্তু সে নিঃশব্দে এসে বসল ঘরের মধ্যে।

ঘরটা দামী। চম্পাকলির ঘরের তুলনায় এ ঘর মহার্ঘ তা ঢোকা মাত্র বোঝা যায়। জানলায় দামী পরদা। বিছানার চাদর থেকে কোচের মাঝখানের সেণ্টার টেবিলের ঢাকনি—সব কিছুর মধ্যেই স্বাচ্ছন্দ্যের ছাপ। এই ঘর কি শুভা প্রায়ই ব্যবহার করে? জিজ্ঞাসা করবে নাকি? তবে যে সিন্ধু বললো শুভাকে রাজি করানো যায় না।

এই প্রথম শুভা রাজি হয়েছে! সেটা কি সিন্ধুর রেটটাকে বাড়িয়ে নেওয়ার ফিকির। এতটা কমারসিয়াল কি হতে পারে ও? মনে হয় না।'

'এখানে কি তোমাকে প্রায়ই পাওয়া যেতে পারে?'

এবার চেষ্টা করেও সুদর্শন তার ক্রোধ ঢাকতে পারল না। গলার স্বর কেঁপে গেল। রক্ত চাপ বাঁধছে মুখেতে। বলার পর শাণিত চোখ নিয়ে সে তাকিয়ে থাকল শুভার মুখের দিকে। শুভা এবারও বিচলিত হল না। সুদর্শনের প্রশ্নে বিব্রত হওয়া তো দূরে থাক। ও প্রশ্নের উত্তর দেওয়ারও প্রয়োজন মনে করল না শুভা। উল্টে সে নিজেই জিজ্ঞাসা করল, 'এখানে তোমার কি প্রায়ই আসা হয়? এই জন্যেই কি সিন্ধুর সঙ্গে বন্ধুত্ব তোমার?'

রাগ সামলানো কঠিন হয়ে উঠল সুদর্শনের পক্ষে। প্যান্টের পকেট থেকে মানি ব্যাগ বার করে টাকা গুণল দ্রুত। তারপর হাত বাড়িয়ে বলল, রেখে দাও। তোমার যা রেট—তার চেয়ে বেশি আছে।'

'কেন? আগের থেকে চেনো বলে? আমাদের এখানে চেনা হলে তো কমে যায়—জানোনা?'

'জানলুম। যা বলছি শোন। রাখো তোমার টাকা।'

'আদেশ কর—আর কি কি করতে হবে।' শুভার স্বর এবার তীক্ষ্ণ শোনায়।

দপ করে যেন আগুন জ্বলে ওঠে সুদর্শনের মাথার মধ্যে। উঠে দাঁড়ায়। চাপা ক্রুদ্ধ গর্জনের মত শোনায় তার গলা, 'উলঙ্গ হয়ে নাচতে হবে। আমি চাবকাবো তোমায়। য্য বিচ্।' রাগে স্থান কাল ভুলে যায় সে।

শুভা স্থির চোখে তাকিয়ে থাকে তখনো। তারপর পায়ে পায়ে আরো এগিয়ে আসে সুদর্শনের কাছে। চোখের পাতা নড়ে না।

'চাবুক মারার জন্যে কি এঘরে আসতে হল? এমন ভাবে!

বাজারের ফালতু মেয়ে না হলে ঠিক চাবকানো যায় না—না? এখানে আসবে বলেই কি আর হোটেলের ঘরে দেখা করা গেল না? জন্ম দিনের পর হঠাৎ সমস্ত কিছু ছিঁড়ে দিতে হল?'

'হ্যাঁ—তাই। তোমার আসল রূপটা দেখার খুব দরকার ছিল আমার?' রাগে কথা আটকে আসছিল সুদর্শনের।

'দেখলে তো আসল রূপটা। যারা অভিনয় করে খায় তাদের রূপের আর আসল নকল কিছু থাকে না। তাদের আসল নকল হয়ে যায়। নকল হয়ে যায় আসল।'

'থাক। আর তোমার থিয়েটারী ডায়ালগ মেরো না। ও সব উজ্জ্বল ব্যানার্জীদের জন্যে তুলে রেখো।'

'ওরাও আমার আসল রূপ চিনে ফেলেছে যে। তাই এখন আর ভুলেও ডাকে না। তাছাড়া ওদের তো আর করুণাসিন্ধুর মতো বন্ধু নেই—অন্যরকম করে ডাকার বন্দোবস্ত করে দেবে।'

'থাকলে তোমার সুবিধে হতে। অনেক ক্লায়েন্ট জমতো।'

'আগে একটা তো জমুক।' বলতে গিয়ে কাশি এসে যায় শুভার। কাশতে কাশতে চোখমুখ লাল হয়ে ওঠে। মুখে শাড়ির আঁচল চাপা দেয় সে।

'এই রুগ্ন শরীর নিয়ে—এ ব্যবসায় নামলে কোন ভরসায়?'

'যে ভরসায় আমার মত শয়ে শয়ে মেয়ে নামে। ভরসা তো তোমরাই।'

'এই ভাবে অসুস্থ শরীর নিয়ে কাশলে কোন খদ্দের টিকবে না তোমার।'

'যদ্দিন টেকে। যদ্দিন আমি টিকি।'

কি রকম নিঃসংকোচে একটার পর একটা জবাব দিয়ে যাচ্ছে শুভা। কোনরকম অনুতাপ নেই মেয়েটার।

সুদর্শন সিগারেট ধরায়। একরাশ ধোঁয়া ছেড়ে বলে, 'উজ্জ্বলরা এসব জায়গায় আসে না?'

এবার সত্যি যেন চাবুক পড়ে শুভার দেহে। গলা তুলে বলে, যাদের সম্বন্ধে কিছু জানো না—তাদের নিয়ে আজে বাজে কথা বলার কোন অধিকার নেই তোমার।'

সুদর্শন খানিকটা ধোঁয়া গিলে নেয়।

খানিকক্ষণ পরে জিজ্ঞাসা করে, 'সিন্ধুর সঙ্গে কতদিনের পরিচয় তোমার?'

'সিন্ধু তোমায় বলেনি?'

'ও তো তোমার রেট বাড়ানোর জন্যে কত কায়দা করল। বললো —তোমায় নাকি রাজি করানো যায় না।'

'তারপর?'

'এবারেও যাওনি প্রথমে—পরে রাজি হয়েছো।'

'ওর কথা বিশ্বাস হয়?'

'বিশ্বাস তো হয়। কিন্তু যে কিছুতেই রাজি হয়নি—ফিল্মের হীরোয়িন হবার চান্স পেয়েও হয় নি—সে কেমন করে—চকিতে একটা চিন্তা খেলে যায় সুদর্শনের মাথায়, 'আচ্ছা, সিন্ধু কখনো বলেনি তো আমার কথা। আমি ওকে জানাতে নিষেধ করেছিলাম।'

'জানায়নি। তবে এইটা দিয়েছে।' শুভা তার ব্যাগ থেকে একটা ফটো বার করে দেয়। পাসপোর্ট সাইজ ফটো সুদর্শনের।

সুদর্শন খাটে বসে পড়ে।

অনেকক্ষণ পরে শুভা ধীরে ধীরে বলে, 'পুরুষেরা বলে, আমরা, মেয়েরা নাকি আজন্ম অভিনেত্রী। পুরুষদের সঙ্গে অভিনয় আমাদের সারা জীবন ধরেই করে যেতে হয়। ছোটবেলায় অভিনয় করি বাবা আর ভাই-এর সঙ্গে। তারপর অভিনয় চলে—বন্ধু এবং স্বামীর সঙ্গে, শেষ বয়সের অভিনয় ছেলের সঙ্গে। মেয়ে আর অভিনয়—কেউ কাউকে ছাড়ে না। একটু থেমে শুভা আবার বলে, 'তবু, এর মধ্যেও এমন একজন পুরুষকে পেতে ইচ্ছে করে—অন্য মেয়ের কথা জানি না, আমার করে—যার সঙ্গে কোন অভিনয় করতে হবে না।' কথাটা

শেষ করে আবার কাশতে থাকে শুভা। কাশতে কাশতে চোখে জল এসে যায়।

'আমার ভাগ্যে কি আছে আমি বুঝে গিয়েছি সুদর্শন। আমি শেষ হয়ে গেছি। কারো কাছ থেকে বোধহয় সত্যি আর কিছু আমার পাওয়া নেই।'

'শুভা, কেঁদো না, প্লিজ, চোখের জল মোছ।'

'ভেবোনা, পাশপোর্ট ফটোটা দেখিয়ে আমি আমার সতীত্ব প্রমাণ করতে চাইছি। এতদিন আসিনি—অনেক লোভ থেকে বাঁচিয়েছি নিজেকে। আজ এসেছি তোমার মুখোমুখি দাঁড়াতে। জানো, নিজেকে নিয়ে ঠাট্টা করতে খুব মজা লাগছে এখন। এরপর হয়তো সত্যি সত্যি নিজের থেকেই এসে যাবো। আমার আর কি—আমার বাঁচিয়ে রাখার মত—আর কিছু বাকি নেই সুদর্শন। ভগবান আমার চারিদিক থেকে মেরেছে।' বলতে বলতে হু হু করে কেঁদে ফেলে শুভা।

সুদর্শন শুভাকে টেনে পাশে বসায়। শুভার এতক্ষণের সংযম ভেঙে যায় এবার। সুদর্শনের বুকের মধ্যে মুখ ডুবিয়ে কান্নায় অস্থির হয়ে যায় সে। অস্ফুট স্বরে বলে, 'জানো, নিভা চলে গেছে।'

নিভাকে নিয়েই শুভার চিন্তা ছিল বেশি।

তিন বছরের ছোট বোনটাকে বরাবর ভাল স্কুল, ভাল কলেজে পড়িয়েছে শুভা। বেথুনে পড়ছিল। মেডিকেল কলেজের একটি ছেলে চন্দন দত্তর সঙ্গে বন্ধুত্ব ঘন হয়েছিল বছর দুয়েক। শুভার তো সম্মতি ছিলই। তবু হঠাৎ চলে গেল কেন নিভা?

নিজের বোন এতো অকৃতজ্ঞ হবে একথা ভাবতেও পারেনি শুভা। শুভা যদিও বরাবরই বলতো—নিভাটা একটু সুখী টাইপ। ছোট্ট একটা চিরকুটে লিখে গেছে শুধু—চন্দনের সঙ্গে চলে যাচ্ছি। কোথায় যাচ্ছে লেখেনি? লেখেনি কেন? দিদি কি তার এতই পর হয়ে গেল? বলতে বলতে শুভা যেন নিজের মধ্যে নিজে ভেঙে

যায়। আবেগে থর থর করে কাঁপে।

নিভা চলে গেছে বেশ কয়েকদিন আগে। যেদিন চলে গেছে সেদিনই শুভা ছুটে এসেছিল সুদর্শনের হোটেলে। পরপর কদিন রোজ এসেছে। তারপর একদিন শুনেছে সুদর্শন চলে গেছে।

থমকে গেছে। বিপদের সময় যাকে বন্ধু হিসেবে পাবে ভেবেছিল—সেও এমন। কিছু বলার নেই। একেই বোধহয় পুরুষ বলে। একবার মনে হয়েছিল অর্ণবদার কাছে যাই,—উজ্জ্বলকে বলি—কিন্তু শেষ পর্যন্ত যায়নি। চারিদিকে সবকিছু যেন হুড়মুড় করে ভেঙে পড়ছিল।

ডাক্তার পালিতের কাছেও যাওয়া হচ্ছে না। মনে হচ্ছিল যে কোন মুহূর্তে বোধহয় পাগল হয়ে যাব।

এমন সময় একদিন সিন্ধু এলো। মনে পড়ল সিন্ধু তো চেনে সুদর্শনকে।

'আপনি কেন আর আসছেন।' আমি তো বলেছি পরিষ্কার প্রডিউসারদের সঙ্গে দিনরাত্রির ঘোরাফেরা করা আমার পক্ষে সম্ভব হবে না।'

'প্রডিউসার নয়। ভাবি নায়ক। রিয়্যাল বোম্বাই হীরো। আমার ফ্রেণ্ড। কার মত দেখতে জানেন?' বলে সিন্ধু সুদর্শনের প্রিয় হীরোর নাম বলেছিল।

চমকে উঠেছিল শুভা।

'কি নাম?'

'নাম বললে চিনতে পারবেন না। সুদর্শন সান্যাল।'

'ফটো আছে হীরোর?'

'চেনেন নাকি?'

'না।'

সিন্ধু ফটোটা দিয়েছিল শুভার হাতে। শুভা ফটোটা পরে ফেরত দেবে বলে রেখে দিয়েছিল।

অত দুঃখের মধ্যেও মজা এসেছিল শুভার। ভেবেছিল দুজনের সাক্ষাৎ খুব মজার হবে। সুদর্শন ভাবছে শুভা জানে না অথচ শুভা জেনেই যাচ্ছে। বেশ কৌতুকপূর্ণ দৃশ্য একটা।

অথচ দেখা হ'ল যখন কৌতুকের ছিটে ফোঁটাও পাওয়া গেল না। ক্রোধ, কান্না আর বিষাদ থমকে থাকল সারাক্ষণ। নাটকে হ'লে কি এইরকম হতো? নাটক হ'লে এই দৃশ্যে কেমন অভিনয় করতো শুভা। আজ হঠাৎ মনে হ'ল তার—এতো নাটকে অভিনয় করেছে সে—কিন্তু কোন নাটকেই এতো আবেগে উথাল-পাথাল হ'য়ে ওঠেনি।

অর্ণবদা, আমি আর শুভা—আপনাকে একটা নাটকের সাবজেক্ট দিতে পারি। লিখুন না নাটকটা। একজোড়া প্রেমিক-প্রেমিকা বেশ্যালয়ে এসে দাঁড়িয়েছে দুজনে দুজনের সামনে। আমায় অভিনয় করতে বলবেন না। এ দৃশ্যটা হাসির হবে, কি কান্নার—আমি জানি না। যাই হোক না কেন—এমন দৃশ্য আমি কিন্তু কিছুতেই বিশ্বাস-যোগ্য করে তুলতে পারবো না। এতো আবেগ আমার আসবে না। হয় না। এ দৃশ্য কিছুতেই হয় না ঠিকমত।

নিভার চলে যাওয়ার কথা বলে স্থির হ'য়ে বসে থাকে শুভা। কান্না কি সংক্রামক। তা না হলে সুদর্শনের মতো রুক্ষ ছেলেরও গলার কাছে কান্না পাকিয়ে উঠতে চায় কেন?

'শোনো কাল দুজনে যাবো অর্ণবদার কাছে।'

'তুমি কি মুখের দিকে তাকিয়ে চিন্তা বুঝতে পারো। এইমাত্র আমি ভাবছিলাম অর্ণবদার কথা।'

'আমাদের যাওয়া দরকার।'

'আমার আর দরকার নেই।'

'অকারণ অভিমান করছ শুভা।'

'না আমার কোন অভিমান নেই। আর আমি যদি অভিমান করিই—কার কি আসে যায়। আমি যখন ছিলাম না তখনও অর্ণবদা

ছিল—যখন একেবারেই থাকবো না—তখনো অপেক্ষা থাকবে।'

'কাল সকালে যাবো। কেমন?'

'না। আমার সব শেষ হয়ে গেছে সুদর্শন।'

'এ সব কথার কোন মানে হয় না শুভা।'

'হয়। আমি যেদিন থাকবো না। বুঝবে। হয়।'

'কেন তুমি থাকবে না? তোমায় থাকতে হবে—আমার জন্যে তোমায় থাকতে হবে।' সুদর্শন শুভার দুকাঁধ ধরে ঝাঁকানি দেয়। 'বলো, আমার জন্যে তোমার থাকতে ইচ্ছে করে না। বলো?'

শুভা কথা বলে না। সুদর্শনের চোখের দিকে তাকিয়ে থাকে। সুদর্শনের ঠোঁটে অস্ফুট হাসি ভাঙে এবার। শুভাকে ঘন করে জড়িয়ে নিয়ে বলে, 'কথা দাও আমায় ছেড়ে যাবে না তুমি।'

'তুমি কেন এতো ভাল হলে সুদর্শন।'

'ভাল? আমি? হাসিও না আমায়। দিলে না কথা? বলো কোনদিনও তুমি আমায় ছেড়ে যাবে না?

'দিলাম কথা।'

'সত্যি?'

'সত্যি।'

'মনে থাকবে?'

'মরার দিন পর্যন্ত মনে থাকবে আমার। কিন্তু তোমার কপাল কাটল কি করে?'

সুদর্শন হেসে বলে, 'একটা রাজতিলক না হলে মানায় যুবরাজকে, বলো?'

॥ বাইশ ॥

নতুন মহড়াঘর পাওয়ার পর 'অন্বীক্ষা'র কাজকর্ম হঠাৎ জমে উঠল খুব। সামনের মাসে নাট্যোৎসব অন্বীক্ষার। পুরোনো নাটকগুলো আবার ঢেলে সাজানো হচ্ছে। নতুন একটা নাটকের প্রস্তুতি চলেছে সেই সঙ্গে। সবাই রীতিমত ব্যস্ত।

'শক্তির এখন বক্তব্য কি।' তনয়া জিজ্ঞাসা করল অর্ণবকে। বিকেলে স্নান সেরে উঠে লম্বা আয়নার সামনে বসে চুল আচড়াচ্ছিল তনয়া। অল্প দূরে খাটে আধো শুয়ে অর্ণব বই পড়ছিল।

'বক্তব্য আবার কি? এখন আর পুরোনো প্রসঙ্গ তুলবে না কেউ —এটাই তো স্বাভাবিক।' অর্ণব বইয়ের থেকে মুখ না তুলেই জবাব দিল।

অর্ণব এ বিষয়ে খুব নিশ্চিত এখন। অন্তঃত নাট্যোৎসবের চ্যারিটি শোগুলো হওয়া পর্যন্ত অন্য প্রসঙ্গ কেউ তুলবে না এখন। নাটক-পাগল ছেলেপুলেদের এই গুণটা তো আছেই। অন্তুতঃ বেশির ভাগ ছেলের তাই আছে। এমনিতে যেমন বড় বেশি স্পর্শকাতর। তেমনি আবার মানবতাবোধটা তো এদের মধ্যেই চট্ করে দানা বেঁধে যায়। এই বিশ্বাস নিয়েই তো অর্ণব গ্রুপের কাছে প্রস্তাবটা রেখেছিল। শুভার চিকিৎসা চালানোর জন্যে অর্থের প্রয়োজন— আমরা কি শো করে কিছুটা টাকা তুলে দিতে পারি? আর কিছু বলতে হল না। মন্ত্রের মত কাজ করল এই প্রস্তাব। ঠাণ্ডা লড়াই থামিয়ে কাজে নেমে পড়ল সবাই একসঙ্গে।

পারে—কোনরকম ব্যবসায়িক সাফল্যের স্বপ্ন সামনে না রেখে শুধুমাত্র স্বাধীনভাবে নাটক করার আনন্দে যারা অনেক কিছু ছাড়তে পারে—তারা এটুকু না পারলে কারাই বা পারবে আর? অর্ণব বিভিন্ন

প্রসঙ্গে একথা বলেওছে কয়েকবার—আমাদের সাহিত্য, সঙ্গীত কিম্বা সিনেমা যেদিকেই তাকাই না কেন, দেখতে পাওয়া যাবে আসল নিয়ন্ত্রণটা ব্যবসায়ীদের হাতে। পুঁজি ঢালছে তারা—তাই কর্তার ইচ্ছেয় কর্ম চলেছে সেখানে। নাটকের স্বাধীনতাও তো ভেঙে যায় —যখন ব্যবসায়ী বা রাজনৈতিক দাদাদের ভূত চাপে নাটকের ঘাড়ে। তবু নাটকই এখন সবচেয়ে বেশি স্বাধীন শিল্প—ওটাকে রাজনীতি কিংবা মহাজনীরা কেউ ঠিকমত কব্জা করতে পারছে না। আজকের নাটকের কাছ থেকেই তাই আশা সবচেয়ে বেশি। এই মুহূর্তে কলকাতা তার সাংস্কৃতিক দুনিয়ার কোথাও ছিটে ফোঁটা কোন কাজও যদি স্বাধীনভাবে করতে পারে তবে—তা নাটকে।

'শুভাকে অনেকদিন দেখিনি। ওকে একবারটি আসতে বল এখানে—না হ'লে আমরাই গিয়ে—'

'আমরা কোথায় যাবো?' শুভা কোনদিনই চায়নি আমরা ওর বাড়ি যাই। তাছাড়া কিছু একটা না ক'রে শুধু শুধু দেখা করারও মানে হয় না।'

'ডক্টর পালিত কি তোমায় ওর অপারেশনের কথা বলেছেন!'

'হ্যা। অপারেশনটা এবার এখানে হবে না—ভেলুর এ যেতে হবে। রীতিমত খরচ।'

'শুভা কি বলছে?'

'ডক্টর পালিত তো বললেন—অপারেশন এর কথা শুনে যাবার পর থেকে শুভা আর আসেনি ওর চেম্বারে। ওষুধগুলো ঠিকমত আছে কিনা তাও বোঝা যাচ্ছে না। আর ঠিক এই সময় সুদর্শনটাও এমন বেপাত্তা হয়ে গেল।'

অর্ণব জানে সুদর্শন কলকাতা ছেড়ে যায় নি। হোটেল ছেড়ে দিয়ে আছে কোথাও। দুদিন পরে মিনিবাস বেরুচ্ছে ওর তার ওপর শুভার এমন অসুখ—কোনদিক থেকেই সুদর্শনের এখন এ জায়গা ছেড়ে যাওয়ার উপায় নেই।

কয়েক বছর আগে সুদর্শনকে অপেক্ষায় পেলে ওকে দিয়ে সুন্দর কাজ করানো যেতো। একটা বয়সের পর আর ছেলেদের তৈরী করা যায় না—তারা যে আকৃতিটা নিয়ে নেয় সেটাকে ভেঙে আবার নতুন করে তৈরী করা মুশকিল। এখন সুদর্শনের এক ধরনের দৃষ্টিভঙ্গী তৈরী হয়ে গেছে টাকা, মেয়েমানুষ আর সামান্য জীবনের সারকথা বুঝে নিয়ে কলকাতা লুঠতে এসেছে ওরা। ওদেরকে শিল্প-সাহিত্য সম্পর্কে কিছু বলতে যাওয়া—খুব হাসির ব্যাপার হয়ে দাঁড়াবে!

তবু বেশ অনেকটা পাল্টেছে সুদর্শন। একি শহরের মেয়ের সঙ্গে প্রেমের ফল? ভাল হলেই ভাল।

এই কদিন নাটকের কাজকর্ম করতে খুব ভাল লাগছে অর্ণবের। অনেকদিন পর কাজে স্বতঃস্ফূর্ত আনন্দ পাচ্ছে। নিজের পছন্দমত কাজ করার মধ্যে যে একটা নির্মল আনন্দ আছে—সেই আনন্দ থেকে অনেকদিন বঞ্চিত ছিল সে।

কলেজ জীবনের শেষ দিককার কথাগুলো মনে পড়ে তার। সেই অজয়দার সঙ্গে পরিচয়ের সময়। তখন কাজে কি নিদারুণ উৎসাহ ছিল। আজকাল সেটা যেন একেবারে চলে গেছে! নতুন ছেলেরা কি আমাদের মতই তৃপ্তি পায়।

উজ্জ্বল আর শক্তির মধ্যে ঝগড়া যখন বেশ সাংঘাতিক জায়গায় চলে যাচ্ছিল, তখনই বারবার এই কথাগুলো ভেবেছিল। অর্ণবের মনে পড়ে তাদের ওই বয়সগুলো বন্ধু বান্ধব নিয়ে কি তুখড় আনন্দ কার না কেটেছে। সিংতাশুব কবিতার বই বেরিয়েছিল যেদিন—সারারাত কিরকম তর্কবিতর্ক করে আর সিগারেট ধ্বংস করে কেটেছিল তাদের। এখন যাদের কুড়ি বাইশ বছর বয়েস—তাদের উৎসাহ কি সে রকম আছে! না থাকুক—তবু একজনের বিপদে সবাই মিলে হাত মিলিয়ে নেমেছে যে সাহায্যের জন্যে, এটাই তো অনেক। কথাটা ভাবলেও আনন্দ হয়।

টাকা যদি তুলতে পারি আমরা—তাহলে শুভাকে ভেলুরে নিয়ে

যাওয়ার বন্দোবস্ত করবে কে ?'

'অপারেশনের বন্দোবস্ত তো সব ডক্টর পালিতই করবেন। আর নিয়ে যাওয়ার জন্যে সুদর্শন তো আছে।'

'কি মনে হয় তোমার—সব ঠিকঠাক হয়ে যাবে তো। জানো, মেয়েটার মুখের দিকে তাকিয়ে আর হাসি আসে না।'

'এর মধ্যে উজ্জ্বল একটা খবর এনেছে। শুভার পাড়ায় থাকে উজ্জ্বলের অফিসের একটি মেয়ে—নতুন জয়েন করেছে। তার কাছ থেকে জেনেছে উজ্জ্বল—শুভার বাবা নাকি বদ্ধ উন্মাদ! বড় পিসি আছে এক। ছোট একটা বোন ছিল—দিন কয়েক আগে সেও নাকি ঘর ছাড়া।'

'ইস্। এই চলো—শুভা যাই মনে করুক—ঘুরে আসি একদিন ওর বাড়ি থেকে।'

'একটা চিঠি পাঠিয়েছি ওকে। এটারও যদি উত্তর না আসে যাবো। দু-তিন দিন দেখি আরো।'

আয়নার সামনে ছেড়ে উঠতে উঠতে তনয়া বলে, 'যাই বলো, শুভার রোলগুলো—আমায় দিয়ে একেবারে হচ্ছে না। ওর মুখটা দেখলেই এমন মায়া হয়। তার ওপর আমি মোটা হয়ে যাচ্ছি দিনকের দিন।'

'তবু বীথিকে দিয়ে করাতে হচ্ছে না তো। বীথিকে হয়তো বেশি মানাতো—কিন্তু তাতে শুভার অবস্থাটা কি হতো ভাবোতো। উজ্জ্বলের অফিস ক্লাবে নিতেই শুভা এতো ক্ষেপে গেল। আমারই ভুল হয়েছে। উজ্জ্বলকে বলার সময়—তখন শুভার সেন্টিমেন্টটার মূল্য দিইনি আমি।'

এদিকে, দিনচারেক পরে সিন্ধু ফিরে এলো যেদিন কলকাতায়—সিন্ধুর মুখের দিকে তাকিয়ে আঁতকে উঠল সুদর্শন। চেনা যাচ্ছে না। মুখের একি চেহারা হয়েছে সিন্ধুর। চোখমুখ ঢুকে গেছে। চুল

উস্কোখুস্কো। কদিন দাড়ি কামায়নি বোঝা যাচ্ছে।

'অসুখ নাকি? এ রকম দেখাচ্ছে কেন তোকে? এই সিন্ধু, কথা বলছিস না কেন? কি হল?'

নিশ্চুপ উন্মাদের মতো সিন্ধু তাকাল। আবার চোখ ফিরিয়ে নিল। ঘরের উঁচুতে খোলা জানলাটার দিকে তাকাল।

'ছাখ, তোর ঘর কেমন গুছিয়ে রেখেছি। একটি রুগ্ন মেয়ে—'

মাথা নামিয়ে কেঁদে উঠল সিন্ধু।

'এই। এই সিন্ধু। কি হয়েছে তোর? কাঁদছিস কেন? বাড়িতে কিছু হয়েছে নাকি? চুপ করে আছিস কেন?'

অনেকক্ষণ পরে মুখ তোলে সিন্ধু।

'কি হয়েছে বল না?'

'স্ট্রোক হয়েছিল আমার মার। ডানদিকটা পুরো পড়ে গেছে। আমার সর্ব্বনাশ হয়ে গেল। আমাব পাপেই হল সব। আমার এতদিনের পাপ—বাকিটুকু আর বলতে পারল না সে কান্নার দমকে।

পাপ? কার পাপ? সিন্ধুর? ও তাহলে পাপপুণ্যে বিশ্বাস করে? সিন্ধুই না একদিন পাপপুণ্যের সংস্কার নিয়ে অনেক কথা শুনিয়েছিল তাকে? আসলে মনের দিক থেকে ও বরাবরই দুর্ব্বল ছিল হয়তো। বাইরে কঠোরতা দেখিয়ে নিজেকে সমর্থন করতো হয়তো। তা না হলে এভাবে কেউ ভেঙে পড়ে না।

অনেকক্ষণ পর ধীরে ধীরে সিন্ধু আবার বলে, 'এবার সব ভেসে যাবে—ভাইটা বোনটা—এই পাপ আমায় খেলো। তুই ভাব—বাকি যে কটা দিন মা বাঁচবেন—ওই ভাবে শুয়ে শুয়ে কাটাতে হবে।'

'কোথায় আছেন এখন?'

'আজই নিয়ে এলাম পি. জিতে—এর আগে রাখা হয়েছিল ওখানকার হসপিটালে।'

'সারাজীবন প্যারালিটিক থাকবেন তার কোন মানে নেই—সেরেও যেতে পারেন। আমার এক বন্ধুর বাবার কেস জানি—'

'কিন্তু আমি এতো টাকা পাবো কোথায় সুদর্শন? বোন চলে এসেছে কলকাতায়। এক আত্মীয়ের বাড়িতে রেখে এলাম—মাকে এটেণ্ড করতে পারবে রোজ। তাদেরও তো অবস্থা ভাল না।'

'তুই যে সেদিন চাকরির ব্যাপারে গেছিলি কার কাছে?'

'ধ্যুৎ! সব সমান ভাই। কপালে নেই।'

'আমিও তো বলেছি অম্বরকে। পরশুদিন ও বাঙ্গালোর চলে যাবে—আজই একবার যাবো ওর কাছে—দেখি—'

এই রকম পরিস্থিতিতে মানুষকে কন্‌ক্রিট কিছু সাহায্য করতে না পারলে খুব অস্বস্তি লাগে সুদর্শনের। 'সব ঠিক হয়ে যাবে ভাই' গোছের আপ্ত বাক্য বলতে ইচ্ছে করে না তার। কিম্বা ধর্মভীরু মানুষদের মতো 'ভগবানকে ডাকো ভাই, ভগবানকে ডাকো' এ ধরণের সান্ত্বনা উপদেশ দেওয়া তার আসে না। সে চুপ করে থাকে।

কদিন ধরে অনবরত এতো গণ্ডগোল হয়ে যাচ্ছে চারিপাশে, সুদর্শন যেন বুঝে উঠতে পারছে না। একটার ধাক্কা সামলাতে না সামলাতেই আর একটা। জীবনে স্পীড চেয়েছিল সুদর্শন। কলকাতা তাকে এমন চূড়ান্ত গতি দেবে ভাবতে পারেনি।

অম্বরকে গিয়ে সুদর্শন সমস্ত কিছু খুলে বলল যখন, অম্বর বলল, তুইতো ওকে তোর কাজে নিয়ে নিতে পারিস। দিলীপ ভট্‌চাজের ভাইকেও তো আর নিবি না? তার জায়গায় একজন নিয়ে নে—আর হিসেবপত্তর দেখার জন্যে ওকে—'

'নারে। সিন্ধুর দরকার একটু ভাল কাজের। ছেলেটা দেখেছিস তো কিরকম স্মার্ট—ওকে দিয়ে—'

'ঠিক হ্যায়—এখানে নয়—বাঙ্গালোরে আমার ফ্যাক্‌ট্রিতে কাজ দিতে পারি। হ্যাণ্ডসাম সেলারি।'

'বাঙ্গালোর? ওর অসুস্থ মা—'

'আরো তো সব রিলেটিভস্ আছে না? তারা দেখবে। টাকা পাঠাবে সিন্ধু।'

'ঠিক আছে। কাল সকালে তাহলে ওকে নিয়ে আসছি তোর কাছে।'

সিন্ধুর ঘরে ফিরে এসে ওকে কিছু না জানিয়েই ওর ফ্ল্যাপটা থেকে শুভার ফটোগ্রাফটা নিয়ে রাখল সুদর্শন। সেদিন আর কিছু বলল না শুভার ঘটনা। শোনার মত মানসিকতাও নেই সিন্ধুর। প্রতিবেশী বুড়ো ক্রিশ্চান গোমেজের সঙ্গে সে কথা বলে যায় অনেকটা সময়।

বাইরে বৃষ্টি ঝরছে অঝোরে। শ্রাবণের শেষ। একটানা বৃষ্টি এখন অসহ্য মনে হয় সুদর্শনের। হঠাৎ মনে পড়ল—দাদাকে সে চিঠি দিয়েছিল। এতদিনে তো উত্তর এসে যাবার কথা। কিন্তু উত্তর আসলে তো আসবে আগের ঠিকানায়। তার নতুন ঠিকানা—এই সিন্ধুর ডেরা তো সে শুভাকে ছাড়া আর কাউকে জানায়নি। কতদিন দেখা হয়নি অর্ণবদার সঙ্গে। তনয়াদি উজ্জ্বল এদের সকলের সঙ্গে দেখা করতে মন চাইছে বড়। মন টানছে। শুভা যে কিছুতেই যেতে চাইল না। যত অসুস্থ হচ্ছে তত কেমন একগুঁয়ে হয়ে উঠছে শুভা। এমনিতে লো প্রেসার আছে। উত্তেজিত হয়ে উঠলে কখন কি ঘটে বলা যায় না—সুদর্শন খুব সতর্ক থাকে তাই। জোর করে আর শুভাকে রাজী করাতে চায় না। সুদর্শন জানে, একবার শুভা যেটা 'না' বলে সেটাকে 'হ্যাঁ' করানো অসাধ্য।

পরদিন সকালে সিন্ধুকে সঙ্গে নিয়ে সোজা অম্বরের বাড়ি। খানিকক্ষণ কথাবার্তা বলার পর, ঠিক হল—সপ্তাখানেক বাদে—সিন্ধু ব্যাঙ্গালোরে যাবে। ওর ট্রেনের টিকিটের ব্যবস্থা অম্বরই করে যাচ্ছে। অগ্রিম কিছু টাকাও ব্যবস্থা করে দিল সেই সঙ্গে।

অম্বরের বাড়ি থেকে বেরিয়ে হাঁটতে হাঁটতে সিন্ধু বলল, দূর থেকে মানুষ দেখে ভাই কিছু বোঝা যায় না। এখন অনেক মানুষ মানুষের দুঃখ বোঝে, বিপদ বোঝে। দুনিয়ায় পাপ আছে ভাই, তাই সবাই

শুধু পাপের মধ্যেই ডুবে থাকে না।' সিন্ধু পাপ কথাটা বলা কেমন যেন বাত্তিকে দাঁড়িয়ে যাচ্ছে। শব্দটাকে ভুলতে পারছে না কিছুতেই।

হাঁটতে হাঁটতে বাসস্ট্যাণ্ডে এসে দাঁড়াতেই নিতাই খুড়োর মেয়ের সঙ্গে দেখা। সেও বাসের জন্যে দাঁড়িয়েছিল।

'আরে! দাদা—আপনি! সেই যে হস্‌পিটালে গেলেন একদিন—তারপর আর কোন খবরই নেই। আপনার ওখানে গেছিলাম একদিন—পাইনি।'

'খুড়ো কেমন আছে? আমি এমন ঝামেলায় ছিলাম—'

'কি ঝামেলা দাদা?'

'মানে—ওই—মিম্বিবাস-এর ব্যাপারে। বাবা কোথায় এখন?'

'বাড়িতে চলে এসেছে। ভাল আছে এখন।'

সুদর্শন সিন্ধুকে বলে দেয়—নিতাই খুড়োর অসুখ এবং অবস্থার কথা।

'তুই যে বলছিলি তোর এক বন্ধুর বাবা।'

'না সেটা আলাদা কেস। এটাও আর একটা এক্‌জামপেল।'

'আমার একটা ভাল খবর আছে দাদা।'

'তোমার? কি খবর?'

'একটা চাকরি পেয়েছি। পড়ানোর। করপোরেসন স্কুলে।'

'ব্বাঃ। খুব ভাল খবর।'

'একদিন আসুন আমাদের বাড়ি। খাওয়াবো আপনাকে। সেদিন আপনার টাকাগুলো না পেলে কি বিপদই যে হতো না দাদা।'

'হ্যাঁ-হ্যাঁ—যাবো নিশ্চয়ই যাবো।'

'কেমন করে যাবেন। আপনি তো ঠিকানা জানেন না আমাদের নতুন বাড়ির। বলে দিচ্ছি।'

সুদর্শন ভাল করে নিশানাটা বুঝে নেয়। আর মনে মনে ভাবে কত সামান্য উপকারের কথাও মানুষ কত মনে রাখে। বলতে গেলে

সে তো কিছুই করেনি নিতাই খুড়োর জন্যে। দাদা আমাকে বলতো—তুই বড় আত্মকেন্দ্রিক—কথাটা খুব খাঁটি। শিলিগুড়ির চিঠির কথা মনে পড়ে যায়। পুরোনো হোটেলে যেতে হবে একবারটি। তিনজনে একই বাসে ওঠে। সুদর্শন আর সিন্ধুকে নেমে পড়তে হয় আগে।

হ্যাঁ, যা সে ভেবেছিল। দাদার চিঠি এসে পড়ে আছে। দাদা লিখেছে পুজোতে আসছে কলকাতায়। বৌদিও আসতে পারে।

সন্ধ্যের মুখে সুদর্শন এল অর্ণব মিত্রের বাড়ি। বাড়ির সামনে এসে ছাখে ওরা স্বামী-স্ত্রীতে বেরচ্ছে কোথায়। তনয়া সেজেছে খুব।

'তুমি বড় বেটাইমে এলে সুদর্শন। অথচ কদিন ধরেই ভাবছি তোমার কথা। মাঝে মাঝে এমন ডুব দাও না কলকাতায় আছো কিনা বোঝা যায় না।'

'কোথায় চল্লেন? বিয়ে বাড়ি নাকি?' তনয়ার সাজের দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞাসা করল সুদর্শন।

তনয়া হেসে বলল, 'একটা নয় ভাই ছুটো। একটা আমাদের বাড়িতে কাজ করে গীতা—তার মেয়ের বিয়ে, অন্যটা ওর মাসতুত বোন—কোনটাই বাদ দেওয়া যাবে না।'

'তুমি সেই যে তোমার জন্মদিনে এসে বললে আমাদের শোতে আসছ সন্ধ্যেবেলা—ব্যস—উধাও। হোটেলের ঘরটা ছেড়ে দিয়েছো। কোথায় উঠেছো—কোন ঠিকানা রেখে যাও না। আর শুভা তো এদিকেই আসে না। ডকটর পালিতকে ফোন করে বা উজ্জ্বলের মারফৎ জানতে পারি কিছু কিছু—তাও তো কিছুদিন হল সেখানেও যাচ্ছে না। আমরা তো খুব চিন্তায় পড়ে গেছি। তুমি এরপর কবে আসছো।'

'পরের শনিবার—এইরকম সময়।

'না। শনিবার এ সময়ে রিহার্সল আছে। রোববার সকালে আস যদি ভাল হয়।'

'ঠিক আছে...তাই আসবো।' জানিয়ে সুদর্শন ফিরে এলো। ওরা দুজন খানিকটা দূর চলে যাবার পর সুদর্শনের চকিতে মনে হ'ল অর্ণবদাকে...পারমিট আর ব্যাঙ্কলোনের কথা বলেছি কি মনে পড়ল না। রোববার সকালে এসে বলব সব।

কিন্তু রবিবার সকালে সুদর্শনের আসা হ'ল না।

শনিবার রাতে বিশ্রী একটা কাণ্ড বাধিয়ে বসল শুভা।

বিকেল বেলা শুভা এসেছিল। সিন্ধু গেছিল পি. জি'তে। ঘরে সুদর্শন ছিল একা।

ঘরে ঢুকেই খুব অসুস্থবোধ করছিল শুভা। আগের দিনও সুদর্শন বারণ করেছিল শুভাকে...এই শরীর নিয়ে চলাফেরা করাটা খুব বেশি রকমের ঝুঁকি নেওয়া হচ্ছে। কিন্তু শুভার কোন ভ্রুক্ষেপ নেই। জোর করে কিছু বলতে ভয় লাগে সুদর্শনের।

ঘরে এসে হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়ায়...সুদর্শন ঠিক কি করবে ভাবতে ভাবতে গোমেজের কাছে গেল। গোমেজ পাঠিয়ে দিল—এই রাস্তার মোড়েই এক ডাক্তারখানায়। নিচে ডাক্তারখানা। ওপরে থাকেন ডাক্তার চক্রবর্তী। সুদর্শন একরকম প্রায় পাকড়াও করে নিয়ে এলো চক্রবর্তীকে। শুভাকে পরীক্ষা করে ওষুধ লিখে-দিলেন ভদ্রলোক। সুদর্শন সেইমত ট্যাবলেট এনে খাওয়ানোর পর, ঘণ্টাখানেক পর...আস্তে আস্তে সুস্থ হয়ে এলো শুভা। শুভা খানিকটা সুস্থ হওয়ার পর সুদর্শন ভাবল ওকে অর্ণবদার সঙ্গে দেখা হওয়ার কথাটা বলবে। কিন্তু তখন মনে হ'লো এতে হয়তো শুভা উত্তেজিত হ'য়ে উঠতে পারে। আজকাল বলা মুশকিল শুভা কোন কথাটাতে খুশি হবে আর কোন কথাটাতে রেগে উঠবে। অর্ণবদার কথা উঠলেই হয়তো প্রথমেই শুভা জিজ্ঞাসা করবে, রিহার্সাল হচ্ছে কিনা?

হচ্ছে শুনেই জানতে চাইবে—বীথি এসেছে নাকি গ্রুপে?

সুদর্শন জানে না বীথি এসেছে কিনা। উত্তর দিতে পারবে না।

শুভার তখন ক্ষেপে যাওয়া বিচিত্র নয়। তাই সুদর্শন প্রসঙ্গটাই এড়িয়ে গিয়েছিল।

আরো ঘণ্টা খানেক বাদে শুভা যখন বলল—'এখন আমি ঠিক আছি। চলে যেতে পারবো।

সুদর্শন একা ছাড়ল না, বলল, না—আজ আমি তোমায় বাড়ি পৌঁছে দিয়ে আসবো। তুমি আপত্তি করবে না।

শুভা একমুহূর্ত কি ভাবল...তারপর বলল, 'এখন আর আমার আপত্তি করার কিছু নেই। আমাদের বাড়িটা ভাল পাড়ায় নয়। তুটো বাড়ি পরেই মীনাক্ষিদের ব্যারাক।

'মীনাক্ষিদের কতগুলো বাড়ি আছে ওইরকমের।'

'কলকাতার বহু নামকরা জায়গাতেই ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে।

সন্ধ্যের পর থেকে চড়া ভাড়ায় বুক হয় সব। কলকাতার অনেক দামী লোকেরা পায়ের ধুলো দেয় সেসব জায়গায়। তুমি পদধূলি দেবে বলে আমি যেমন ভাড়া করেছিলাম—সেদিন। তীক্ষ্ণ ব্যঙ্গের মত লাগে শুভার শেষ কথাটা। কিরকম অকপটে বলে কথাগুলো। ও ধরনের ঘটনাটা একটা আকস্মিকতা বই তো কিছু নয়। শুভা সুযোগ পেলেই কি সেই বিশ্রী পরিস্থিতির স্মৃতিতে ফিরে যেতে চাইবে? ক্রমশঃ শুভা এরকম হ'য়ে যাচ্ছে কেন? মীনাক্ষি ওর কতদিনের বন্ধু?

'আচ্ছা সুদর্শন, তুমি বিশ্বাস করলে কেন যে এর আগে কোনদিন আমি মীনাক্ষিদের ঘর ভাড়া নিইনি? মীনাক্ষি তো আমার ছোট-বেলার বন্ধু—এক স্কুলে পড়েছি তুজনে। কলকাতার কত মেয়ে এসব ঘরে যাতায়াত করে তার ঠিক আছে। আমার পক্ষে যে কোনদিন যাওয়া তো মোটেই কঠিন নয়।'

'ওসব কথা বাদ দাও শুভা। আমি আর ও সমস্ত কথা ভাবতে চাই না। অন্য কথা বলো। আগে তোমার ট্রিট্‌মেণ্টের কথা ভাবো —ভেলরে গিয়ে অপারেশন করাতে হবে।'

'অপারেশন ?' হেসে ওঠে শুভা। আজ বাদে কাল শেষ হ'য়ে যাবো—অপারেশন করে হবেটা কি! ফালতু!

সুদর্শন চুপ করে থাকে। শুভাও।

তারপর আবার বলে, 'আমার তো নিজেরই খুব অবাক লাগে, চোখের সামনে সবাই যখন উঁচুতে ওঠার জন্যে দুমদাম নেমে পড়ছে তখন আমি এতোদিন নিজেকে ঠেকিয়ে রাখলাম কি করে। নেমে যাওয়াটাই তো স্বাভাবিক ছিল। সত্যি কথা বলতে কি সতীত্ব, আদর্শ-ফাদর্শ আমি বিশ্বাস করি না সুদর্শন। আমায় সত্যি সত্যি হঠাৎ কোনদিন ওইরকম একটা ঘরে পেলে কি মনে হতো তোমার। ঘেন্না করতে না? বল, কেউ ওইরকম নিচে নেমে গেছে দেখলে ঘেন্না হয় না?'

'আমি তো আরো নিচে আছি শুভা। আমার ঘেন্না আসবে কি করে? কলকাতায় তো এসেই ছিলাম ওইরকম মজা লুটতে। 'তবু পুরুষের সাত খুন মাপ। আমার দিদিমা বলতো···সোনার আঙটির আবার বেঁকাসোজা সব সমান।'

'ওটা তোমার দিদিমার আমলে ছিল। এখন নেই।'

এরপর সুদর্শন আর কথা বাড়াতে দেয়নি। বুঝতে পারছিল— শুভা ভেতরে ভেতরে আবার উত্তেজিত হয়ে উঠছে। ওরা বেরিয়ে পড়েছিল।

পথে গিয়ে রিক্সা নিয়ে ছিল। অলিগলির মধ্যে দিয়ে এগোচ্ছিল রিক্সাটা। শুভা আপন মনে বকে যাচ্ছিল, দুনিয়ায় সবাই যেখানে সুযোগ নেয়, সেখানে সুযোগ না নিলেই মরতে হবে। মানুষকে বেশি বিশ্বাস ক'রো না। এই যে আমাকে এতো বিশ্বাস করছো— আমি কতটুকু বিশ্বাস রাখতে পারবো তোমার?' মাঝে মাঝে থামছে। আবার মাঝে মাঝে উল্‌টো পাল্‌টা বকে যাচ্ছে। শুভার বাবা পাগল হ'য়ে আছে। অসুখে ভুগতে ভুগতে শুভা পাগল হ'য়ে যাবে না তো। খারাপ পাড়ার মধ্যে দিয়ে এগোচ্ছিল রিক্সাটা। শুভা

হঠাৎ 'এই রুখকে' বলে রিক্সা থামিয়ে দ্রুত নেমে গেল। সুদর্শন দেখল গলির পাশের একটি বাড়িতে চব্বিশ-পঁচিশ বছরের একটি ছেলে ঢুকে গেল। শুভা তাকে অনুসরণ করে ঢুকে গেল বাড়ির মধ্যে। সুদর্শন পেছনে পেছনে এসে থমকে দাঁড়াল দরজার সামনে। ঘটনাটা এমন পলকের মধ্যে ঘটে গেল যে কি ঘটতে যাচ্ছে সুদর্শন আদৌ বুঝে উঠতে পারল না।

পর মুহূর্তে একটা উৎকট চিৎকার। চেঁচামেচি। সুদর্শন ভেতরে ছুটে যায়। দেখে—শুভা ওই যুবকটির সার্ট টেনে ধরেছে পায়ের চটি খুলে—এলোপাথাড়ি মারছে তাকে। দুটো বেশ্যা এসে টেনে রাখতে পারছে না শুভাকে। সুদর্শন ঝাপটে ধরে শুভাকে ছাড়িয়ে নেয়। শুভা উন্মাদের মতো চিৎকার করে যায়, বল, কোথায় রেখে এসেছিস নিভাকে। লম্পট। বদমাস। একটা মেয়ের সর্ব্বনাশ করে—'

প্রথমে খুব ঘাবড়ে গেছিল ছেলেটি। এবার সেও চিৎকার করে ওঠে, 'কে নিভা? আপনি কে? কি সব বলছেন পাগলের মতো? আমি জীবনে দেখিনি আপনাকে?'

'এই শুভা, কি করছো। কাকে ধরতে কাকে ধরছ তুমি?'

'কাকে আবার? আমি ওর ফটো দেখিনি? একদিন রাস্তায়ও দেখেছিলাম ওকে নিভার সঙ্গে। এখন ন্যাকা সাজা হচ্ছে—শুয়ার—বজ্জাত···আমি দেখবো কতবড় লম্পট হয়েছিস তুই। ছেড়ে দাও। ছেড়ে দাও আমায়। ছা-ড়-ও-ও।'

সুদর্শনের হাতের ওপরই অচৈতন্য হয়ে পড়ে যায় শুভা। ভিড় হয়ে যায়। রিক্সার ভাড়া মিটিয়ে ট্যাক্সিতে তুলে বেরিয়ে আসে সুদর্শন। আবার সিন্ধুর ঘর। ডক্টর চক্রবর্তীকে পেতে দেরি হয়। মিষ্টার গোমেজ শুভার চোখে মুখে জল ছিটিয়ে দেন। সংজ্ঞা আসে খানিক পরে। ডক্টর চক্রবর্তী এসে ওকে নার্শিং হোমে রাখার কথা বলেন। ব্যবস্থাও হয়ে যায় সঙ্গে সঙ্গে। সবকিছু মিটিয়ে, ঘরে ফিরতে

বেশ রাত হয়ে যায় সুদর্শনের।

ঘরে এসে দেখে···সিন্ধু তখনো খেতে যায় নি। তার জন্যে বসে আছে। সিন্ধুকে দেখে সুদর্শনের মনে হয়···প্রায় একই অবস্থায় পড়ে আছে দুজনে। মানুষের জীবনে এতো ঘটনা একসঙ্গে ঘটে কি করে? কে জানে রাস্তায় ঘাটে এই যে লাখ লাখ মানুষ দেখা যায় প্রতিদিন···তাদের কতজনের না কতশত বিপাক আছে এমন! পরদিন সারা সকাল সে নার্শিং হোমে বসে থাকে।

কথামত অর্ণব মিত্রের কাছে যাওয়া হয় না।

॥ তেইশ ॥

এমনিতেই চিঠি লেখা অভ্যেস নেই। তার ওপর বড় চিঠি লেখা তো একেবারেই আসে না। কিন্তু সিন্ধুকে বড় করে লিখতেই হয় সুদর্শনের কাছে। বাঙ্গালোর যাবার পর থেকে—এই দুমাসে সিন্ধু ছ-সাতখানা চিঠি লিখেছে। পাতার পর পাতা। কি রকম সুন্দর করে লিখতে পারে ও। আর নেহাৎ জরুরী কথাগুলোও সুদর্শন ঠিক গুছিয়ে লিখতে পারে না। না পারলেও শেষ চিঠিটাতে তাকে অনেক কথাই লিখতে হয়েছিল। কদিন পরেই শুভাকে নিয়ে যেতে হবে ভেলোরে। সিন্ধু জানিয়েছে ওই সময় সে থাকবে ভেলোরে।

এবার শরৎ যেন একটু দেরিতে এলো। দেরি করে এসেছে বলেই কিনা কে জানে সুদে আসলে মিটচ্ছে তাই…এবার। আকাশ পুরো খুলে গেছে। কলকাতাটা এতো ভাল লাগে ঘুরতে। আশ্চর্য! বর্ষার জলে ময়দান যে সবুজ এর তাজা হয়ে উঠেছিল। এখন নিখাদ রোদে তা ঝলমল করে ওঠে। ধুয়ে মুছে নিকিয়ে ফিটফাট করে রেখেছে শহরের গাছ গাছালি। হুহু করে মিনি ছুটিয়ে যেতে যেতে সুদর্শন ভাবে, দুটো মাস কিরকম হাত থেকে পিছলে গেল। ড্রাইভার, কনডাক্টার ক্লীনার—সবই রেখেছে; তবে দরকার হলে নিজে সে যে কোন কাজ করে। একটা দিন গাড়ি বসে গেলে অনেক ক্ষতি।

শুভা এখন আছে গিধনিতে। নার্শিং হোমে সপ্তাহ দুয়েক থাকার পর শুভাকে ওখানে সুদর্শনই রেখে এসেছিল। বেশ খোলা-মেলা জায়গা। শুভার দূর সম্পর্কের এক আত্মীয় থাকেন ওখানে। ফিরিয়ে আনতে গেল সুদর্শন। অম্বর সিং-এর গ্যারেজের একটা গাড়ি জোগাড় হ'য়েছে। দুদিন কলকাতায় থেকে তারপর ভেলোর।

ডাক্তার পালিত আগেই চলে গেছেন ভেলোরে—অন্য আর একটা কেস নিয়ে। অর্ণব বলেছিল কলকাতায় থাকলে সেও যাবে সুদর্শনের সঙ্গে গিধনিতে। কিন্তু ওরা আজ পৌঁছতে পারে নি কলকাতায়। দিল্লীতে শো করতে গেছে অম্বাক্ষা। হয়তো আসছে কাল এসে পৌঁছবে। অর্ণবদাও বেশ বড় ক'রে চিঠি লিখেছেন দিল্লী থেকে। সুবিধে হ'ল—ও চিঠির আর উত্তর দেওয়ার ঝামেলা নেই।

গিধনিতে একদিন থাকতে হল সুদর্শনকে। এমনিতে তারও কেমন যেন ক্লান্তি লাগছিল। রাতে বিশ্রাম নেওয়ায় মুছে গেল ক্লান্তিটা।

পরদিন সপ্তমী। ঝকঝকে নীল আকাশ মাথায় নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে চারিপাশ। নতুন একটা শাড়ি পরেছে শুভা। চেহারাটা আর আগের মত ফেরেনি যদিও। ভেতরের উদ্বেগ আর অসুখের ছায়া আছে মুখের রেখায় পুরোপুরি। তবু সকালে যখন তার পাশে গাড়িতে এসে বসল শুভা—ওর দিকে তাকিয়ে খুব ভাল লাগল সুদর্শনের।

পেছনের সীটে শুভার ব্যাগ রাখা আছে। জলের ফ্লাস্ক, ওষুধপত্তর নেওয়া হয়েছে সামনে। এবার দেরিতে পুজো পড়ায়—একটু শীতের আশ এসেছে ভোরের হাওয়ায়। শুভা গায়ে জড়িয়েছে পাতলা একটা চাদর। স্বাস্থ্য ভেঙে আছে আগের মতই, কিন্তু মুখের মধ্যে সেই অশান্তিটা যেন অত নেই।

'কি সুন্দর দিনটা ছাখো। সত্যিকারের পুজোর দিন একেবারে!' শুভা হাসি মুখ নিয়ে বলে।

'আসছে বারের পুজোর সময় আমরা খুব বেড়াবো শুভা। তখন তুমি তো একেবারে ভাল হয়ে উঠবে।

এক ঝাঁক খঞ্জনা পাখি উড়ে গেল রাস্তার এপার থেকে ওপারে। একটা পুজো মণ্ডপের পাশ দিয়ে যাচ্ছিল গাড়ি। ঢাকের আওয়াজ শোনা গেল।

'এই জানো, এখন আমার খুব মনে হচ্ছে—বেঁচে গেলে ভাল হয়।'

'তার মানে? আবার ওই সব কথা ভাবছো? তুমি না বাঁচবে যদি তাহলে এতো তোড় জোড় করছি কেন? দিনরাত কেন এতো খাটছি বল? দেখো, সব ঠিক হয়ে যাবে।'

শুভা অপলকে সুদর্শনের মুখের দিকে তাকিয়েছিল। তাকিয়ে থাকতে থাকতে চোখের কোণায জল এসে গেল তার। অস্ফুট স্বরে বলল, 'কেন তোমার সঙ্গে আমার দেখা হল বলতো, আমার সঙ্গে সঙ্গে তোমার জীবনটাকেও অসুখী করে তুললাম।'

'কে বলল আমার সুখ নেই? এই তো আমার সুখ শুভা।' এক হাত স্টিয়ারিং-এ রেখে সুদর্শন অন্য হাতে তুলে নেয় শুভার হাত।

শুভা আর আবেগ আটকাতে পারে না। চোখ ছাপিয়ে যায় জলে; 'তুমি কেন এতো ভাল হলে বল তো। স্বর জড়িয়ে আসে।

সুদর্শন কি উত্তর দেবে জানে না। শুধু কথা বলতে শুভার যে কষ্ট হচ্ছে—এটা ভেবে তার খারাপ লাগে।

'এক শীত ফুরোতে এসেছিলুম তোমাদের শহরে। আর এক শীত আসছে। এর মাঝখানে কত কি হয়ে গেল।'

শুভা হাসির মত করে বলার চেষ্টা করল, শিলিগুড়ির যুবরাজ, কলকাতায় এসে এক পথের মেয়ের চোখে আটকে গেল। কি অদৃষ্ট!' কাশি এসে যাওয়ায় পুরো কথাটা বোঝা গেল না শুভার।

'কলকাতা এতো বড় শুভা—সব দিক থেকেই—তার কাছে আমায় যুবরাজ বলা—খুব ঠাট্টা মনে হয়। তবে তোমাদের সত্যিকারের যুবরাজ আমি দেখে নিয়েছি—মুকুট ছাড়া যুবরাজ সে—অন্তঃত আমার কাছে '

'তাই নাকি?'

'হ্যাঁ, শুভা। কলকাতার যুবরাজ আমরা নই—এখানকার আসল লোক ওই অর্ণবদারা।'

সঙ্গে সঙ্গে শুভা গম্ভীর হয়ে ওঠে। গাড়ি থামাতে হয়। একদল ভেড়া রাস্তা পার হয়। কি সুন্দর লোম। আকাশের ওই মেঘের মত সাদা। গড্ডল স্রোত চলে গেলে আবার গাড়ি চলতে থাকে।

'তুমি কতটুকু দেখেছ ওদের? আমার চেয়ে তো বেশি নয়। ওরা ভালমানুষ। ঠিকই। শিক্ষিত। রুচিবান। চরিত্রে কলঙ্ক নেই—সব ঠিক। কিন্তু স্বার্থপর! ভয়ঙ্কর স্বার্থপর। আর স্বার্থের বাইরে যারা দুনিয়া চেনে না—তাদের সঙ্গে আমার কোন সম্পর্ক নেই। অভিমানে শুভার গলা থরথর করে কাঁপে।

'শুভা উত্তেজিত হয়ো না, ডক্টর পালিত বারবার বলে দিয়েছেন উত্তেজিত হয়ে কথাবার্তা বলতে যাবেন না একেবারে।'

'কই—এতদিন যে বিছানায় পড়ে থাকলাম অসুস্থ হয়ে—তার মধ্যে একবারটিও আসেনি! অম্বীক্ষার একজনও আসেনি?'

'শুভা, প্লীজ, উত্তেজিত হয়ো না। ডক্টর পালিত কিন্তু বারবার নিষেধ করে গেছেন তোমায়—বেশি কথাবার্তা না বলতে। আর তোমার তো এতো ক্ষোভ করার কোন কারণ নেই।

'ওঁরা তোমার অনেকগুলো চিঠি দিয়েছিলেন তোমার বাড়ির ঠিকানায়। তখন তুমি কোনটারই উত্তর দাওনি। এরপর তুমি রইলে নার্শিংহোমে—অম্বীক্ষার তখন ড্রামা ফেস্‌টিভ্যাল। তারপর ডক্টর পালিতের পরামর্শ মত—তোমায় দিয়ে গেলাম এখানে। তার মধ্যেও শো পড়েছে অম্বীক্ষার। আর এই তো দুসপ্তা আগে ওরা দিল্লী গেল।

'তার মানে চুটিয়ে শো হচ্ছে—আমাকে দেখিয়ে দেওয়া হচ্ছে—আমি না থাকলে অম্বীক্ষার কিছু যায় আসে না। বরং শো'র সংখ্যা বেড়ে যায়—এই তো?

'এসব বাজে কথা তুমি ভাবতে পারছ কি করে শুভা? ওরা তো তোমার জন্যেই শো করছে।'

'আমার জন্যে করছে মানে? আমি তো এখন ওদের কাছে ফালতু

হয়ে গেছি। কেউ আমায় মনে রাখেনি।'

'আহ্। তোমাকে মনে রেখেই তো নাটক করছে ওরা। এতো মরিয়া হয়ে খাটছে। তোমার চমকে দেবো বলে এতদিন কথাটা তোমায় বলিনি! গতকাল সাই চেকটা পেয়ে গেলাম। দিল্লী থেকে পাঠিয়ে দিয়েছে অর্ণবদা—আজ দেরি হবে বলে।'

শুভা স্তম্ভিত হয়ে যায়। 'এ সব কি বলছে সুদর্শন? আমার বিশ্বাস হচ্ছে না।'

'গত তিনমাসে ম্যাক্সিমাম শো করছে ওরা। খরচা বাদ দিয়ে লাভের সব টাকা তুলে দেওয়া হচ্ছে তোমার জন্যে। দিল্লী যাওয়ার আগে অর্ণবদা আমায় বলেছিলেন-ভেবো না—শুভার প্রতি গ্রুপ কোনরকমের দয়া করছে। এটা দান নয়—এ শুভার দাবী। ও আমাদের গ্রুপের মধ্যে মুখে রক্ত তুলে খেটেছে। ওর জন্যে আমরা এটুকু না করলে অন্যায় করবো। বিস করো শুভা, শুনে আমার না—কি রকম গর্ব্ব হচ্ছিল।' বলে শুভার দিকে মুখ ফিরিয়ে চমকে ওঠে সে। আবেগে, উত্তেজনায়, দুর্বলতায়—শুভার চোখমুখের ভাব একেবারে অন্যরকম হয়ে উঠেছে, ভেতরটা ভেঙে গুঁড়িয়ে যেতে চাইছে। হু হু করে জল নেমে আসছে চোখ ছাপিয়ে। কি একটা কথা বলতে চাইছে। শোনা যাচ্ছেনা। কাশির দমকে জড়িয়ে যাচ্ছে স্বর।

'কথা বোলো না। শুভা। বি কোয়েট। আমারই ভুল হলো। এখন এসব না বললেই পারতাম।'

শুভা নিষেধ শোনে না। বলতে যায় 'জানো—আমার খুব বেশি আনন্দ হ'লে কষ্ট হয়। এখন মনে হচ্ছে-অনেক আরো অনেকদিন—বেঁচে থাকি—'

'তোমায় থাকতেই হবে। আমার জন্যে-তোমার গ্রুপের জন্যে।' সুদর্শন ব্রেক কষে গাড়ি দাঁড় করিয়ে দেয় দড়কের পাশে। তারপর বাক্স হাতড়ে ওষুধ খোঁজে।

শুভার কাশির দমক আর শেষ হতে চায় না। কাশতে কাশতে মুখের রেখা ফেটে যাওয়ার উপক্রম। শুভা শক্ত করে সুদর্শনের বুকের ওপর মুখ চেপে রাখে। আর মুখ তোলে না।

সড়কের পাশে— ঘন ধান ক্ষেতের পার দিয়ে সপ্তমীর বাতাস বয়ে যায় উতলা হয়ে। খানিক দূরে পূজা মণ্ডপ থেকে ভেসে আসছে ঢাকের বাজনা।

সুদর্শন ছু হাতের মধ্যে শুভার মুখটিকে নিয়ে চিৎকার করে ওঠে, 'শুভা—শুভা—তুমি না আমায় কথা দিয়েছিলে—সুদর্শন শিশুর মত কেঁদে ওঠে।'

শুভা তো কথা রেখেছে।

জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত, সুদর্শনের কাছে, একেবারে বুকের ওপর, স্থির হয়ে থেকেছে।